স্মরণে শ্রদ্ধায়

বিমল সিংহ

সম্পাদনা

পূর্ণেন্দু গুপ্ত

সহ-সম্পাদনা ঃ পূর্বিতা গুপ্ত

নব চন্দনা প্রকাশনী

রামনগর, রোড নং-২ (পশ্চিম)

পোঃ রামনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা

SMARANE SHRADDHAY BIMAL SINGH
Editor : Purnendu Gupta
Asstt. editor : Purbita Gupta

স্মরণে শ্রদ্ধায় বিমল সিংহ

সম্পাদনা

পূর্ণেন্দু গুপ্ত

সহ-সম্পাদনা ঃ পূর্বিতা গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০০৮

প্রকাশিকা ঃ সুমিতা সেনগুপ্ত

নব চন্দনা প্রকাশনী

রামনগর রোড নং-২ (পশ্চিম)

পোঃ রামনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯০০২

মুদ্রণে ঃ বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ

১০বি, ক্রীক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের পথ চলা হোক সে লক্ষ্যের দিকেই

পূর্ণেন্দু গুপ্ত

১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ রাজ্যে সংগঠিত কলংকিত ঘটনা রাজ্যবাসীর স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। সেদিন ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার আভাঙ্গা ঘাটে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্তর যোদ্ধা কমরেড বিমল সিংহ শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন গণশত্রুদের অতর্কিত কাপুরুষোচিত আক্রমণে। বিশ্বাস আর নিস্তল ভালবাসা যার বুকের গভীরে ছিল জীবনভর, সেবা আর নির্ভীক পদচারণা ছিল নিশিদিন, পাহাড়ী জীবনের সুদীর্ঘ শোষণ বঞ্চনার কালোরাত্রি সমূল উৎপাটনে যিনি ছিলেন মশাল-মিছিল-মিনার এবং শ্রমিক-মেহনতি মানুষের বন্ধু, 'আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ'-এর মাঝে প্রেমের হোলি খেলতে কখনো পাহাড়ে, কখনো সমতলে জাতি-উপজাতির মিলনমেলায় যিনি ছিলেন সুর আর সংগীত - আবার ব্যস্ত-সমস্ত জীবনের অবসরে যিনি ত্রিপুরার জমিন চষে-বেড়িয়ে আর্ত-ব্রাত্য-ক্ষুধার্ত গিরি-কান্তারবাসীদের বলা না-বলা কথা-ব্যথা, শিল্পিত হাসি-কলরোল, উচ্ছ্বাস-অনুচ্ছ্বাসের প্রাত্যহিকী বিশ্বজনীন চোখে তুলে ধরায় ছিলেন নিরলস—তাকে, বিমল সিংহকে কোনো হন্তারক চক্রান্তের নিগড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে জীবনদীপ নিভিয়ে দেবে—এমন ভাবনা অন্ততঃ তিনি তার মনে বাসা বাঁধতে দেননি, আজন্ম। অথচ একটা নৃশংস হত্যালীলার মধ্য দিয়ে এমন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো—এ আমাদের কল্পনারও অতীত। তাই, ভেবে প্রতি পলে-অনুপলে বিমর্ষ-পীড়িত হই। অবাক হই। কষ্ট পাই। আমি-আমরা-সবাই।

১৯৮৩ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের চতুর্থ/পঞ্চম সন্ধ্যায় পূর্ব ভারতের অগ্রণী কবি ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী অনিল সরকার মহাশয় তাঁর বাড়ীতে বিমল সিংহের একটি গল্প সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হতে যখন আমাকে বলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন তৃতীয় আগরতলা বই মেলাতেই প্রকাশের — তখন হাতে-কড়ে গুনে দেখি- সময় মাত্র ছ/সাত দিন। অনেকটাই আয়াসসাধ্য। আজ থেকে ২৫ বছর আগে, মুদ্রণ জগতে, আগরতলায়, প্রতিবন্ধকতা আকাশপ্রতিম। কিন্তু এক রাশ সাধ-ইচ্ছা-অনুরক্তি যেখানে অপ্রতিরুদ্ধ, মিলেমিশে

একাকার—সেখানে সমাধান তল্লাস করে খুঁজে পেতে খুব বেশী দূর যেতে হয় না। হলোও তাই। আগরতলা সেন্ট্রাল রোডে তখন জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং শ্রমজীবী মানুষের মুখপত্র ‘ডেইলি দেশের কথা’র কার্যালয়। বিমলদা ও আমি। একই সঙ্গে, দু’জনে। রাজ্যের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রাণপুরুষ এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব কমরেড অনিল সরকারের শুভাশীর্বাদ নিয়ে ছুটে গেলাম সেখানে। জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এ। প্রথমে রাজ্যের গণআন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব ‘ডেইলি দেশের কথা’ পত্রিকার সম্পাদক গৌতম দাশের কাছে বই প্রকাশের ইচ্ছা-কথা পাড়তেই তিনিও খুশী হলেন। উৎসাহিত করলেন বিমলদাকে। আমাকে। খবরটা পৌঁছুলো প্রেসের দায়িত্বভার যিনি সামলে চলেছেন — কমরেড বিভূতি ভূষণ সাহারায়ের কাছে। তিনিও উৎসাহী হলেন। আমাদের উৎকণ্ঠাও কেটে যায়-যায় তখন। কিন্তু সময় যে বড্ড সংক্ষিপ্ত। বইমেলা ২৬শে মার্চ। হাতে মাত্র ক’দিন! অথচ থেমে থাকাও চলবে না। কঠোর শ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়েই সত্য-শিব-সুন্দরকে, জয়কে প্রতিষ্ঠা করাতে হবে—এটা পরীক্ষিত সত্য। পরিশেষে সবার সম্মিলিত ইচ্ছা-প্রয়াসে কাজ শুরু হলো সেদিন, সে রাত থেকেই। যার স্নেহ-পরশে বই প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজনে আমাদের সনিষ্ঠ প্রয়াস, তিনি, কমরেড অনিল সরকার ইত্যবসরে ফোনে গৌতমদার সঙ্গে কথা বললেন। জানলেন। আশ্বস্ত হলেন। সেদিন থেকে আমি, বিমলদা কাজের অবসরে, দিবারাত্র ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ এক ও একাত্ম হয়ে রইলাম মুদ্রণ কাজের পাশে। অতঃপর জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এব সকল কর্মীদের আন্তরিক প্রয়াসে বিমল সিংহের প্রথম গল্প সংকলন ‘চন্দনা প্রকাশনী’ (বর্তমান নাম ‘নব চন্দনা প্রকাশনী’) থেকে বেরুলো তৃতীয় আগরতলা বইমেলায়। তৃতীয় সন্ধ্যায়। সেদিনের সেই আনন্দঘন মুহূর্ত আজো আমার মনে পুলক জাগায়। ত্রিপুরার সাহিত্যাঙ্গণে ব্যাপক সাড়া জাগালো ‘আলোর ঠিকানা’। দারুণভাবে জনপ্রিয়তা ও প্রশংসায় স্নাত হলেন বিমল সিংহ। জীবনের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নিয়ে লেখা প্রতিটি গল্প রাজ্যের বরেণ্য লেখক-পাঠকদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হলো। এর পরপর আরো কয়েকটি গল্প-উপন্যাস বেরুলো। সবগুলিই দিয়েছে নতুন দিশা।

একদিকে ঠাসা রাজনৈতিক কর্মসূচী, অন্যদিকে প্রথমে উপাধ্যক্ষ, পরে অধ্যক্ষ, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের পাশাপাশি সাহিত্য সাধনার প্রতি অমোঘ-অনিমেষ আকর্ষণ—সর্বার্থেই বিরল দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে, তিনি।

মৃত্যু মানুষের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। জাগতিক নিয়মেই তা আসবে-যাবে। তাই কবি লিখেছেন —‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে।’ কিন্তু বিমল সিংহের জীবনের পরিণতি সে খাতে বয়নি। উল্টো খাতে বিলীন হলো বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ও সাহিত্য জগতের মহাপ্রাণ। তাই যিনি তার জীবনাদর্শের মধ্যে, লেখার মধ্যে রেখে গেছেন, দেখিয়ে গেছেন অন্ত্যজ, ব্রাত্য, শ্রমজীবী মানুষের বিকাশের পথ—তাকে সবার কাছে, কলঙ্কিত ঘটনাকে গণদেবতার আদালতে পৌঁছে দেবার জন্যেই এই শ্রদ্ধার্ঘ-স্মারক গ্রন্থ কদম কদম ছড়িয়ে দিতে চাই আমরা। বিমলদা প্রায়শই ভূপেন হাজারিকার মরমি গান ‘আজ জীবন খুঁজে পাবি, ছুটে ছুটে আয়’— নীরবে কিংবা সরবে আপন মনে গেয়ে উঠতেন। কখনো গাইতেন, সুর সাধতেন ‘মোরা যাত্রী একই তরণীর...’। উৎসবে-অনুৎসবে কিংবা ব্যথিত-চিত্তে-সম্পাতে বিমলদার সে গান - সে সুর যখন-তখন আমার কানে বাজে। আমি তখন বিমলদার আরদ্ধ স্বপ্নকে, অব্যর্থ নিশানাকে প্রতিষ্ঠার কাজে প্রতিজ্ঞাকে

আরো বেশী শাণিত করি। আমার বিশ্বাস - বিমল সিংহ আছেন, থাকবেন তাঁর কীর্তি মাঝে, সবার মনে-মননে —মানব সভ্যতা ও সংগ্রাম যতদিন বেঁচে থাকবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমি সর্বতোভাবে সহযোগিতা-উৎসাহ-অনুপ্রেরণা পেয়েছি রাজ্যের প্রবীণতম মন্ত্রী ও পূর্ব ভারতের অগ্রণী কবি পরম শ্রদ্ধাভাজন অনিল সরকার মহাশয়ের কাছ থেকে। সহযোগিতা পেয়েছি বিমল সিংহের সহধর্মিণী রাজ্যের হস্ততাঁত ও কারুশিল্পমন্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী সিংহ, গণআন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির মুখপত্র 'ডেইলি দেশের কথা'র সম্পাদক গৌতম দাশ মহোদয়ের কাছ থেকেও—তাদের প্রতি সন্নত চিত্তে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এই বর্ণময় ব্যক্তিত্বের জীবনের উপর নেমে আসা কলঙ্কিত ঘটনা জড়িয়ে পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বিভিন্ন লেখা, সংবাদ, তথ্য, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে আমাকে অন্যান্যদের মধ্যে সর্বাধিক সহযোগিতা করেছেন কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ গুরুদাস চৌধুরী, অধ্যাপক রাখাল দেবনাথ, কমলপুর বিভাগে গণআন্দোলনের যোদ্ধা কাঞ্চন কুমার সিংহচৌধুরী, শিক্ষাবিদ ডঃ বিভাস কান্তি কিলিকদার, রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক দেবব্রত দেবরায়, প্রাবন্ধিক ও গবেষক রমাপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ। আমি তাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের এই আন্তরিক 'সংগ্রহ-উপচার' মূলতঃ বিমল সিংহের প্রতি অগাধ প্রেম ও প্রীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাশাপাশি এই সংগ্রহ কাজের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা-স্মরণ-শোক-ধিক্কার-নিন্দা সমুচ্চারিত হয়েছে। আগামী দিনে এই গ্রন্থের প্রতি-পৃষ্ঠাপট শপথ আর প্রতিজ্ঞায় উজ্জীবিত করবে সংগ্রামী সাথী-বন্ধুদের — এটা আমার বিশ্বাস। বিমল সিংহের উপর আরো প্রচুর লেখা-তথ্য-ছবি আমাদের সংগ্রহে আছে। আগামী সংস্করণে সেসব সন্নিবেশ ঘটাতে আমার প্রয়াস থাকবে ততোধিক।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে উল্লেখ করতেই হয়—সাংবাদিকতা বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পড়ুয়া ছাত্রী আমার কন্যা পূর্বিতা গুপ্ত সহ-সম্পাদনার কাজে আমাকে প্রভূত সহযোগিতা করেছে। বিমলবীক্ষা গ্রন্থে তার এই নিষ্ঠিত অংশগ্রহণ আমাকে উৎসাহী করেছে বেশ। তাছাড়া আরো একটা কথা খোলসা করেই বলতে হয়—'স্মরণে শ্রদ্ধায় বিমল সিংহ' গ্রন্থখানি ঋদ্ধ হতে প্রকাশিকা সুমিতা সেনগুপ্তের অপলক দৃষ্টিপাত উল্লেখের দাবী রাখে। তদুপরি এক অভিন্ন-চেতন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভব-অনুভব এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিফলিতও হয়েছে। এজন্যে আন্তরিক শুভ কামনা-পাশে তাদেরকেও আবদ্ধ করলাম।

১৯৮৩ থেকে ১৯৯৮— দীর্ঘ ১৫ বছর বিমল সিংহের সান্নিধ্যে থেকে বহু অভিজ্ঞতায় আমি পরিশীলিত হয়েছি। তাঁর মধ্যে উৎসারিত আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। কাছে টেনে নেবার দুর্বার শক্তি তাঁর চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য দিক। 'নব চন্দনা প্রকাশনী'র সঙ্গেও ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। আজ সবই স্মৃতি। এই বই-এর বিভিন্ন লেখায় তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক-প্রশাসনিক-সাহিত্য-সাধন-জীবনের বহুদিক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গনে বই-এর ডালি-হাতে বিমল সিংহের শুভ আবির্ভাব নিয়েও কিছু কথামালা এই মহান জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। আমি অনেক অকথিত কথার সারণি থেকে, সম্যক উপলব্ধি থেকে কিছু মাত্র উল্লেখ করলাম এই দিকটির সঙ্গে সামান্য পরিচিতি ঘটানোর তাড়নায়। এবং এই আকর গ্রন্থকে পরিপুষ্ট করার প্রত্যাশায়। আমার বিশ্বাস আগামী দিনে আরো আরো ঘটনাপঞ্জী উঠে এসে বিমল সিংহের কর্ম ও জীবনধারা আস্তে আস্তে মহাকাব্যের শিরোপা পাবে। আমাদের পথ চলা হোক সে লক্ষ্যের দিকেই। সে অন্বিষ্ট পথেই ....।

বিমল সিংহ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ১৯৪৮ সালের ১৬ অক্টোবর। কমলপুর মহকুমার রূপসপুর গ্রামে। এক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পরিবারে। পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ, মাতা পূর্ণিমা সিংহ। তিন ভাই-এর মেজ বিমল সিংহ, ছোট বিদ্যুৎ সিংহ। পিতার পালিত পুত্র বিক্রম সিংহকে নির্বাচনের আগে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসবাদীরা। তাঁর খোঁজ করতে গিয়েই একদল সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে কমরেড বিমল সিংহ শহীদ হয়ে গেলেন। একইসঙ্গে খুন হলেন তাঁর ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহ। বিমল সিংহ রেখে গেছেন স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী সিংহ, মেয়ে রোজালিন এবং ছেলে রিচার্ডকে। বিদ্যুৎ সিংহের রয়েছেন স্ত্রী বেবী সিংহ ও পুত্র ঋষিকেশ।

বিমল সিংহ স্কুল শিক্ষা শেষ করেন কমলপুরে। কলেজ কৈলাসহরে। ষাটের দশকের শেষ ভাগেই তিনি গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ এই দুই বছর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সর্ব ভারতীয় সম্মেলন (ত্রিবান্দ্রম) এ তিনি কৈলাসহর থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যোগদান করেন। ঐ বছরই কমরেড বিমল সিংহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৮২ সালে সোনামুড়ায় অনুষ্ঠিত একাদশ রাজ্য সম্মেলনে কমরেড বিমল সিংহ পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-৭৬ সালে জরুরী অবস্থার সময় কমরেড বিমল সিংহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং এল.এল.বি পাশ করেন। ১৯৭৬ সালে রাজ্যে ফিরেই কমরেড সিংহ শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন সি.আই.টি.ইউর সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি, বাগিচা শ্রমিক ফেডারেশনের সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম নেতা।

বামফ্রন্টের সি.পি.আই (এম) প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৮ সালে তিনি প্রথম কমলপুর থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তিনি বিধানসভায় উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনেও তাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। ১৯৯৫ সালের ২৩শে অক্টোবর কমরেড বিমল সিংহ রাজ্যের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৯৮ সালের ১১ই মার্চ চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারেও স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

রাজ্যের প্রথম সারির সাহিত্যিকদের মধ্যে কমরেড বিমল সিংহ ছিলেন অন্যতম। পাঁচ-ছয়টি ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। পূর্বতন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের তিনি ছিলেন সহসভাপতি। বাংলা ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা মিলিয়ে তাঁর মোট নয়টি পুস্তক— আলোর ঠিকানা (গল্প সংকলন)১৯৮৩, লংতরাই (উপন্যাস) ১৯৮৪ ও ১৯৮৭, মনাইহাম (গল্প সংকলন) ১৯৮৫, তিতাস থেকে ত্রিপুরা (উপন্যাস)১৯৮৭, করাচী থেকে লংতরাই (বড় গল্প) ১৯৮৯, তখাপাড়ার ইতিকথা (উপন্যাস) ১৯৯৪, পৌরেই (প্রবাদ/যুগ্ম সম্পাদনায়), সত্যের আলোকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (প্রবন্ধ/সম্পাদিত), ববেইর য়ারী (লোককথা) ১৯৯৬— প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। ত্রিপুরার প্রথম কাহিনী চিত্র 'লংতরাই' (ককবরক) তাঁরই উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৮৬ সালে নির্মিত হয়। ১৯৯৯ সালে বইমেলা উৎসবে রাজ্য সরকার বিমল সিংহকে (মরণোত্তর) সলিলকৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করেন।

একটি হৃদয়স্পর্শী প্রতিবেদন

কমলপুরের আভাঙ্গায় এন.এল.এফ.টি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ছোট ভাইসহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কমরেড বিমল সিংহ নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগবতলা ৩১ মার্চ ঃ সি পি আই (এম)'ব অন্যতম নেতা বাজ্যেব বামফ্রন্ট সবকাবেব স্বাস্থ্য, পবিবাব কল্যাণ এবং নগবোন্নযন দপ্তবেব মন্ত্রী কমবেড বিমল সিংহ (৪৯) আজ কমলপুব মহকুমাব আভাঙ্গায এন্ এল এফ টি সন্ত্রাসবাদীদেব হাতে প্রাণ হাবিযেছেন। কমবেড বিমল সিংহেব ছোট ভাই সবকাবী স্কুলেব শিক্ষক বিদ্যুৎ সিংহও (বকেট) সন্ত্রাসবাদীদেব গুলিতে প্রাণ হাবিযেছেন। কমবেড বিমল সিংহ ও তাব ভাইকে নৃশংস হত্যাব ঘটনায সমগ্র বাজ্যেব হাজাব হাজাব মানুষ ক্ষোভে ধিক্কাবে ফেটে পডেছেন। সাবা বাজ্যে গভীব শোকেব ছাযা নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সবকাবসহ ৬জন মন্ত্রী সহযোদ্ধা সহকর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কমলপুবে ছুটে গেছেন। কমবেড সিংহেব স্ত্রী ও ছেলেমেযে সঙ্গে গেছেন।

বামফ্রন্ট কমিটি আগামীকাল ২৪ ঘন্টা 'ত্রিপুবা বনধ' আহ্বান কবেছে। সি পি আই(এম) তিনদিন শোক পালনেব সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবেছে। বাজ্য সবকাব দু'দিন বাষ্ট্রীয শোক পালন কববে। কাল দুপুবে কমলপুবে বাষ্ট্রীয মর্যাদায কমবেড বিমল সিংহেব শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

সি পি আই(এম) ব সাধাবণ সম্পাদক হবকিষাণ সিং সুবজিৎ, পলিটব্যুবো সদস্য ও পশ্চিম বাংলাব মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, পশ্চিম বাংলাব বামফ্রন্ট কমিটিব চেযাবম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত, প্রকাশ কাবাত গভীব শোক প্রকাশ কবেছেন। বাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুবাব স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে হত্যাব নিন্দা কবেছেন। স্ববাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানি সংসদে বলেছেন নিবাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী কবতে কেন্দ্র ত্রিপুবা সবকাবকে সাহায্য দেবে।

ধলাই পাডেব বধ্যভূমি আভাঙ্গা ঘাট — নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ডেব নীবব সাক্ষী

আজ দুপুর সাড়ে বারোটার কিছু পরে কমলপুরের মানিক ভাণ্ডার থেকে সি.পি.আই (এম) রাজ্য কমিটির দপ্তরে কমরেড বিমল সিংহকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শোকাবহ খবরটি আসে। মিনিট পাঁচেক আগে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর বৈঠক শেষ হয়েছে। রাজ্য কমিটির সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদার তাঁর অফিস কক্ষে এসে মাত্র বসেছেন। তখনি কমলপুর থেকে বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রণজিৎ ঘোষ টেলিফোনে তাঁকে জানান, কমরেড বিমল সিংহ আভাঙ্গায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন বলে কয়েকজন পার্টি কর্মী ছুটতে ছুটতে এসে জানিয়েছেন। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে খবর দেয়া হয়। কেউ এ খবর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কমলপুর, মানিক ভাণ্ডার, আমবাসায় এস.টি.ডি লাইন পাওয়াই যাচ্ছিল না। আরও প্রায় ১৫ মিনিট পর কমলপুর পার্টি অফিসে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। কমলপুর পার্টি অফিসের কমরেডরা জানান, কমরেড বিমল সিংহ ও তার ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহের বুলেট বিদ্ধ মৃতদেহ হাসপাতালে আনা হয়েছে। সবদিক থেকে কাতারে কাতারে পার্টির নেতা, কর্মী, সাধারণ মানুষ হাসপাতালে ছুটে আসছেন। অনেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। আমবাসা থেকে কমলপুর সর্বত্র হাজার হাজার নারী পুরুষ রাস্তায়।

আগরতলা সি.পি.আই(এম) রাজ্য দপ্তরে পার্টির বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী দরদীরা ছুটে আসতে থাকেন। সারা রাজ্যে দ্রুত দুঃসংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে জরুরী বৈঠক করেন। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর জরুরী বৈঠক বসে। কমরেড বিমল সিংহের সরকারী বাসভবনে ছিলেন তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। পার্টি নেতা রমা দাস ও মঞ্জুলিকা বসু গিয়ে তাদেরকে কমলপুরে যাবার জন্য রাজ্য দপ্তরে নিয়ে আসেন। তিনটের কিছু পর মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, রাজস্বমন্ত্রী কেশব মজুমদার, সমবারমন্ত্রী নিরঞ্জন দেববর্মা, শিল্পমন্ত্রী পবিত্র কর, গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী অনন্ত পাল, বিধায়ক মানিক দে কমলপুরে রওনা হয়ে যান।

আগরতলা শহরে মাইকে কমরেড বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের সংবাদটি প্রচার করা হয়। সদর বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলী বিকেল চারটায় বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়। প্রতিটি বিভাগে বিভাগে অনুরূপ বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয়া হয়। সারা রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ গর্জমান প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়ে কমরেড বিমল সিংহকে হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ধিক্কারে ফেটে পড়েন।

রাজ্য দপ্তরে কমরেড বিমল সিংহের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয় পার্টি কর্মী ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। ফুলে সাজানো কমরেড বিমল সিংহের প্রতিকৃতিতে পার্টি নেতা, কর্মী, দরদী সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন। সর্বত্র পার্টির পতাকা অর্দ্ধনমিত রয়েছে।

দুপুর থেকেই আগরতলা শহরে বন্‌ধের চেহারা নেয়। মন্ত্রীর মৃত্যুতে সরকারী অফিসগুলি ছুটি হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আগামীকাল সকাল ৬টা থেকে ২৪ ঘন্টা বন্‌ধ পালনের আহ্বান জানিয়ে মাইক স্কোয়াড বের হয়।

রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শেষ হবার পর কমলপুর বিভাগীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে কমরেড বিমল সিংহ ২৮ মার্চ কমলপুর গিয়েছিলেন। আজ তাঁর আগরতলায় ফেরার কথা ছিল।

কমলপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া চলার সময় গত ৯ ফেব্রুয়ারি কমরেড বিমল সিংহের ছোট ভাই বিক্রম সিংহকে কমলপুর ফটিকরায় সড়ক থেকে এন.এল.এফ.টি সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। ভাইকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা চলছিল।

আজ কমরেড বিমল সিংহ কমলপুরে তাঁর বাড়ি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে প্রথমে কমলপুর পার্টি অফিসে আসেন। সেখানে কমরেডদের সঙ্গে চা পান করে তিনি মানিক ভাণ্ডারে আসেন। সেখানে পার্টি কর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলার সময় তার ভাই কলাছড়ি হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক বিদ্যুৎ সিংহ (৩৮) তাঁকে টেলিফোনে খবর দেন — মেছুরিয়ার হিমাংশু দাস নামে একজন কংগ্রেস(ই) কর্মী খবর দিয়েছে বিক্রমকে অপহরণকারীরা নাকি আজকে ছেড়ে দেবে বলে খবর পাঠিয়েছে এবং তার আগে তারা বিমল সিংহের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। বিদ্যুৎ আরও জানান তিনিও সঙ্গে যাবেন। ভাই বিদ্যুৎ সিংহ আসার পর কমরেড বিমল সিংহ তাকে নিয়ে রওয়ানা হন এবং আভাঙ্গা এসে হিমাংশু দাসের দেখা পান। তিনি হিমাংশু দাসের কথায় বিশ্বাস করে গাড়ি ও নিরাপত্তা কর্মীদের রেখে নদীর পাড়ের দিকে রওয়ানা হন। সাথে নেন ব্যক্তিগত দেহ রক্ষীদের এবং সি.এ.কে। হিমাংশু দাস নাকি বলে দেহরক্ষীদেরও কথা বলার সময় সাথে নেয়া যাবে না। নদীর পাড়েই কথা হবে। পথে দেহ রক্ষীদের একটি বাড়ির উঠোনে বসিয়ে কমরেড বিমল সিংহ, ভাই বিদ্যুৎ সিংহ ও সি.এ.কে নিয়ে হিমাংশু দাসের সাথে নদীর পাড়ে আসেন। তখন নদীর অপর পাড় থেকে সাধারণ পোষাকে দু'জন যুবক বেরিয়ে আসে। কমরেড বিমল সিংহ ও বিদ্যুৎ সিংহ ঐ দুই যুবকের সাথে কথা বলার জন্য হিমাংশু দাসকে নিয়ে নদীর খাড়া পাড় থেকে নীচে নেমে যান। অপর পাড় থেকে দুই যুবক নদীর মাঝে নেমে এসে আচমকা গামছা দিয়ে ঢাকা এ. কে. ৪৭ রাইফেল ও কারবাইন বের করে খুব কাছে থেকে প্রথমে বিদ্যুৎ সিংহকে গুলি করে। ভাইকে গুলি বিদ্ধ হতে দেখে নিশ্চিত বিপদ বুঝতে পেরে বিমল সিংহ সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগী হিমাংশু দাসকে সামনে টেনে ধরেন। হিমাংশু ঝটকা মেরে নদীতে ঝাঁপ দেয়। সন্ত্রাসবাদীরা বৃষ্টির মতো বুলেট নিক্ষেপ করে কমরেড বিমল সিংহের দেহ ঝাঁঝরা করে দেয়। ঐ দু'জন সন্ত্রাসবাদী ছাড়াও নদীর ওপাড়ে কাশবনে আরও ১০/১২ জন সন্ত্রাসবাদী অ্যাম্বুস করেছিল।

গুলির শব্দ শুনে দেহরক্ষীরা ছুটে এসে পাল্টা গুলি চালান। পাশেই ছিল সি.আর.পি.এফ.ক্যাম্প। জওয়ানরা ছুটে আসে। ততক্ষণে সন্ত্রাসবাদীরা মেছুরিয়া থেকে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়।

নিরাপত্তা কর্মীরা বিমল সিংহ ও বিদ্যুৎ সিংহের দেহ তুলে কমলপুর হাসপাতালে আনেন। চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। কমরেড বিমল সিংহের দেহে ১৮টি বুলেটের ক্ষত চিহ্ন ছিল।

সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীসহ ৬ মন্ত্রী কমলপুর শহরে পৌঁছে প্রথমে হাসপাতালে যান এবং তারা কমরেড বিমল সিংহ ও তার ভাইকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। হাসপাতালে তখনও মানুষের ভিড়ে ছয়লাপ। দু'ছেলেকে হারানোর শোকে স্তব্ধ লক্ষ্মীকান্ত সিংহ হাসপাতালে মৃত দেহের পাশে বসে। মুখমন্ত্রী মানিক সরকার ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাঁকে গভীর সমবেদনা জানান। তাঁকে নিয়ে তারা বাড়িতে আসেন। পরিবারের সদস্যরা শোকে ভেঙ্গে পড়েন।

নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাসী চালাচ্ছে। আসাম রাইফেলসের ব্রিগেডিয়ার বি.এস.চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টার জেনারেল ও অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে গেছেন। ব্রিগ্রেডিয়ার চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন আসাম রাইফেলস এবং বি.এস.এফ তল্লাসিতে নেমেছে।

— ডেইলি দেশের কথা, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮

চা-শ্রমিক মায়েরা আঁচলে বেঁধে এনেছিলেন লাল জবা

সুরেন্দ্র পাল

কমলপুরের পার্টির শক্তি কত ব্যাপক এবং শিকড় কত গভীরে পৌঁছেছে তা-ই আজ দেখলাম শহীদ কমরেড বিমল সিংহের শেষ বিদায়ের মিছিলে। একে মিছিল বললেও ভুল বলা হবে। এ যেন এক চলমান জনস্রোত। এই জনস্রোতের কাছে কমলপুর আমবাসা সড়ককে মনে হয়েছে নিতান্তই সংকীর্ণ। মানিক ভান্ডারে সি.পি.আই(এম) বিভাগীয় দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে উন্মুক্ত ট্রাকে পাশাপাশি রাখা দু'ভাই -এর মরদেহ নিয়ে দুপুর পৌনে দুটোয় শুরু হয় শোক মিছিল। সামনে অর্দ্ধনমিত পতাকা হাতে ৪৮ জন স্বেচ্ছাসেবক। তার পেছনে মরদেহবাহী ট্রাক। এরপর বামফ্রন্ট এবং সি.পি.আই(এম) নেতৃবৃন্দ। সবশেষে অন্তহীন বিশাল জনস্রোত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা — কে নেই এই মিছিলে?

মানিক ভাণ্ডার থেকে কমরেড বিমল সিংহের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় লেগেছে তিন ঘন্টারও বেশি। পথে পথে দু'ধারে দাঁড়ানো শতশত মানুষ ফুল মালায় শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাদের প্রিয় কমরেডকে। শেষ অভিবাদন জানাতে এসে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এ যেন তাদের ঘরের ছেলেকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন। গতকাল দুপুরে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই গোটা মহকুমায় নেমে এসেছিল গভীর শোকের ছায়া। শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আজ দুটি মরদেহই পাশাপাশি রাখা হয়েছিল পার্টির মানিকভাণ্ডার বিভাগীয় দপ্তর প্রাঙ্গণে। দুপুর সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন আমরা মানিক ভাণ্ডারে গিয়ে নামলাম তখন বাজারে কাতারে কাতারে মানুষ। সুশৃঙ্খলভাবে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। বামফ্রন্টের ডাকে রাজ্যব্যাপী বন্‌ধ এর কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে গোটা মহকুমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ। কিন্তু যানবাহনের অপ্রতুলতা মানুষকে আটকে রাখতে পারেনি। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ নিজেরা গাড়ির ব্যবস্থা করে তাতে কালো পতাকা তুলে ছুটে গেছেন কমরেড বিমলদাকে শেষ বারের মত দেখতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে। হালাহালি, আভাঙ্গা, শান্তিরবাজার এলাকার মানুষ যারা গাড়ি পেয়েছেন তারা গাড়িতে গেছেন, না হয় পায়ে হেঁটেই ছুটে গেছেন মানিক ভাণ্ডারে।

চৈত্রের তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে বহু মা-কে দেখেছি শিশু কোলে নিয়ে পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চলেছেন মানিক ভাণ্ডারের পথে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেছেন তাঁদের প্রিয় বিমলকে শেষ দেখা দেখতে। চা-বাগানের সাঁওতাল শ্রমিক মায়েরা আঁচলে বেঁধে এনেছেন লাল জবা। কেউ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসে মৃতদেহের পাশেই আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। যিনি সান্তনা দিতে এসেছেন, তিনিও সামলাতে পারেননি অশ্রু ধারা। 'না-গো তোমরা আমার বাবারে নিওনা' বুক ফাটা কান্নায় কমরেড বিমল সিংহের মেয়ে রুজি যেভাবে বারবার মাথা কুটেছে, এটাই যেন ছিল আজ সবার বুকের ভাষা। কারণ কমরেড বিমল সিংহ এবং বিদ্যুৎকে এভাবে এই মুহূর্তে শেষ বিদায় জানানোর জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ঘাতকেরা অসময়ে কেড়ে নিয়েছে কমলপুরবাসীর হৃদয়ের মণি কমরেড বিমল সিংহকে। বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক হয়ত কমলপুরবাসী আরও পাবেন। আজ না হোক কাল। কিন্তু কমরেড বিমল সিংহ আর ফিরে আসবেন না। কেননা বিমল সিংহ ছিলেন একজনই। পার্টি এবং গণসংগঠনকে জনগণের গভীরে নিয়ে যেতে তিনি যে ভূমিকা রেখে গেছেন তা মনে রাখবে ভাবীকাল। হয়তো এ থেকেই বেরিয়ে আসবে আরও অসংখ্য বিমল। আজ শেষ বিদায়ের মিছিলের স্রোতে মিশে গিয়ে এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়েছে। — *ডেইলি দেশের কথা, ২রা এপ্রিল, ১৯৯৮*

জনসমুদ্রকে শেষ আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন কমরেড বিমল সিংহ

১লা এপ্রিল, যেন জনসমুদ্রকে শেষ আলিঙ্গন করলেন তিনি। শোকাকুল বিশাল জনসমুদ্রের মাঝেই বিদায় নিচ্ছেন জনগণের প্রিয় নেতা কমরেড বিমল সিংহ। আজ ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় কমরেড সিংহের বাড়ির পাশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তাঁর শেষ কৃত্য। সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ মিনিটে পাশাপাশি দুই ভাইয়ের মরদেহ যখন একই চিতায় জ্বলে উঠে তখন হাজার হাজার মানুষের কান্না বিলাপ ছড়িয়ে যায় দূর বহু দূরে। মলয়ার মাঠের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আছড়ে পড়ে কমরেড বিমল সিংহ — তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলব না। শহীদের রক্ত ....।

আভাঙ্গা ঘাটে এন.এল.এফ.টি সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে কমরেড বিমল সিংহ, সহদোর বিদ্যুৎ সিংহের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গতকাল দুপুর থেকে কাতারে কাতারে ঘরছাড়া মানুষের যে উতলা অভিযান শুরু হয়েছিল, আজ ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে তা ভিন্ন মাত্রায় শুরু হয়। দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করেন সি. পি. আই (এম) অফিসগুলিতে। যেখান থেকে কোথাও পায়ে হেঁটে আবাব অনেকে কালো পতাকা বাঁধা জীপে মাইলের পর মাইল পথ পরিক্রমায় ছুটে আসেন পার্টির বিভাগীয় দপ্তর মানিক ভাণ্ডারে।

ওদিকে উত্তরের সব ঠিকানা হয়ে দাঁড়ায় রূপসপুরের এক পরিচিত বাড়ি। এ বাড়িতেই আশৈশব বড় হয়েছেন বিমল সিংহ। গণ আন্দোলনের কর্মীদের প্রিয় বাড়িটিতে সাত সকালেই ভিড় বাড়তে থাকে। হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে পাশাপাশি দুই ভাইয়ের কফিন তোলা হয় একটি ফুলে সাজানো ট্রাকে। লাল সালুর মোড়া ট্রাকের মাথায় থার্মোকলে লেখা দুই শহীদের নাম। বুকের

কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন।

পাঁজরে, রক্তে আর ঘামের মাশুলে সে নাম ধরে রাখার অঙ্গিকার।

সকাল আটটার কিছু পরে রূপসপুর থেকে মানুষের স্রোতে মিছিল এগোয় একটু একটু করে দক্ষিণে। মানিক ভাণ্ডারের পথে। পথে পথে জটলা মানুষের ভীড়। শুধু একটিবার মুখখানা দেখার আকুলতা। সারি সারি মানুষের বাধায় সে ৬ কিলোমিটার অতিক্রম করে মানিক ভাণ্ডারে পৌঁছতে সময় নেয় তিন ঘন্টারও বেশি সময়।

সকাল সাড়ে দশটার পর থেকে পৌনে দুটো অব্দি মানিকভাণ্ডারে পার্টির বিভাগীয় দপ্তরে চলে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর্ব। ভোর থেকে যারা ছিলেন একে একে দীর্ঘলাইনে তারা তুলে দেন বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ফুল। ফুলের তোড়া। ফুলে ফুলে ঢেকে যায় দেহ। কর্মীরা তা সরিয়ে দেন। আবার ফুল পাহাড় তার চূড়া মেলে। প্রায় চার ঘন্টার এই পর্বে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদারসহ নেতৃবৃন্দ একে একে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত নেতার প্রতি। ফরোয়ার্ড ব্লকের ব্রজগোপাল রায়, আর. এস. পির গোপাল দাস, অহীন্দ্র ভট্টাচার্য, সি.পি.আই-র সুনীল দাশগুপ্ত, দীনেশ সাহা, কংগ্রেসের কনক ঘোষ, রাজ্য বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য কেশব মজুমদার, অনন্ত পাল, জিতেন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার বর্মণ, অঘোর দেববর্মা, এ.ডি.সির মুখ্য নির্বাহী সদস্য রণজিৎ দেববর্মা, নির্বাহী সদস্য গজেন্দ্র ত্রিপুরা, রাধাচরণ দেববর্মা, রাজেন্দ্র রিয়াং, এ.ডি.সি সদস্য গোবিন্দ দেববর্মা, বিধায়ক বিধুভূষণ মালাকার, মনোরঞ্জন দেববর্মা, বিধানসভার অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার, উপাধ্যক্ষ সুবল রুদ্র, উত্তর জেলা পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জলি দেববর্মা, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুখমতী দেববর্মা প্রমুখ একে একে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। শেষ শ্রদ্ধা জানান সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভানু ঘোষ, খগেন দাস, বাদল চৌধুরী, ছাত্রযুব নারী শ্রমিক, কৃষক সংগঠনের রাজ্য নেতৃবৃন্দ। দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ মানিক ভাণ্ডার থেকে শুরু হয় মিছিল। সামনে সাদা পোষাকের স্বেচ্ছাসেবী দল, হাতে তাদের অর্দ্ধনমিত ঝাণ্ডা, আরও সামনে ঘোষকদের গাড়ি। মরদেহবাহী ট্রাকের পেছনেই বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, পার্টি ও বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ। তার পেছনেই পিচ ঢালা রাস্তা জুড়ে মানুষের স্রোত। মিছিল যত এগিয়েছে ততই একটু একটু করে বেড়েছে চলমান স্রোতের প্রান্তভাগ।

বিশাল এ মিছিল ছয় কিলোমিটারের পথটুকু যেতে সময় নিয়েছে তিন ঘন্টার বেশি। পথে পথে থামা; ফুল মালা; বুক চাপড়ানো কান্না, আবার চলা। আবার। রাস্তার ধারে, গাছের মগডালে বাড়ির

মরদেহ নিয়ে শেষ মিছিল।

ছাঁদে কোথাও বা টিনের চালায় শুধু মানুষ আর মানুষ। একটু উঁচুতে উঠলে যদি শেষবারের মত মুখটাকে ভালো করে দেখা যায়। রূপসপুরে কমরেড বিমল সিংহ ও বিদ্যুৎ সিংহের মরদেহ যখন পৌঁছায় তখন মিছিলের পথ এগুনোই ছিল দায়। হাজার হাজার মানুষ অঝোর কান্নায় একসাথে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। এত মানুষকে একসাথে এমনভাবে কাঁদতে আর দেখেনি কোনদিন কমলপুর।

চিতায় তোলার আগে প্রথমে বাড়ির ভিতর সামাজিক প্রথায় চান করানো হয় দুই ভাইকে। তারপর টি.এস.আর.জওয়ানরা কাঁধে তুলে নেন মরদেহ। জনগণের নির্বাচিত প্রিয় নেতা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মরদেহ ঢেকে দেয়া হয় জাতীয় পতাকায়। বাড়ির ভেতর থেকে টি.এস.আর জওয়ানরা মার্চ পাস্টে মরদেহ নিয়ে আসেন শেষকৃত্যের স্থলে। বাড়িতে চোকার আগে পুকুর পাড়ে এর আগেই রাষ্ট্রীয় শেষ কৃত্যের আয়োজন করে রাখা হয়েছিল। একদিকে চিতা। দূরে একপাশে ডি.আই.পি ডায়াস। সেখানে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ অফিসার, বিশিষ্ট নাগরিকদের বসার জায়গা। দীর্ঘ রাস্তা আর তার বাঁধ সমান উঁচু পাড়ে হাজার হাজার জনতা।

মরদেহে প্রথমেই রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদের পক্ষে পুষ্পার্ঘ দেন ধলাই জেলার জেলাশাসক বনমালী সিনহা, রাজ্য মন্ত্রিসভার পক্ষে অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, বিধানসভার অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার, এ.ডি.সির মুখ্য নির্বাহী সদস্য রণজিৎ দেববর্মা, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বৈদ্যনাথ মজুমদার, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে ডি.আই.জি পি.ভি. কৃষ্ণ রেড্ডি, স্বাস্থ্য অধিকর্তা সুধীর দেববর্মা এবং পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ। টি এস.আর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নেব ১৯ জন জওয়ান লাস্ট পোস্ট এ অংশ নেন। বেজে উঠে বিউগল। তোপধ্বনি। এরপর মৃদঙ্গ করতাল আর প্রার্থনা সঙ্গীতে শেষকৃত্যের বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। এরপর জ্বলে উঠে চিতা। স্লোগানে স্লোগানে কেঁপে উঠে চৌদিক। কমরেড বিমল সিংহ অমর রহে, কমরেড বিদ্যুৎ সিংহ অমর রহে ....। লেলিহান শিখার তেজ বাড়ার সাথে সাথে জনতার কণ্ঠে গর্জে উঠে শপথের ধ্বনি।

— ডেইলি দেশের কথা, ২রা এপ্রিল, ১৯৯৮

শেষ মিছিলে অগণিত মানুষের সাথে পার্টি নেতৃবৃন্দ।

"জাতি-উপজাতির ঐক্যের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন কমঃ বিমল সিংহ"

শোক প্রকাশ

রাষ্ট্রপতি কে . আর. নারায়ণন ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি কে.আর.নারায়ণন এক শোক বার্তায় ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহকে হত্যার বর্বরোচিত সন্ত্রাসবাদী কাজের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি শোকবার্তায় বলেন, এই বিবেকবর্জিত সন্ত্রাসবাদী কাজের বিরুদ্ধে আমি কঠোরতম ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। রাষ্ট্রপতি নিহত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরিবার পরিজন ও রাজ্য মন্ত্রিসভাব প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ঃ ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিংহকে উগ্রপন্থীরা গুলি চালিয়ে হত্যা করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। লোকসভা ও রাজ্যসভাতেও এই ঘটনার নিন্দা করে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী কার্যকলাপ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী দেবার দাবী জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী নিহত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের পরিবারের উদ্দেশ্যে এক শোকবার্তায় বলেছেন সভ্য সমাজে হিংসার কোন স্থান নেই।

সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক হরকিষাণ সিং সুরজিৎ এবং পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত ঃ উগ্রপন্থীদের কাপুরুষোচিত আক্রমণে কমরেড বিমল সিংহ ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিংহের নিহত হবার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি.পি.আই(এম) সাধারণ সম্পাদক হরকিষাণ সিং সুরজিৎ এবং পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য প্রকাশ কারাত। মঙ্গলবার সি.পি.আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদারের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় সুরজিৎ ও কারাত বলেছেন—এই হত্যার ঘটনায় আমরা শোকস্তব্ধ।

কমরেড বিমল সিংহকে রাজ্যের জনগণের ঐক্য রক্ষার সংগ্রামে একজন শহীদ হিসেবে উল্লেখ করে সুরজিৎ ও কারাত শোকবার্তায় বলেন, তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। কংগ্রেস রাজত্বের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তী সময়ে উগ্রপন্থী হুমকির বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন তিনি। সুরজিৎ ও কারাত বলেছেন, প্রথমে ত্রিপুরা বিধানসভার স্পীকার হিসেবে এবং পরবর্তী সময়ে রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বিমল সিংহ। তিনি ছিলেন সি.আই.টি.ইউ'র একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাঁর হত্যাকাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গভীর ক্ষতি হবে। শোকবার্তায় সুরজিৎ ও কারাত দু'জনেই বলেছেন এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে পার্টি ও বামপন্থী আন্দোলনকে দমন করা যাবে না। এই হত্যাকাণ্ড ও আক্রমণের ঘটনায় সন্ত্রাসবাদী হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের দৃঢ় সংকল্প নতুন শক্তি যোগাবে।

সুরজিৎ ও কারাত শোকবার্তায় কমরেড বিমল সিংহের স্ত্রী এবং তার ভাইয়ের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্তঃ বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বর্ষীয়ান জননেতা এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি সমগ্র পশ্চিম বাংলার জনগণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং শোক জ্ঞাপন করেছেন নিহত কমরেড বিমল সিংহ এবং তার ভ্রাতা বিদ্যুৎ সিংহের প্রতি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত কমরেড বিমল সিংহ এবং তাঁর ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতিতে রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করার প্রশ্নে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে বলেছেন।

সি.পি.আই (এম) পলিটব্যুরো ঃ সি.পি.আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের উগ্রপন্থীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হবার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে সি.পি.আই (এম) পলিটব্যুরো। এক বিবৃতিতে পার্টির পলিটব্যুরো এই হত্যাকাণ্ডে শোক জানিয়ে বলেছে, বিমল সিংহের হত্যায় রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হল। পলিটব্যুরো বিমল সিংহের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি পার্টির শোক জ্ঞাপন করেছে। ত্রিপুরায় আরও আধা সামরিক বাহিনী পাঠাবার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী জানিয়েছে পার্টি। পলিটব্যুরো বলেছে, বিমল সিংহ ও তার ছোট ভাইকে উগ্রপন্থীরা কমলপুর মহকুমায় হত্যা করেছে। বিমল সিংহ ছিলেন সি.পি.আই (এম) এবং সি.আই টি.ইউর একজন বিশিষ্ট নেতা। গত কয়েকবছর ধরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপে বাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি সাহসের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত কংগ্রেস টি . ইউ. জে. এস জোট সরকারের সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায় থেকে আগত বিমল সিংহ রাজ্যের সব অংশের জনগণের মধ্যে ঐক্য রক্ষায় দৃঢ়তার সঙ্গে লড়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তিনি নিরন্তর লড়াই করেছেন। ত্রিপুরায় আরও আধা সামরিক বাহিনী পাঠাবার দাবি জানিয়ে পলিটব্যুরো বলেছে, বারবার অনুরোধ করার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনের সময় ত্রিপুরা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া আধা সামরিক বাহিনীগুলিকে এখনও ঐ রাজ্যে ফেরৎ পাঠায় নি। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। উগ্রপন্থীরা এই দীর্ঘ পাহাড় সঙ্কুল সীমান্ত এলাকাকে ব্যবহার করে আসছে। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ দমনে কেন্দ্রীয় সরকারের সবরকম সহায়তা দরকার।

ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটি ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সি.পি.আই(এম) রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড বিমল সিংহ ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিংহের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি। ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছেন — সাম্প্রতিক লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমরেড বিমল সিংহের আরেক ছোট ভাই বিক্রম সিংহকে সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। প্রাথমিক খবরে জানা যায়, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অপহৃত ভাইকে উদ্ধারের চেষ্টায় একটি খবর পেয়ে কমরেড বিমল সিংহ আজ ঐ গ্রামে গিয়েছিলেন এবং তখনই এ্যাম্বুশ করে থাকা সন্ত্রাসবাদীরা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালিয়ে তাঁদের হত্যা করে।

কমরেড বিমল সিংহের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড বামফ্রন্ট বিরোধী দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। এই ষড়যন্ত্রীরা বামফ্রন্টকে অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতাচ্যুত

করতে নির্বাচনের আগে হিংস্র উস্কানি ও প্ররোচনামূলক আক্রমণ চালায়। ভোটের সময় বামফ্রন্ট সমর্থক ভোটারদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। কিন্তু জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে এদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বামফ্রন্টকে বিপুল সমর্থন দিয়ে চতুর্থবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী করেন এবং লোকসভা নির্বাচনেও বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করেন। এখন পরাজিত কায়েমী স্বার্থবাদীরা আরও জঘন্য ষড়যন্ত্র করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। কমরেড বিমল সিংহের নৃশংস হত্যা এদের এই ঘৃণ্য পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অঙ্গ।

ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটি কমরেড বিমল সিংহ এবং তাঁর ভাইকে নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সংগঠিত করতে আগামীকাল ১লা এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে সারা ত্রিপুরায় ২৪ ঘন্টা শান্তিপূর্ণভাবে বন্‌ধ পালন করতে বামফ্রন্ট কমিটি ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। বামফ্রন্ট কমিটি কমরেড বিমল সিংহের মা-বাবা স্ত্রী সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছে।

সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ঃ সি.পি.আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং কমরেড বিমল সিংহের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। আগামী তিনদিন রাজ্যের সর্বত্র পার্টির পতাকা অর্দ্ধনমিত রেখে শোক জ্ঞাপনের জন্য পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এক বিবৃতিতে সম্পাদকমণ্ডলী বলেছেন — ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে কমরেড বিমল সিংহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন সামনের সারির সৈনিক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য থেকে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। সি.আই.টি.ইউ-র সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি হিসেবে কমঃ বিমল সিংহ শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি পরপর পাঁচবার কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। কমরেড সিংহ প্রথমে বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ও পরে স্পীকার হিসেবে বিধানসভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৫ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কমরেড বিমল সিংহ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমলপুর মহকুমা ও সমগ্র রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণের সম্প্রীতির মেলবন্ধন সুদৃঢ় করা, সংখ্যা লঘুদের অধিকার আদায়, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা বিগত ১৫ বছর ধরে অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে কমলপুরের জাতি উপজাতির মৈত্রী এবং পার্টি ও বামপন্থী আন্দোলনের সুদৃঢ় ঘাটিকে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। পার্টি ও গণতান্ত্রিক শক্তি এ ষড়যন্ত্রকে বারবার ব্যর্থ করে দিয়ে ঐক্যের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে রেখেছেন। কমরেড বিমল সিংহ ছিলেন সেই সংগ্রামের অন্যতম সেনাপতি। শান্তি ও সম্প্রীতিকামী শ্রমজীবী মানুষের গণ আন্দোলনের একজন নির্ভীক যোদ্ধা কমরেড বিমল সিংহের স্মৃতির প্রতি সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্ত পতাকা অর্দ্ধনমিত রাখছে।

রাজ্যের শান্তি মৈত্রী স্থিতিশীলতা বিনষ্টের লক্ষ্যে এবং জাতীয় সংহতি বিপদগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে যে সন্ত্রাসবাদীরা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের

পতন ঘটানো। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করার ডাক দিয়ে, বামপন্থী ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধাদান এবং কংগ্রেস আই, উপজাতি যুব সমিতি, টি.এন.ভি জোটের প্রার্থীদের অনুকূলে ভোটদানের নির্দেশ দিয়ে রাজ্যের কয়েকটি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীরা যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছিল, রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের গণতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ মানুষ এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারকে দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী করেছেন। সন্ত্রাসবাদী ও তাদের রাজনৈতিক দোসররা নির্বাচনে জনগণের এই রায়কে মেনে নিতে পারছে না। বামফ্রন্ট সরকারের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার জন্য এরা আরও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে। কমরেড বিমল সিংহ হত্যাকাণ্ড এই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। সি.পি.আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী খুনী সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের আরও কঠোরভাবে মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার ও সেনা বাহিনীসহ সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে রাজ্যকে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভা ঃ রাজ্য মন্ত্রিসভা স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী বিমল সিংহের দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত সিংহের শোক সন্তপ্ত পবিবার পরিজনদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। আগামীকাল রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। আজও রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়। আগামীকাল রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্দ্ধনমিত থাকবে এবং কোনরকম আনন্দ অনুষ্ঠান পালিত হবে না। মঙ্গলবার একই কর্মসূচী ছিল। বুধবার প্রয়াত স্বাস্থ্য ও নগরোন্নযনমন্ত্রীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা রাজ্যে সরকারী দুটি ঘোষণা করেছে মন্ত্রিসভা। আগামীকাল কমলপুরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে ধলাই জেলাব কমলপুর মহকুমার আভাঙ্গার কাছাকাছি এলাকায় মন্ত্রী বিমল সিংহ এবং তাঁর ভাইয়েব উপর সন্ত্রাসবাদীদের এই কাপুরুষোচিত হামলা ও হত্যা কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরার জনগণের প্রতি তাঁর অবদানের কথাও গভীব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মবণ করছে। প্রয়াত এই তরুণ কর্মচঞ্চল নেতা যে নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন-- মন্ত্রিসভা তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছে। এই শোকের সময় শান্ত ও সংযত থেকে সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেও মন্ত্রিসভা রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি ঃ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী বিমল সিংহেব নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি গভীর শোক প্রকাশ কবেছেন। আজ বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নিকট প্রেরীত এক বার্তায় রাজ্যপাল রেড্ডি বলেছেন, নিহত স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তিনি বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই চিনতেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুতে আমরা এক সুদক্ষ প্রশাসককে হারালাম। দরিদ্র জনগণের স্বার্থে তিনি সর্বদাই কাজ করে গেছেন। ঐ বার্তায় রাজ্যপাল রেড্ডি প্রয়াত মন্ত্রী বিমল সিংহের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

সি. পি. আই ঃ সি.পি.আই রাজ্য পরিষদ জনগণের প্রিয় নেতা কমঃ বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতিতে বলেছে - এই আত্মদান বৃথা হবার নয়। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে সি.পি.আই বলেছে — এই ঘটনার প্রতিবাদে বামফ্রন্ট আহুত ২৪ ঘন্টার ত্রিপুরা

বন্‌ধ সফল করার আহ্বান জানিয়েছে।

আর. এস. পি ঃ আর.এস.পি রাজ্য কমিটি জাতি উপজাতি সম্প্রীতির অগ্রণী সৈনিক বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১লা এপ্রিলের ত্রিপুরা বন্‌ধ সফল করার আহ্বান জানিয়েছে। অপরাধীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করারও দাবি জানিয়েছে আর.এস.পি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

জনগণতান্ত্রিক মোর্চা ঃ কমরেড বিমল সিংহের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করে জনগণতান্ত্রিক মোর্চা বলেছে — কমরেড বিমল সিংহ ছাত্রজীবন থেকেই বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার জনগণের প্রিয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ঃ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি বিমল সিংহ ও তাঁর ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহেব হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়েছে। সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতি এবং টি.ইউ.সি.সি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছে।

সি. পি. আই (এম) আসাম রাজ্য কমিটি ঃ কমরেড বিমল সিংহের নৃশংস হত্যাকান্ডে গভীর শোক প্রকাশ কবে পার্টির আসাম রাজ্য কমিটি নিহত বিমল সিংহ ও তার ভাইয়ের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন এবং পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছে। পার্টিব আসাম রাজ্য কমিটি শোকবার্তায় বলেছে, বিমল সিংহের হত্যায় পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বিরাট ক্ষতি হল। পার্টি বলেছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বাগিচা-শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার পেছনে কমরেড বিমল সিংহের বিরাট অবদান রয়েছে।

সি. পি. আই (এম) তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটি ঃ উগ্রবাদীদের হাতে কমরেড বিমল সিংহের হত্যার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি.পি.আই (এম) তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটি। পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির নিকট প্রেরিত এক শোকবার্তায় পার্টির তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটির সম্পাদক এন শংকরাইয়া কমরেড বিমল সিংহ ও তাঁর ভাইয়ের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন ত্রিপুরার পার্টির কমরেডদের প্রতিও।

সারা ভারত বাগিচা-শ্রমিক ফেডারেশন ঃ সারা ভারত বাগিচা শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সারা ভারত বাগিচা ফেডারেশনের সভানেত্রী বিমলা রণদিভে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন বিমল সিংহের হত্যায় কেবল ত্রিপুরার জনগণের ক্ষতি নয়, [illegible] বাগিচা শ্রমিক আন্দোলনেরও ক্ষতি হল। সারা ভারত বাগিচা শ্রমিক ফেডারেশনের উত্তর [illegible] আহ্বায়ক অমল ঘোষ দস্তিদার এক পৃথক বিবৃতিতে বিমল সিংহের কাপুরুষোচিত হত্যার নিন্দা করেছেন।

সি. আই. টি. ইউ'র শোকবার্তা ঃ সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সি.আই.টি.ইউ) - এর সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি ও ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহকে তাঁর বাসভূমি কমলপুরে

উগ্রপন্থীরা হত্যা করায় সি.আই.টি.ইউ গভীরভাবে মর্মাহত। বিমল সিংহের সঙ্গে তার ভাইকেও উগ্রবাদীরা একই সঙ্গে হত্যা করেছে। উগ্রবাদীদের দ্বারা সংগঠিত এই বর্বর হত্যা কাণ্ডকে তীব্র নিন্দা জানিয়ে সেন্টার অব ইন্ডিয়ান টেড ইউনিয়নস এক বিবৃতিতে বলেছে — উগ্রপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাকামীদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সি.আই.টি.ইউ সহ ত্রিপুরার শ্রমজীবী বামপন্থী শক্তি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশের ঐক্য রক্ষা করার যুদ্ধে বিমল সিংহ শহীদ হলেন। কমরেড বিমল সিংহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সি.আই.টি.ইউ তাঁর পতাকা অর্ধনমিত রাখছে। একই সঙ্গে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে বিমল সিংহের পরিবার পরিজন ও তার সংগ্রামী বন্ধুদের । সি.আই.টি.ইউ-র সম্পাদক মণ্ডলী স্বীকৃত সংগঠনগুলোকে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সি আই টি ইউ'র আসাম ও তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটি পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের শোকবার্তা ঃ ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ জননেতা বিমল সিংহের এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছে এবং শোক সন্তপ্ত কমরেড বিমল সিংহের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছে — কমলপুর মহকুমা ও সমগ্র রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণের সম্প্রীতির মেলবন্ধন সুদৃঢ় করার কাজে কমরেড বিমল সিংহ'র ছিল অতুলনীয় অবদান। কাজেই এই ঐক্য রক্ষার সংগ্রামকে বিনষ্ট করার জন্যই আজকের এই হত্যাকাণ্ড। দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা এই রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকে বিঘ্নিত করার কাজে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বত্র সোচ্চার হতে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের প্রতি আবেদন জানায়।

এ. ডি. সি নেতৃবৃন্দের গভীর শোক ঃ ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসাজাই মগ, মুখ্য নির্বাহী সদস্য রণজিৎ দেববর্মা এবং নির্বাহী সদস্য গজেন্দ্র ত্রিপুরা কমরেড বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়ে বলেছেন — বিমল সিংহ ছিলেন আদিবাসীদের বড় প্রিয়জন। এ.ডি.সি. নেতৃবৃন্দ নিহত কমরেড সিংহ ও তার ছোটভাই এর প্রতি গভীর শোক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসকবৃন্দ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের গভীর শোক ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কর্মচারীরা বৃহস্পতিবার গোর্খাবস্তীতে অফিসের বিনোদন হলে এক শোকসভায় মিলিত হয়ে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ নিহত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে শান্তি সম্প্রীতি ও সংহতি রক্ষার সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ ঘোষণা করেন। স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সুধীর দেববর্মার সভাপতিত্বে এই স্মরণসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সুধীর দেববর্মা, টি. আর. পাল চৌধুরী, পরেশ চক্রবর্ত্তী, দীপক মজুমদার, ডাঃ যোগেশ দাস, অনু দে, পার্থ রায়, নৃপেন ভৌমিকসহ দপ্তরের অফিসার ও কর্মচারীরা। সভায় এক মিনিট নীরব শ্রদ্ধা জানিয়ে গৃহীত হয় একটি শোক প্রস্তাব। শোক প্রস্তাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিংহের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক

শাস্তি দেবার দাবি জানানো হয়। স্মরণ সভায় জি.বি. হাসপাতালের টি.বি.ওয়ার্ডের সামনে যে অডিটরিয়ামটি তৈরি হয়েছে তা বিমল সিংহের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব নেয়া হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের প্রতিশ্রদ্ধা জানাতে পশ্চিম ত্রিপুরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে আজ এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। বেলা একটায় অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শোকসভায় দপ্তরের সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শোকসভায় উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। শোক সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং প্রয়াতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে বুধবার সারা রাজ্যে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ও অল ত্রিপুরা জুনিয়র ডক্টরস এসোসিয়েশন সমস্ত হাসপাতালে শোক পালন করেছে। বৃহস্পতিবার আই.এম.এর উদ্যোগে জি.বি. হাসপাতাল চত্বরে সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে সংগঠিত হয় শোকসভা। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শোকপ্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিহত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আরব্ধ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন বিভিন্ন বক্তা। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বিকাশ রায়, ডাঃ কৃষ্ণপদ দেবনাথ, ডাঃ নীরদ দাস, ডাঃ সত্যরঞ্জন দেববর্মা, প্রফুল্ল রায়, আভা শূর এবং রমেন্দ্র দেব। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ডি.কে. বিশ্বাস। সভা শেষে কালো ব্যাজ ধারণ করে বেরোয় একটি শোক মিছিল।

বিধানসভার অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকারের শোকবার্তা ঃ বিধানসভার অধ্যক্ষ জীতেন্দ্র সরকার তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন — প্রয়াত জননেতা বিমল সিংহের এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাবার ভাষা আমার নেই। কমরেড বিমল সিংহ তার রাজনৈতিক জীবনে ত্রিপুরার সব অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করার কাজে নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। রাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তাঁর অবদান রাজ্যবাসী স্মরণে রাখবেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভার শোক মিছিল ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ এবং তাঁর ভাই বিদ্যুৎ সিংহকে হত্যার প্রতিবাদে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী মহাসভা জয়েন্ট একশন কমিটি এবং বেয়াপা সমিতির যৌথ উদ্যোগে এক শোক মিছিল আগরতলা শহর পরিক্রমা করে। শোক মিছিল থেকে বিমল সিংহের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিমল সিংহের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শোক প্রস্তাব এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বের হয় শোক মিছিল। শোক সভায় নিহতের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। শোকসভায় আলোচনা করতে গিয়ে বিমল সিংহকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজ তথা রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণের আপনজন বলে উল্লেখ করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন নীলকান্ত সিংহ এবং অনুকূল সিংহ।

সি. পি. আই (এম) কাছাড় হাইলাকান্দি জেলা কমিটির উদ্যোগে শিলচরে ধিক্কার মিছিল, শোকসভা ঃ ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছে সি.পি.আই (এম) কাছাড় হাইলাকান্দি জেলা কমিটি। গত ২রা এপ্রিল পার্টির উদ্যোগে শিলচরের গান্ধীবাগ প্রাঙ্গণে শোক সভা শেষে ধিক্কার মিছিল শিলচর শহর পরিক্রমা করে। কাছাড় জেলার বিভিন্ন অংশের নারী পুরুষ বিমল সিংহের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে শোকসভায় শামিল হয়েছিল। সি. পি. আই (এম) ছাড়াও সি.পি.আই, অঃ গ. প, জনতা দল এবং বিষ্ণুপ্রিয়া

মণিপুরী সংগঠনের সদস্যরা যোগদান করেন। প্রাক্তন সাংসদ নুরুল হুদার সভাপতিত্বে গান্ধীবাগ প্রাঙ্গণে শোকসভায় শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন পার্টির কাছাড় হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সম্পাদক দীপক ভট্টাচার্য। শোক প্রস্তাবে কমরেড বিমল সিংহকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা এবং জাতি উপজাতির সেতুবন্ধনের সুনিপুণ কারিগর বলে উল্লেখ করা হয়। বিমল সিংহকে হত্যার ঘটনায় তীব্রনিন্দা করে প্রয়াত নেতার প্রতি গভীর শোকশ্রদ্ধা এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। শোক প্রস্তাবে কমরেড বিমল সিংহকে প্রকৃত অর্থে নিষ্পেষিত গরীব মানুষের বন্ধু, সংগ্রামের সাথী, শ্রমজীবী জনগণের অধিকার অর্জনের নির্ভীক যোদ্ধা বলে অভিহিত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ভারতের প্রগতিশীল আন্দোলনের দুর্গ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেবার গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বারবার বামফ্রন্টের বিজয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা ক্ষিপ্ত হয়। উগ্রপন্থীদের রাজনৈতিক দোসররা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পুনরায় স্থিতিশীল বামফ্রন্ট রাজত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কুমতলবে বিমল সিংহকে খতম করার চক্রান্ত করে শোক প্রস্তাবে বলা হয়। শোক প্রস্তাবে বিমল সিংহকে শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের নেতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। শোকপ্রস্তাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত সমস্যা এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যা উল্লেখ করে কেন্দ্রের কাছে পর্যাপ্ত সাহায্য দেবাব দাবি জানানো হয়। স্মরণ সভায় মণিকান্ত সিং, নীতিশ দে, ফকরুল আলিম মজুমদার, বিজয় চৌধুরী, মৃণালকান্তি দত্ত বিশ্বাস, নুরুল হুদা বিমল সিংহেব বাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সেই সাথে শিলচরে আইন কলেজে পড়াব সময় যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তারাও স্মৃতিচারণ করেন। স্মবণসভায় আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং বিপথগামী যুবকদের দেশের মূল স্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানান। শোকসভা শেষে ধিক্কার মিছিল শিলচর শহর পরিক্রমা করে। — *শোক প্রকাশেব সংবাদগুলি ডেইলি দেশের কথা, ১-৭ এপ্রিল, ১৯৯৮ থেকে সংগৃহীত।*

'নব চন্দনা প্রকাশনী'র গভীর শোক ধিক্কার

বিমল সিংহেব নৃশংস হত্যাকাণ্ডে 'নব চন্দনা প্রকাশনী'র প্রকাশিকা সুমিতা সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন — ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জাগ্রত সৈনিক, সাহিত্যিক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ ও ভাই বিদ্যুৎ সিংহের নির্মম হত্যাকাণ্ডে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। ধিক্কার জানাচ্ছি সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি। পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছি। সাহিত্যিক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের প্রথম গল্প সংকলন " আলোর ঠিকানা" ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় আমাদের প্রকাশন সংস্থা থেকেই। এরপর ১৯৮৪ সালে প্রথম উপন্যাস "লংতরাই" (১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় গল্প সংকলন "মনাইহাম" এবং ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় উপন্যাস "তিতাস থেকে ত্রিপুরা"ও নব চন্দনা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। আমরা ব্যথিত চিত্তে তাঁর অনন্য সাহিত্য সৃষ্টির মুহূর্তগুলি স্মরণ করছি এবং দুর্লভ সাহিত্যনিষ্ঠ-মন ও মননের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বিমল সিংহের অকাল প্রয়াণ যে শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল তা অপূরণীয়। আগামীদিনে এ অভাব প্রতিদিন অনুভূত থাকবে সবার হৃদয়ে — এটা বাস্তব সত্য। আমরা জানি লেখনীর উজ্জ্বলতায় পুষ্ট চারটি বইতে যে অমূল্য সম্পদ দিয়ে তিনি ত্রিপুরার সাহিত্য পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করে গেছেন — তা আগামীদিনে ত্রিপুরাবাসীর কাছে সমাদৃত থাকবে। — *ত্রিপুরা কণ্ঠ (বাংলা সাপ্তাহিক), ৯ এপ্রিল, ১৯৯৮*

সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে রত্নখণ্ড রেখে গেছেন তা বহুদিন অম্লান থাকবে

আগরতলা প্রেস ক্লাবের শোকবার্তা

বিমল সিংহকে সন্ত্রাসবাদীরা যে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে তাতে ক্ষোভ এবং গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এক বিবৃতিতে প্রেস ক্লাব বলেছে — স্বজন হারানো ব্যথা যে কত দুঃসহ, তার দৃষ্টান্ত বিমল সিংহকে হারানোর মর্মান্তিক ঘটনা। মন্ত্রী বিমল সিংহ তার রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও স্ব-মহিমায় দীপ্যমান। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বন্ধু, আপনজন বিমল সিংহ বাংলা, ককবরক, মণিপুরী সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে রত্নখণ্ড রেখে গেছেন তা বহুদিন অম্লান থাকবে। রাজ্যের মানুষের মধ্যে মেল বন্ধনের যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তারজন্যও তাঁকে রাজ্যবাসী দীর্ঘদিন মনে রাখবেন। *—ডেইলি দেশের কথা, ৩ এপ্রিল ,১৯৯৮*

বিমল সিংহ বড় ভালোবাসতেন আদরের বিক্রমকে

ভাই বিক্রম সিংহকে সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন কমরেড বিমল সিংহ ও তাঁর সহোদর বিদ্যুৎ সিংহ। বড়ই ভালো বাসতেন বাবার পালিত পুত্র এই বিক্রমকে। বলে না দিলে কারো বোঝার উপায় নেই বিক্রম তাদের এক মায়ের সন্তান নন। পরিবারের লোকরাই চাইতেন না, বিক্রম পালিত সন্তান এটা যেন প্রকাশ পায়। বিমল সিংহ ছোটভাই বিদ্যুৎ এবং বিক্রমকে একইভাবে ভালোবাসতেন, আদর করতেন।

নিন্দায় ধিক্কারে গর্জে উঠেছে গোটা রাজ্য

বামফ্রন্টের ডাকে ২৪ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধ

কমরেড বিমল সিংহকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে বুধবার ১লা এপ্রিল সকাল ৬টা থেকে বামফ্রন্টের ডাকে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে ২৪ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধ। উগ্রপন্থীদের এই কাপুরুষোচিত কাজের নিন্দায় ও ধিক্কারে মঙ্গলবার গর্জে উঠেছে গোটা ত্রিপুরা। রাজধানী আগরতলা সহ প্রতিটি মহকুমায় হাজার হাজার মানুষ মিছিলে মিছিলে সামিল হয়ে হত্যাকারী ও তাদের মদতদাতাদের প্রতি ঘৃণা ছুড়ে দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটি এবং সি.পি.আই(এম)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী পৃথক পৃথক বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে — সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত কায়েমী স্বার্থবাদীরা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র করছে এই হত্যাকাণ্ড তারই অঙ্গ।

আগরতলায় বিক্ষোভ ঃ বিমল সিংহ ও তাঁর ভাই বিদ্যুৎ সিংহের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভের ঝড় আছড়ে পড়েছিল আগরতলায়। উগ্রপন্থীদের দ্বারা কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন পার্টির রাজ্য দপ্তর এবং সদর বিভাগীয় দপ্তরে। বিকাল চারটা নাগাদ হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হন সদর এবং বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে এসে। চারটের পর থেকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আর তিল ধারনের জায়গা ছিল না। সাড়ে চারটা নাগাদ পার্টির সদর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সমীর চক্রবর্তী, রাজ্য কমিটির সম্পাদক চিত্ত চন্দ, রঞ্জিত দেবনাথ, রমা দাসসহ বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দকে সামনে রেখে বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিল থেকে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। স্লোগান উঠে, সন্ত্রাসবাদ নয়, রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণ শেষ কথা বলবেই। মিছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে বিদুরকর্তা, কের চৌমুহনী, ফায়ার ব্রিগেড, বটতলা, পোষ্ট অফিস চৌমুহনী হয়ে কামান চৌমুহনীতে পথ সভায় মিলিত হয়। মিছিলের পুরোভাগে এবং বড় অংশ ছিলেন মা বোনেরা। কামান চৌমুহনীতে যখন পথসভা শুরু হয় তখন কামান চৌমুহনী থেকে পোষ্ট অফিস চৌমুহনী পর্যন্ত মানুষে মানুষে একাকার। চিত্ত চন্দের সভাপতিত্বে সভার শুরুতেই বিমল সিংহ ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিংহের প্রতি মৌনশ্রদ্ধা জানানো হয়। কামান চৌমুহনীতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সি.পি.আই (এম) সদর বিভাগীয় সম্পাদক সমীর চক্রবর্তী, সি.পি.আই নেত্রী সাহানা সেনগুপ্তা, আর.এস.পি নেত্রী সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সতীশ সাহা।

পশ্চিমবঙ্গ বিক্ষোভে উত্তাল ঃ কমরেড বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের খবর পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠে। বিকেলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয় ছাত্র মিছিল। এস.এফ.আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি সোমনাথ ভট্টাচার্য ও রাজ্য সম্পাদক পার্থ মুখার্জী সিধু-কানহু-ডহরে প্রতিবাদে উত্তাল ছাত্র জমায়েতে বক্তব্য রাখেন। পরে রাজভবনে ছাত্র প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন, যাতে তিনি সরকারকে উগ্রপন্থী মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারকে সহযোগিতার জোরালো দাবি জানান। এই বিক্ষোভ মিছিল ও জমায়েতে সামিল ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বিমল সিংহের নৃশংস হত্যা কাণ্ডের খবর

যখন বেতার ও দূরদর্শনের মাধমে পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে তখন মুহূর্তের মধ্যেই গোটা পশ্চিমবাংলা স্বতঃস্ফূর্ত ধিক্কারে ফেটে পড়ে। কলকাতার আনাচে কানাচে সর্বত্র বেরোয় তীব্র ঘৃণা ঝড়া বিক্ষোভ মিছিল। হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ ছাত্রযুবক রাস্তায় নেমে পড়েন। বিবাদী বাগে সংগঠিত হয় বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ। কমরেড সিংহের হত্যাকাণ্ড ঘিরে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মদতের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে প্রতিবাদ। তেমনি মিছিল বেরয় তারাতলা, বেলেঘাটা, কসবা, কাশীপুরের শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা থেকেও। সন্ধ্যায় সিউড়িতে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল। উদ্যোক্তা ছিল পার্টি সিউড়ি অঞ্চল কমিটি। পার্টি বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মহঃসেলিমসহ পার্টি নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ মিছিলে শামিল ছিলেন।

গভীর রাত পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার ১৮টি জেলার সর্বত্র কমরেড বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিরাট বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের খবর আসছে। উত্তরের দিনাজপুর থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন, মুর্শিদাবাদ থেকে বর্ধমান — এককথায় জেলায় জেলায় হাজার হাজার নারী পুরুষ ধিক্কারে শামিল। রায়গঞ্জ, বহরমপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণার সব শিল্পাঞ্চলের, সব জেলা ও মহকুমা সদরে মানুষ নেমে এসেছেন রাস্তায়। উগ্রপন্থী ও তাদের মদতদাতা শক্তির বিরুদ্ধে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রুখবার সংগ্রামে ঘোষণা করেছেন তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। *ডেইলি দেশের কথা, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮*

কমলপুরের জনগণ রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন

প্রিয় নেতার মৃত্যুতে শোক, দুঃখের পাশাপাশি ক্ষোভে ফুঁসছেন মানুষ। অনেক রক্ত পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে এসেছেন কমলপুরের মানুষ। কিন্তু তাদের সুখ দুঃখের সাথী আপনজন "কমরেড বিমল সিংহ নেই — এটা মানা যায় না। ভাবা যায় না " -- এই ছিল মানুষের বক্তব্য। এন.এল.এফ.টি সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর জেহাদ ছিল সর্বত্র। তবে কোথাও পার্টি কর্মীরা আক্রমণ সন্ত্রাসে নেমে পড়েন নি। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে অনেক ঘটনাই ঘটে যেতে পারতো। কিন্তু কমলপুরের জনগণ রাজনৈতিক শংখলা এবং প্রচণ্ড ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। পার্টির নীতির প্রতি আস্থা আর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই ক্ষোভ, দুঃখ, উত্তেজনাকে সংযত করেছে। জাতি, উপজাতি মানুষের ঐক্য রক্ষায় কমরেড বিমল সিংহের অবদান-এর প্রতি এও ছিল এক নীরব সম্মান।

কমলপুরে সেদিন কারোর ঘরেই রান্না হয়নি

হৃদয় দিয়ে যাঁকে কমলপুরবাসী ভালোবাসতেন, রাজ্যের গরিব মেহনতি মানুষের প্রিয় নেতা বিমল সিংহের এই বর্বরোতম হত্যাকান্ড কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি কমলপুরের মানুষ। কমলপুরে এদিন ঘরে ঘরে ছিল অরন্ধনের পালা। প্রায় কারোর ঘরেই উনুন জ্বলেনি। সকালে যে খাবার তৈরি হয়েছিল তাও রয়ে গেছে একইভাবে। বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

'আমার আশা—উগ্রপন্থীদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে'

২৬শে মার্চ, ১৯৯৮ঃ বিধান সভায় বিমল সিংহের শেষ ভাষণ

উগ্রপন্থীরা ভুল পথ ছাড়ুন। ত্রিপুরার উন্নয়নে হাত মেলান। আমি আশাবাদী আপনাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কমরেড বিমল সিংহ তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয়েব কথাগুলিই ব্যক্ত করেছিলেন সদ্য সমাপ্ত বিধানসভায়, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে দফাওয়ারী আলোচনায়। বলাই বাহুল্য ২৬ মার্চের এই ভাষণই ছিল অষ্টম বিধানসভায় কমবেড বিমল সিংহের শেষ ভাষণ।

ঠিক পাঁচ দিনের মাথায উগ্রপন্থীদেবগুলিতে ঝাঁঝরা, নিথব, নিস্পন্দ আজ কমরেড বিমল সিংহেব দেহ। কিন্তু উগ্রপন্থার বন্ধ্যাপথ, তাদেব মদতদানক'বী বাজনীতি যা গবীব মানুষেব উপকাব করে না, শান্তি-মৈত্রী-ঐক্য ও উন্নযনেব পথেব কাঁটা হযে দাঁড়ায় — এই বাস্তব সত্যকেই তুলে ধরে বিধান সভায় তাঁর শেষ ভাষণে কমরেড সিংহ কংগ্রেস, টি. ইউ. জে এস, টি এন. ভি সদস্যদেব উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'আপনারা সহযোগিতা করুন। আসুন রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত কোণে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ আবার ব্যাপকভাবে পৌছে দেই।' উগ্রপন্থী কার্যকলাপ জাতি উপজাতি নির্বিশেষে সব অংশের গরীব মানুষের যে ব্যাপক ক্ষতি করছে, বিশেষত স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে যেভাবে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তা উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ সেদিন বলেছিলেন, আমরা একটা বিবাট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা কবছি। এই চ্যালেঞ্জেব মধ্যে দাঁড়িযেও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দূর দূবান্তে পৌছে দিচ্ছি। বামফ্রন্ট সবকাবের আন্তবিক প্রযাস ছিল বলেই উগ্রপন্থীদের হুমকির মধ্যেও পালস্ পোলিও কর্মসূচী সফল কবা গেছে। এই কর্মসূচী সফল কবতে গিয়ে উগ্রপন্থীদের আক্রমণে চিকিৎসকদের এসকর্টরত নিবাপত্তা রক্ষীরা পর্যন্ত প্রাণ দিয়েছেন। শিশুদেব পালস্ পোলিও কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা দিতে উগ্রপন্থীদেব এই আক্রমণ নিষ্ঠুব নয়, অমানবিকও। উপজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সম্প্রসাবিত হচ্ছে না — টি.ইউ.জে এস সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার এই অভিযোগকেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ সেদিন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বলেছেন প্রত্যন্ত এলাকায় হেন জায়গা নেই যেখানে শত সমস্যার মধ্যেও আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিনি। উগ্রপন্থীরা উন্নয়ন কাজে যেভাবে বাধা দিচ্ছে সেজন্য বিরোধী সদস্যদের নজর দেবার আহ্বান জানিয়ে কমরেড সিংহ সেদিন বিধানসভায় বলেছিলেন, এভাবে চলতে পারে না। আপনারা সহযোগিতা করুন, উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে দিন। উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ক্ষেত্রে বিরোধীদেরও ভূমিকা পালনের ইঙ্গিত তিনি সেদিন তাঁর ভাষণে রাখেন। আহ্বান জানিয়ে বলেন — আমি আশাবাদী তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে।

— ডেইলি দেশের কথা, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮

"এই হীন চক্রান্ত চূর্ণ করতেই হবে"

বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী শোষক কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের হীন ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন সি.পি.আই (এম)-র অন্যতম নেতা রাজ্যের স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী কমরেড বিমল সিংহ। মঙ্গলবার দুপুরে কমলপুরের আভাঙ্গায় এন. এল. এফ. টি নামধারী ঘাতক বাহিনী কমরেড বিমল সিংহ ও তাঁর ছোট ভাই সরকারী শিক্ষক বিদ্যুৎ সিংহকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে বামফ্রন্ট বিরোধী মারাত্মক ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জনগণের দুশমন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিল। বামফ্রন্টের শক্তির উৎস উপজাতি অনুপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক মৈত্রী ধ্বংস করার জন্য ক্রমাগত প্ররোচনা ও উস্কানিমূলক আক্রমণ চালিয়ে আসছিল। ভোটের আগেই বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভোট বানচালের জন্য জনগোষ্ঠীগত সংঘর্ষ বাঁধাতে নিরীহ নারী পুরুষকে গণহত্যা করিয়েছিল সন্ত্রাসবাদী ঘাতকদের দিয়ে। তাতেও ষড়যন্ত্র হাসিল করতে না পেরে সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে বামফ্রন্ট সমর্থক বহু ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়।

কমলপুরে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলো বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাটি ধ্বংসের জন্য ক্রমাগত হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে আসছিল। গত ক'বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছিল, আক্রমণ চালানো হচ্ছিল নিরীহ নারী পুরুষের উপর। কিন্তু এত হিংস্র আক্রমণের মুখোমুখি হয়েও সি.পি.আই(এম) উপজাতি অনুপজাতি জনগণের ঐক্য চোখের মণির মত রক্ষা করে ঘৃণ্য চক্রান্ত প্রতিহত করে আসছিল। জনগণের এই সংগ্রামী মনোবল ভেঙ্গে দিতে সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে গত সেপ্টেম্বর মাসে সি.পি.আই(এম)-র বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রণজিৎ ঘোষকে অপহরণ করায়, এডিসির সদস্য নগদী রিয়াংকেও অপহরণ করায়। কমলপুরবাসীর জনপ্রিয় নেতা কমরেড বিমল সিংহকে খুনের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের লেলিয়ে দেয়া হয়। ভোটের কদিন আগে সন্ত্রাসবাদীরা কমরেড বিমল সিংহের ছোটভাই বিক্রম সিংহকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ সমস্ত ষড়যন্ত্র, কুৎসা, অপপ্রচারের জাল ছিন্ন করে বামফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়ী করেছেন। জনগণের রায় পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মেনে নিতে রাজি নয়। ঘাতকদের লেলিয়ে দিয়েছে সি.পি.আই(এম) বামফ্রন্ট নেতাদের খুন করতে। বামফ্রন্ট বিরোধী অশুভ শক্তির এ পথ ইতিহাসের বন্ধা পথ। জনগণের নেতাকে খুন করে বামপন্থী - গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাটি ধ্বংস করা যাবে না। যে মুষ্টিমেয় যুবককে বিপথগামী করে ঘাতকে পরিণত করা হয়েছে, এদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। সন্ত্রাসবাদী ও তাদের মদতদাতাদের সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন করে শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের ঐক্যকে আরও ব্যাপকতর ও সুদৃঢ় করে জনগণের দুশমনদের হীন চক্রান্ত চূর্ণ করতে হবেই।

— *সম্পাদকীয় 'ডেইলি দেশের কথা', ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮*

দেশের জন্য কমিউনিস্টদের আত্মবলিদানের ইতিহাসে কমরেড বিমল সিংহ চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন

হরকিষাণ সিং সুরজিৎ

শহীদ কমরেড বিমল সিংহের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানাতে হলে সংহতি ও দেশপ্রেমের লড়াই এগিয়ে নিতে হবে। দেশের জন্য কমিউনিস্টদের আত্ম বলিদানের ইতিহাসে কমরেড বিমল সিংহ চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন। কমরেড সিংহ তাঁর জীবন দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, সংহতি একতার সংগ্রামে ত্রিপুবার সংগ্রামী জনতার ঐতিহ্যধারা জারী রাখার ঘোষণাই দিয়ে গেছেন। এদেশের লক্ষ কোটি মানুষকে তাঁদের মুক্তির সংগ্রামে, দেশপ্রেমের লড়াইতে সমবেত করাই হবে শহীদ সাথীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্বত্র সমস্ত শক্তি দিয়ে তা কার্যকর করুন।

জাতীয় সংহতি রক্ষার সংগ্রামে কমরেড বিমল সিংহের এই আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়। দেশ মাতৃকার এই মহান সন্তানকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। স্বাধীনতার সংগ্রামের দিনগুলি থেকে শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা রক্ষাব সংগ্রামেও এ দেশের কমিউনিস্ট, বামপন্থী আন্দোলনের বহু কর্মী নেতা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তারা এদেশের স্বাধীনতা সংহতি বক্ষার জন্য কাজ করে গেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলন মহান সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

সাবা দেশের দিকে যদি তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন বিচ্ছিতাবাদী সংহতি বিনাশী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছে। এই অপশক্তি মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিভিন্ন দাবির আন্দোলন বিচ্ছিন্নতার ভুল পথে চলে যাচ্ছে। সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত করা হচ্ছে মানুষকে। কিন্তু ত্রিপুরার চিত্র অন্যরকম। এখানে যথেষ্ট প্রতিকূলতা সত্বেও লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে জাতি উপজাতির মানুষ ঐক্যবদ্ধ। ঐতিহাসিক কারণে এখানকার জনসংখ্যার মধ্যে জাতি উপজাতির

মানিকভাণ্ডারে পার্টির বিভাগীয় দপ্তরে বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য

আনুপাতিক হারের বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেলেও জাতি উপজাতির মধ্যেকার ঐক্য গড়ে উঠেছে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। এজন্য আমরা গর্বিত।

শুধুমাত্র মানুষের একতাই নয়, এ রাজ্যের উন্নয়নে প্রগতির স্বার্থেও ত্রিপুরার মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস সারা দেশের সামনে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের দুর্গম, যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এই রাজ্য। বাইরে যেতে হলে বিমানপথের ব্যয়বহুল মাধ্যম ব্যবহারে এখানকার মানুষ বাধ্য। উৎপাদিত সামগ্রী বাইরে বিক্রিরও সুযোগ নেই। তাই উন্নয়নের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরা। কিন্তু এখানকার বামফ্রন্ট সরকার যতটুকু সাধ্য আছে সবটা করার প্রয়াস চালাচ্ছে। দেশের কয়টা রাজ্য এরকম আছে? এখানেই অন্য দলের সরকারের সাথে কমিউনিস্টদের পার্থক্য । কমিউনিস্টদের কাছে আত্মস্বার্থ বলে কিছু নেই। কেন্দ্রে আঠারো মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিল। ত্রিপুরার সমস্যা উপলব্ধির চেষ্টা করেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। তার ফলেই রেলপথ সম্প্রসারণসহ বেশ কিছু দাবি পূরণে এবং এগুলি বাস্তবায়নের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস দলের কল্যাণে এই সরকারটি টিকতে পারলো না। রাজীব হত্যাকাণ্ডের সাথে ডি.এম.কে দলকে জড়িয়ে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবিতে ঐ সরকার ফেলে দিল কংগ্রেস। যে জৈন কমিশনের রিপোর্টকে তারা ছুঁতো হিসেবে ব্যবহার করল সেই রিপোর্টের কোথাও ডি.এম.কের জড়িত থাকার কথা নেই। যে ২৬ জনকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে তারাও ডি.এম.কের কেউ নয়। অথচ জৈন কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে ডি.এম.কে কে মন্ত্রিসভা থেকে তাড়ানোর দাবি করল কংগ্রেস। গতকাল প্রকাশিত জৈন কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টেও কংগ্রেসের বক্তব্য কত অসার তা আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে।

বরাবর কংগ্রেস দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে সমস্ত বিষয়কে দেখে আসছে। এটা তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি তারা না পাল্টায়, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে জনগণের জন্য যদি কর্মসূচী গ্রহণ না করে, পরিস্থিতিি থেকে যদি শিক্ষা না নেয় — তবে কংগ্রেস দল তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন রাজ্য সরকারের কাজকর্মেই হস্তক্ষেপ করেনি। বরঞ্চ সবার সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল। দেশের স্থিতিশীলতার জন্য কেন্দ্র রাজ্যের এই সুসম্পর্কই প্রয়োজন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। কোন একটি দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বি. জে. পি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়েছে এটা ভুয়া। যুক্তফ্রন্টে বিভাজন ঘটিয়ে তেলেগু দেশমকে ওদের পক্ষে নিয়ে গেছে। এই সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সফরে এসে কারোর সাথে কোন আলোচনা না করেই এককভাবে বলেদিলেন — তিনি সেনা বাহিনীকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রশ্ন হল — কোন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলে সেনা বাহিনী নামানো হয়েছে? দেশ বিরোধী শত্রু অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, নানাভাবে মদত পেয়ে সশস্ত্র অভিযান চালাচ্ছে। তাদের মোকাবিলা কিভাবে হবে? সংহতি একতার শত্রুর বিরুদ্ধে কেন সেনাবাহিনী নামানো হবে না? এছাড়া কার্যকর ভাবে মোকাবিলায় আর কী উপায় আছে। যেখানে বিদেশী শক্তি সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে সেখানে রাজ্য সরকার কী করে তা মোকবিলা করতে পারে? এসব নিয়ে কারোর সাথে কোন আলোচনা না করেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী কী করে এমন নীতিগত বিষয়ে একতরফা কথা বলেন? আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সেনা বাহিনী ব্যবহারের কথা আমরাও বলি না। কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কি নেহাতই আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলার সমস্যা?

প্রতিরক্ষামন্ত্রী যে অভিমত প্রকাশ করেছেন এই দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থের পরিপন্থী। যেখানে ত্রিপুরার মত রাজ্যের সরকার সংহতি ঐক্য বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লড়াই চালাচ্ছে, বিমল সিংহের মত বীরেরা শহীদের মৃত্যু বরণ করছেন, দেশ বিরোধী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করছেন না বীর জনগণ — সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উচিত রাজ্য সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। অথচ সম্পূর্ণ অন্য সুরে কথা বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আমরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।

বি.জে.পি যেভাবে সরকার চালাতে চাইছে এভাবে দেশ এগুতে পারে না। দলীয় নির্বাচনী ইশ্‌তেহার সরিয়ে রেখে বাজপেয়ী বলেছেন "জাতীয় কর্মসূচী" নিয়ে নাকি সরকার চলবে। অথচ তাদের জোটের ১৮ দলের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। জয়ললিতা, মমতা, আকালী-একেক দলের স্বার্থ উদ্দেশ্য একেক রকম। সংসদে আস্থা ভোটের বিতর্কের সময়ও ঐ "জাতীয় কর্মসূচীর" আড়ালে যে গোপন কিছু কর্মসূচী রয়েছে তা বলেছেন সাংসদরা। "জাতীয় কর্মসূচী" ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং গতকালও বলেছেন — তাদের মন্দির কর্মসূচী রয়ে গেছে। মন্দির নির্মাণের জন্য নাকি তিনটি কারখানাতে নির্মাণ সামগ্রী তৈরী হচ্ছে।

দেশের আজ যা পরিস্থিতি তাতে কোন একটি দল এককভাবে সরকার চালাতে পারবে না। তেমনি সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে ওঠে দেশের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে না পারলে সরকার টিকবে না। জোটের আঠারো দল ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এ অবস্থায় দেশ চালাতে পারবে না বি.জে পি। ত্রিপুরায় আমরা বামপন্থীরা একটি ফ্রন্ট গড়ে এত বাধার মধ্যেও কী করে সরকার চালাতে পারছি। এর অন্যতম কারণ কমিউনিস্টদের কর্মসূচীতে ব্যক্তিগত স্বার্থের কোন স্থান নেই। বামপন্থীদের সমস্ত কাজ মানুষের জন্য। এজন্যই এত ষড়যন্ত্র, আক্রমণ, বাধা সত্ত্বেও আমরা কেবল টিকেই আছি তা নয়, বামপন্থীদের শক্তি ক্রমশঃ বাড়ছে। তৃতীয় শক্তিকে আরও মজবুত করার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তৃতীয় বিকল্পকে আমরা শক্তিশালী করবো। তেলেগুদেশমের সমর্থন, ২জন মনোনীত সাংসদের ভোট সব মিলিয়ে বি.জে.পি যে অর্থনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদায় করেছে — এটাই শেষ কথা নয়। তেলেগুদেশমের ভূমিকা ইতিমধ্যেই জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। তা দেশবাসী অনুমোদন করে না। বরঞ্চ সংযুক্তমোর্চাকে শক্তিশালী দেখতে চান মানুষ। এজন্য আমাদের প্রয়াস লাগাতর জারি থাকবে। ত্রিপুরার জনগণের একতা ও গণতন্ত্রের বিকাশ ধারায় এ রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের সুযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। সারা দেশের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ত্রিপুরার সংগ্রামী জনতা।

কমরেড দশরথ দেব জাতীয় জীবনের স্রোতধারার সাথে জাতি উপজাতির ঐক্য জুড়ে দেয়ার সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরই একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন কমরেড বিমল সিংহ। সারা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ত্রিপুরার এই দৃষ্টান্ত শক্তি যোগাচ্ছে। কমরেড বিমল সিংহের আত্ম বলিদান সারা দেশকে আবারও জানান দিয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশ বিরোধী শক্তিকে কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবেন দেশপ্রেমিক জনগণ। কমরেড সিংহের শহীদান তাই দেশের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রেরণা। লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমবেত করে এই সংগ্রামে আমাদের আগুয়ান হতে হবে। এটাই হবে দেশমাতার এই মহান সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃত পথ। (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে সি পি আই (এম) আয়োজিত কমঃ বিমল সিংহ স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণ।)

— ডেইলি দেশের কথা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৮

বিমল সিংহকে হত্যা করলেও তাঁর আদর্শকে রোখা যাবে না

বৈদ্যনাথ মজুমদার

বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ড একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। গভীর ষড়যন্ত্র করে ওরা বিমলকে খুন করেছে। সন্ত্রাসবাদীদের পেছনে রয়েছে আই.এস.আই, সি.আই.এর মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সেই সাথে রাজ্যের হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। বিমল সিংহকে একটি রাজনৈতিক দলের লোকেরা খবর দিয়ে ফাঁদে ফেলে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করেছে। বামপন্থী আন্দোলন এবং রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত করতে প্রতিদিন বামপন্থী নেতা, কর্মীসহ সাধারণ মানুষকে যেভাবে খুন অপহরণ করা হচ্ছে, এই হত্যাকাণ্ড এই চক্রান্তেরই অঙ্গ। সাময়িক লাভের জন্য সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই ঘটনা সংগঠিত করা হচ্ছে। এভাবে আন্দোলন ও অগ্রগতি স্তব্ধ করা যায় না। এই ধরনের রাজনীতি দেশকে, রাজ্যকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে। ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। তাই বিরোধীসহ দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন, খুন, অপহরণ, হত্যা বন্ধ করতে সমবেতভাবে সোচ্চার হোন। সোচ্চার হোন এদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে।

আটষট্টি সালে কৈলাসহর কলেজে অধ্যক্ষের অনিয়মিত কাজের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। সেদিন বিমল সিংহ আমাকে বলেছিল 'প্রাণ থাকতে আমি আমার দাবি থেকে সরব না।' পরবর্তীকালে ছাত্রসংসদের নেতৃত্ব দেন বিমল সিংহ। সত্তর সালে ৫৪টি চা-বাগানের শ্রমিকরা মজুরির দাবিতে ১৭ দিনের ধর্মঘট করে। ঐ আন্দোলনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য চাঁদা তোলা এবং তাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন কমরেড বিমল। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিমল সিংহ মানুষের স্বার্থে সংগ্রাম করে গেছেন। সংগ্রাম থেকে একদিনের জন্য তিনি বিচ্যুত হননি। বিমল সিংহের জীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি ছিলেন অসম্ভব সাহসী। ভয়ডর বলে তাঁর কোন বিষয় ছিল না। বিমল সিংহের জীবনের একটা আকর্ষণীয় দিক ছিল তিনি শ্রমিক কৃষক থেকে শুরু করে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে পারতেন। বিমল সিংহের জীবনের একটা বড় গুণ ছিল তিনি অনেকগুলি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। সব চাইতে বড় কথা হল তিনি উপজাতিদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন এবং খুব সহজেই আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। মানুষের বড় প্রিয় ছিল বিমল। তাঁকে খুন করতে পারলেও তাঁর মতাদর্শকে ওরা হত্যা বা রুখতে পারবে না। বিমল সিংহের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করাই এখন আমাদের বড় দায়িত্ব। বিমল সিংহ রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। অকুতোভয়, অসম সাহসী এই বীর যোদ্ধাকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রে ফাঁদ পেতে ছিল প্রথমে ছোটভাইকে অপহরণ করে। বিমল সিংহ ছিল সংগ্রামের পুরোভাগে। গত দু'বছরে কমলপুর বিভাগে গভীর চক্রান্ত হয়েছিল জাতি উপজাতির মানুষের সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য। কিন্তু কমঃ বিমল সিংহ তা হতে দেননি। বিমল সিংহ আমাদের হৃদয়ে থাকবে চিরকাল। তাঁর আদর্শকে আমরা বয়ে নিয়ে যাবো। এটাই আজকের শপথ। (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে সি.পি.আই (এম) আয়োজিত বিমল সিংহ স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণ।) *—ডেইলি দেশের কথা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

সন্ত্রাসবাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই

দশরথ দেব

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম বলিষ্ঠ নেতা কমরেড বিমল সিংহ এন.এল.এফ.টি ঘাতক বাহিনীর হাতে গত ৩১ শে মার্চ খুন হয়েছেন। তাঁর সহোদর বিদ্যুৎ সিংহকেও সন্ত্রাসবাদীরা একই সঙ্গে হত্যা করেছে। আমি এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছি। আমার সহযোদ্ধা কমরেড বিমল সিংহের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার একুশ দিনের মাথায় মন্ত্রিসভার একজন সদস্যের খুনের ঘটনা সন্ত্রাসবাদীদের বেপোয়ারা আক্রমণাত্মক অভিযানেরই সাক্ষ্য বহন করছে।

এই ক'দিনে রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের উপর সন্ত্রাসবাদীরা মরিয়া আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। অন্যদিকে খোয়াই মহকুমার আমপুরায় টি.এস.আর বাহিনীর জওয়ানদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ উপজাতি জনগণের উপর নিন্দনীয় হামলা সংগঠিত করেছে টি.এস.আর বাহিনীর একদল উচ্ছৃঙ্খল জওয়ান। এইভাবে উভয় দিক থেকে উস্কানি ও প্ররোচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করার কাজ শুরু করেছে। কমরেড বিমল সিংহের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, উপজাতি অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু সশস্ত্র যুবকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অ-উপজাতি অংশের কিছু সমাজ বিরোধী ঐ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের এইসব অ-উপজাতি সমাজ বিরোধীরা এন.এল.এফ.টি সন্ত্রাসবাদীদের সক্রিয় কর্মী বলে চিহ্নিত হয়েছে। অথচ এই উগ্রপন্থী তৎপরতার জন্য এরাই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানাচ্ছে। নব নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার জন্য এখনি দাবি করছে।

এই ঘটনা থেকে এটা পরিস্কার যে, বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে পরাস্ত করার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটের যে গোপন বোঝাপড়া হয়েছিল তাতে কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা সফল হলেও সব জায়গায় এই কৌশল বাস্তবে রূপ পায়নি। রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের শান্তি ও সম্প্রীতিকামী জনগণ এইসব ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে বামফ্রন্টকে বিধানসভার দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী করেছেন এবং লোকসভার দুটি আসনেও বামফ্রন্ট বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছে। জনগণের এই রায়কে পদদলিত করে এইসব রাজনৈতিক দল ও সন্ত্রাসবাদীরা নতুন করে আক্রমণ সংগঠিত করতে শুরু করেছে।

আমি আগেও বলেছি, এখনও বলতে চাই, সন্ত্রাসবাদী এই পথের কোন ভবিষ্যৎ নেই। অনেক রক্ত ওঁরা ঝরাতে পারে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে জাতি উপজাতির কারো কোন সমস্যার সমাধান অসম্ভব। বরং এসব ঘটনার ফলে উপজাতি জনগণ, প্রত্যন্ত এলাকায় জুমিয়া পরিবারগুলি দুঃসহ যন্ত্রণার শিকার। অনেক জায়গায় উন্নয়নের কাজে যথাযথ সাফল্য অর্জিত হতে পারছে না এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য।

ত্রিপুরা রাজ্যের উভয় অংশের জনগণকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক

প্রতিরোধ আরও জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি। সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় রাজ্য সরকার যাতে অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে পারে তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত প্রকার সাহায্য সহযোগিতা দিতে হবে। প্রশাসনগতভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারকে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

সর্বোপরি, জাতি উপজাতি ঐক্য ও মৈত্রী অক্ষুণ্ন রেখে দেশী-বিদেশী শক্তির মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে। রাজ্যের গণ আন্দোলনের ভিত্তিকে দুর্বল করতে দেয়া হবে না।

সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য যারা সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য ও মদত দিচ্ছেন, তারা জাতীয় সংহতির বিরাট সর্বনাশ ডেকে আনছেন। আমি এসব রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, এই আত্মঘাতী পথ থেকে নেতাদের সরে আসতে বলুন। আপনারা শান্তি ও সম্প্রীতির শিবিরকে শক্তিশালী করুন। কেননা উন্নয়নের প্রধান শর্তই হল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। সন্ত্রাসবাদের এ বন্ধ্যা পথ ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। সন্ত্রাসবাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই।

(৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে স্মরণসভায় প্রদত্ত ভাষণ।)

— ডেইলি দেশের কথা, ৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮
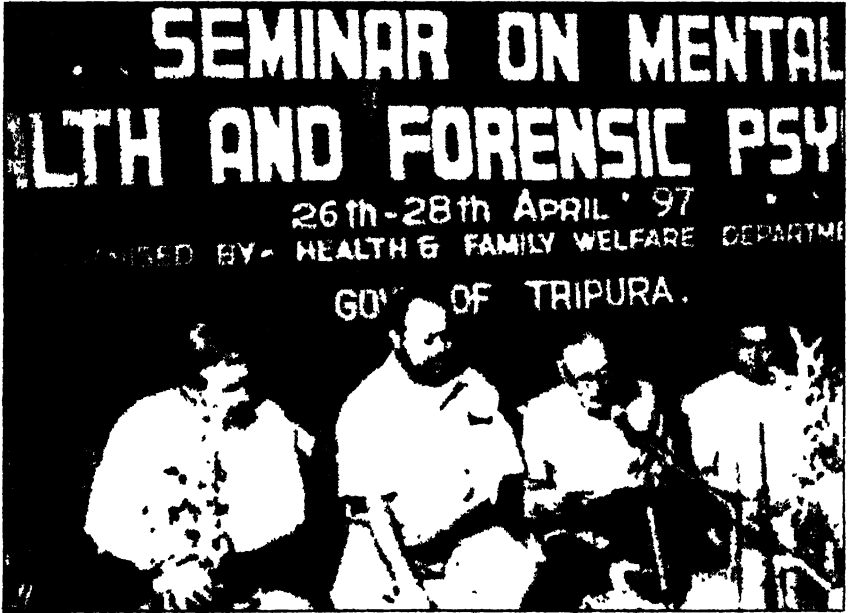
২৬-২৮ এপ্রিল, ১৯৯৭ মানসিক রোগ প্রতিকার শীর্ষক সেমিনারে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব সহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বিকাশ রায় প্রমুখ।

বিমল সিংহের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ঐক্য সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষায় শপথ নিন

মানিক সরকার

আমি প্রথমেই প্রয়াত জননেতা বিমল সিংহ এবং তাঁর ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের শোকার্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি জানাচ্ছি আমার অন্তরের সহমর্মিতা। আমি প্রথমেই এটা বলতে চাই এই হত্যাকাণ্ড একটি পরিকল্পিত এবং ঘৃণ্য হত্যাকান্ড। নির্বাচনের অনেক আগে থেকে এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত কর্মসূচী নিয়ে জণগণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত অবাম রাজনীতিকরা বামফ্রন্টের জয়কে ঠেকাতে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে ব্যবহার করে নির্বাচনের আগে খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ, অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে সম্প্রীতি, একতা, সংহতি, বিনষ্ট করে অস্থিরতা এবং দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের এই ষড়যন্ত্রে রাজ্যের জাতি উপজাতি জনগণের জীবন সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, নিরাপত্তা কর্মী, সরকারি কর্মীকে জীবন দিতে হয়েছে। নির্বাচন বন্ধের দাবিও জানানো হয়েছে। সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে রাজ্যের জাতি উপজাতির শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক জনগণ একতা রক্ষা করে নির্বিঘ্নে নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন। এটা সারা দেশে দৃষ্টান্ত। এই নির্বাচনের কৃতিত্ব জণগণ, নিরাপত্তাকর্মী, ভোটকর্মী সবার।

ষড়যন্ত্রে সফলকাম হতে না পেরে একতা শান্তি সমৃদ্ধি এবং সংহতির শত্রুরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একের পর এক ঘটনা সংগঠিত করেছেন। অপরদিকে একতা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সংহতি রক্ষায় আমরা সংগ্রাম করে চলেছি। এই সংগ্রামে চিরভাস্বর নাম কমরেড বিমল সিংহ। আমরা বিমল সিংহের খুনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং নিন্দা জানাচ্ছি। বিমল সিংহের খুনের মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্র শেষ হয়ে যায়নি। এর পরের সংগঠিত ঘটনাগুলি তার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। কিন্তু জনগণের মধ্যে থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করেছে। কোন রকম প্রবঞ্চনা বা তঞ্চকতা করেনি। যেখানে সমস্যা এসেছে জনগণকে সাথে নিয়ে সে সমস্যা অতিক্রমের চেষ্টা করেছে। ফলে বামফ্রন্টের প্রতি মানুষের যে আস্থা তৈরি হয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার। এই সরকার যখন জটিল বহুমুখী সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে তখন ঘৃণ্য এবং হিংস আক্রমণ এই উদ্যোগকে ব্যাহত করে দিতে চাইছে। আমরা বলছি এই বন্ধ্যা পথে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। শহীদদের রক্তের পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে আমরা আজ এখানে পৌছেছি। রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সহযোগিতা নিয়ে আগামীদিনে কঠিন পথ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো।

রাজ্যকে যারা ভালোবাসেন, দেশকে যারা ভালোবাসেন, যারা দেশের ঐক্য সংহতি সুস্থিতি রক্ষার পক্ষে তারা আসুন একতা রক্ষার পক্ষে। আপনাদের সাথে আমাদের প্রতিযোগিতা হোক আদর্শ এবং কর্মসূচীর। এখানে দলের স্বার্থে নয়, রাজ্যের স্বার্থে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের পশ্চাদপদতা দূর করতে, দেশের ঐক্য, সংহতি, সুস্থিতি রক্ষায় এগিয়ে আসুন। ছেলেদের বোঝান, ভুল পথ থেকে

ফিরিয়ে আনুন। ইতিবাচক বাস্তবধর্মী প্রস্তাব থাকলে দিন, আইনসভার ভেতরে হোক বাইরে হোক। আমরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তা পরীক্ষা করবো। প্রয়োজনে গ্রহণ করবো। আমরা আস্থা রাখি, আপনারা তা করবেন। আর না করলে জনগণ আপনাদের ঘৃণা করবে, বিচ্ছিন্ন করবে, ক্ষমা করবে না। রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করতে পারলে, সেচ, বিদ্যুৎ কৃষি নির্ভর শিল্প স্থাপন, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো এবং বেকার সমস্যা দূর করতে পারলে রাজ্যের যুবকদের বিভ্রান্ত করার কোন সুযোগ থাকবে না।

হতাশা দূর করতে আইনগত সংগ্রামের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখতে হবে। উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্য, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশের ব্যাপারটি মাথায় রেখে আমরা কাজ করবো। এর পরেও সন্ত্রাসবাদ চালানোর চেষ্টা হলে, একতা সম্প্রীতি সুস্থিতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা হলে কোনরকম আপোষ করা হবে না। সম্প্রতি দেশের রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করে রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেছি। রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, রাজ্যের ঐতিহাসিক সংখ্যা গুরু এবং সংখ্যা লঘু সমস্যা থাকার পরেও তোমরা যে স্থিতিশীল সরকার চালাচ্ছ এটা দৃষ্টান্ত। তোমাদের সামনে দেশের একতা রক্ষায় এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমার সরকার সহযোগিতা করবে। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে রাজ্য এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের পশ্চাদপদতা দূর করতে সহযোগিতার দাবি জানিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের একতা সংহতি রক্ষায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন কর্মসূচী গ্রহণের। আমরা বিশ্বাস করি ভারত এক দেশ। এক সংবিধান। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকার থাকবে। থাকবে আদর্শের প্রতিযোগিতা। কিন্তু দেশের একতা সংহতির প্রশ্নে কেন্দ্র সব রাজ্যকে সহযোগিতা করবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য একসাথে কাজ করবে। সম্পদের সুষম ব্যবহারে উদ্যোগ নেবে। রক্ষা করবে প্রতিশ্রুতি।

সি.পি.আই (এম) এবং বামফ্রন্টের কর্মসূচী পিছিয়ে পড়া বৃহৎ অংশের জনগণের স্বার্থে। বিমল সিংহ এই উপলব্ধি থেকেই ঐক্য ভাঙ্গার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সম্প্রীতি রক্ষায়, শ্রেণি সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। তাঁর হত্যাকান্ড বিরোধীদলের দুই একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বাদে সবাই নিন্দা করেছেন। তাই সৎ মানসিকতা, সৎ বিবেকবান মানুষের কাছে আবেদন, বিমল সিংহের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ঐক্য সংহতি সম্প্রীতি রক্ষায় শপথ নিন। এটাই হবে বিমল সিংহের প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিমল সিংহ স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণ।) — *ডেইলি দেশের কথা, ৬ এপ্রিল, ১৯৯৮*

বিমল সিংহের তাজা রক্ত ধুয়ে দিয়েছে ধলাই-এর জল

আভাঙ্গায় ধলাই নদীর যে ঘাটে কমরেড বিমল সিংহ ও তার ভাইকে সন্ত্রাসবাদীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে সেখানে এখনও তাজা রক্ত। ধলাই তার জলরাশি দিয়ে একটু একটু করে ধুইয়ে দিচ্ছে তার প্রিয় সন্তান বিমল সিংহের রক্ত। লংতরাই-এর মত উন্নত শির বিমল সিংহের রক্ত মিশে গেছে ধলাই-এর জলে। আবাল্য সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন ধলাই এবং লংতরাই-এর সঙ্গে কমরেড বিমল সিংহ। — *ডেইলি দেশের কথা, ২ এপ্রিল, ১৯৯৮*

এই ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মেষ করতে হবে

সুনীল দাশগুপ্ত

এই হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত। গভীর ষড়যন্ত্রের বলি হলেন রাজ্যের আপামর জনসাধারণের প্রিয় নেতা বিমল সিংহ। বিমল সিংহের নৃশংস কাপুরুষোচিত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মুখোশ উন্মেষ করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা রাজ্যের জনগণ, সরকার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ষড়যন্ত্রের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ বা কোন শক্তি এই ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়। সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন বিরোধীদের প্রতি জনগণকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সন্ত্রাসের পথ বন্ধ্যা পথ, এই পথ ছেড়ে আসুন। এই পথ দিয়ে ব্যক্তি এবং সমাজের কোন কল্যাণ হয় না। সন্ত্রাসবাদীরা অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতাকে আমাদের দূর করতে হবে। বিমল সিংহের মহান আদর্শকে আমরা বয়ে নিয়ে যাব। তাঁর অসম্পন্ন কাজকে আমাদের সম্পন্ন কবতে হবে। বিমল সিংহের আদর্শকে অম্লান রেখে, শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই বিমল সিংহের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা আমরা জানাতে পারবো। (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিমল সিংহ স্মবণ সভায প্রদত্ত ভাষণেব অংশ বিশেষ) — *ডেইলি দেশেব কথা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি রাখতে হবে

মুরারী মোহন সাহা

বিমল সিংহের মত এত জনপ্রিয় নেতাকে সন্ত্রাসবাদীরা যেভাবে হত্যা করেছে তার নিন্দা করার ভাষা আমার নেই। তবে আমাদের সন্ত্রাসবাদী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে। যারা বিমল সিংহকে হত্যা করেছে তারা জাতি উপজাতির শত্রু। এই ঘটনার পেছনে রয়েছে বিরাট ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রকে গুড়িয়ে দিতে হবে। কেননা এই অশুভ শক্তি জনগণের বুকে ছোবল দিতে উদ্যত। যদি এই অশুভ শক্তিকে মোকাবিলা করতে হয় তাহলে রাজ্যের মানুষকে নিয়ে গণ আন্দোলন জোরদার করতে হবে। আরও বেশি বেশি মানুষকে নিয়ে লড়াই সংগ্রাম করতে পারলেই আমরা এই অশুভ শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারবো। গণতন্ত্রের মূল স্রোতে সবাইকে সামিল করার মধ্য দিয়েই বিমল সিংহের প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে। (৫ই এপ্রিল. ১৯৯৮ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে প্রয়াত বিমল সিংহ স্মবণ সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ) — *ডেইলি দেশেব কথা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

আমাদের সংগ্রাম জারি থাকবে

ব্রজগোপাল রায়

এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার মত ভাষা আমার জানা নেই। এই ভয়ংকর ঘটনার পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যারা পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসতে চায় তারাই রয়েছে এই ঘটনার পেছনে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা মর্মাহত। বেদনা আমাদের অপরিসীম। এই বেদনাকে বুকে নিয়েই শান্তি সম্প্রীতির শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। আরও বেশি মানুষকে আমাদের সংগ্রামের পাশে নিতে হবে। আরও বেশি মানুষকে গণতন্ত্রের পতাকাতলে নিয়ে আসতে হবে। (৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রয়াত বিমল সিংহ স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ) — *ডেইলি দেশের কথা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

কমরেড বিমল সিংহের লেখা একটি গান

১৯৮৪ সালে এক সন্ধ্যা। কমঃ বিমল সিংহ তখন ত্রিপুরা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার। মেলার মাঠের সরকারি বাসভবনে বসে কথা হচ্ছিল ত্রিপুরা উপজাতি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে। বললাম— জুনের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা এবং শান্তিকামী মানুষের প্রতিরোধের উপর একটি গান লিখতে। এক কথায় রাজি। বললেন, লেখো। বিমলদা চোখ বুজে বলে গেলেন, আমি লিখলাম। — চন্দন সেন

দুই চোখে প্লাবন নামে, পাহাড় কাঁদে মাঠ ধরে

বিমল সিংহ

সবুজ দেশের মাটি, সোনার চেয়ে খাঁটি
তবু কেন উপোষ মরে আমার দেশের চাষী
মন্দিরের ঘন্টা, মসজিদের আজান
এই মাটিতে ভোরের বেলায় ছড়ায় ভালোবাসা
পাহাড় চূড়ায় বালিকা গলায় দোলে মালা
খাড়া পিঠে চলতে পথে হাসে খলখল —
যেন পাথর বেয়ে ঝর্ণা নামে লংতরাইয়ের বুকে।
তারই নিচে মাঠের পাশে শাড়ি পড়া কিষানি
ঝুমুর ঝুমুর চুড়ি বাজিয়ে কাস্তে হাতে কাটে ধান,
গুনগুনিয়ে ঘোমটা টেনে লাজুক মুখে গেয়ে গান
গড়িয়া পূজার আওয়ান পিঠা দেয় যে বোনের হাতে
দুর্গাপূজায় বাঁধে ফিতা পাহাড়ী বোনের খোঁপায়।
এমনি করেই মিলন গীতি বাজতো মধুর সুরে
এই ত্রিপুরার এমনি রীতি চলছে বছর ধরে।
তারপর একদিন শকুনের বিষাক্ত নিঃশ্বাস
ধারালো নখরে ছিন্নভিন্ন করে মানুষের লাশ।
গোমতীতে ভাসে মুণ্ডহীন মানুষ
শুধায় পাহাড়ী না বাঙালীর দোষ
বাসকীয় মতো ফণা তোলে নীল আকাশের নিচে
ঘর দিগন্তে কান্না হাহাকার
স্বামীহারা, শিশুহারা মায়েদের আর্তনাদ
তবু শকুনের তৃষা মিটেনা।
ও কিষানি কিষানি ব্যাকুল চোখে ডাকে পাহাড়ী
ও পাহাড়ী পাহাড়ী আকুল হয়ে খুঁজে কিষানি।
লুংগা ছড়া পাহাড় চূড়ায় একটু আওয়াজ করো .....
দুই চোখে প্লাবন নামে, পাহাড় কাঁদে মাঠ ধরে।

—ডেইলি দেশের কথা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৮

নিহত হবার মাত্র সাতদিন আগে ২৪ শে মার্চ, ১৯৯৮
কমরেড ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের স্মরণসভায় বিমল সিংহ

জনগণের সংগ্রামের মাঝে ই. এম. এস. বেঁচে থাকবেন

জনগণেব সংগ্রামেব মধ্য দিযে কমবেড ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ চিবদিন বেঁচে থাকবেন। তাঁব শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজ গঠনেব যে লডাই চলছে তাকে এগিযে নেযাব দাযিত্ব নিতে হবে সহযোদ্ধাদেব। কথাগুলি বলেছিলেন কমবেড বিমল সিংহ। এটাই ছিল তাব সর্বশেষ আবেদন। ২৪শে মার্চ কমলপুবে সি পি আই (এম) আযোজিত কমবেড ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদেব স্মবণসভায তিনি ছিলেন অন্যতম বক্তা।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্মবণসভায সর্বস্তবেব মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য বাখেন সি পি আই (এম) বাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীব সদস্য খগেন দাস, বিভাগীয সম্পাদক বঞ্জিত ঘোষ, বিমল সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বীবেন্দ্র পাল ছিলেন সভাপতি। কমবেড বিমল সিংহ তাঁব ভাষণে বলেছিলেন, ১৯৭০ সালে কেবালায এস এফ আই-এব সর্বভাবতীয সম্মেলনে গিযে কমবেড ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদেব সঙ্গে তাঁব প্রথম দেখা। এক এক কবে প্রত্যেক কমবেডেব খোঁজ নিতে দেখেছি তাঁকে। মার্কসবাদ লেনিলবাদকে উর্দ্ধে তুলে ধবে তিনি সাহিত্য বচনা কবেছেন। অসংখ্য গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। যেগুলি আমাদেব কাছে বিবাট সম্পদ। বাম বিচ্যুতিব বিকদ্ধে তাঁব আপোষহীন লডাই আমাদেব সামনে উজ্জ্বল প্রেবণা। নাম্বুদ্রিপাদেব জীবনাবসানে দেশেব শ্রমজীবী মানুষ হাবালো এক আলোকবর্তিকাকে। জনগণেব সংগ্রামেব মাঝে তিনি চিব জাগ্রত থাকবেন।

— *ডেইলি দেশেব কথা, ৮ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

কৈলাসহরে কোন এক অনুষ্ঠানের জন্য আমি ও ছোটবোন মঞ্জুলিকা একদল শিশু শিল্পীকে গান শেখাচ্ছিলাম। বিমলদা এলেন। একথা সেকথায় পর বললেন — "বাংলার লগে লগে (সাথে সাথে) অন্য ভাষার গানও শিখাও না কেন? — বলেছিলাম হিন্দি ভজন বা রাগসংগীত ছাড়া অন্যভাষার গান তো আমাদের তেমন জানা নেই। বিমলদা বলেছিলেন — না, না! আমি ইতা কইতেছিনা। তুমরার জানা গানটারেই অন্যভাষায় অনুবাদ করিয়া গাওয়ার কথা কইতেছি।" — অনুবাদ কে করবে? — ইটা একটা সমস্যা হইলনি! — নেও আমি একটা গানের মণিপুরী অনুবাদ করিয়া দেই।" আমাদের ঘর ভর্তি শিশু শিল্পীরা। তাদেরই একজনকে কোলে টেনে বিমলদা মেঝেতে বসে পড়লেন এবং ভূপেন হাজারিকার গাওয়া - (নিগ্রো গানের বাংলা অনুবাদ) "মোরা যাত্রী একই তরণীর .... গানটির বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অনুবাদ করে দিলেন—**মীরা বাগচি।**

"মোরা যাত্রী একই তরণীর ......
যদি সংঘাত হয় তবে ধ্বংস হবে
গর্ব মোদের প্রগতির"

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ — বিমল সিংহ

"আমি সালসি নৌ আগত
আকসাটে সালসি হাবি
কিতাপারা থিউইলে সুমউ তাঙ্গায়
নাপাল মুঙ্গে আগুয়ানির।।
প্রভু মিপ্লেংবেলা আটিংয়াতো
হে মহাপ্রভু ইনচিক সমুদ্রত
এ নৌগ টেইপাঙর, টেইপাং মানুর
উহাললো হংকরলো তিলমির নৌগ
মেরাকগর আহিগি পিঙ্গানা নিলুকা
উহানে পাউরি তোর মোর
হাক আহাল টেইপাঙ্গউ আহান।।

—ডেইলি দেশের কথা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮
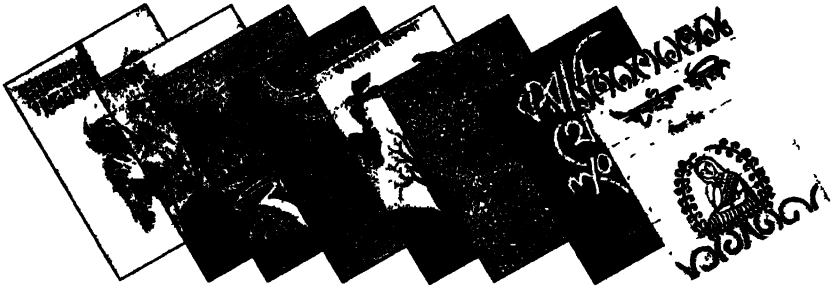
গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ এবং সম্পাদিত বইগুলিতে ভূমিকায় বিমল সিংহ লিখেছেন —

আলোর ঠিকানা (গল্প সংকলন, ২৬শে মার্চ, ১৯৮৩, নব চন্দনা প্রকাশনী, পূর্ববর্তী নাম চন্দনা প্রকাশনী)) ঃ শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখক বলতে যা বুঝায় আমি মোটেই সে ধরনের নই। তবু লিখতে চাই। চারদিকে আমাদের মাঠ পাহাড় নদী ছড়া বাগিচা। বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র পোষাক, তবু মিলনের ধারা চিরন্তন। কলকল বইছে পাহাড়ী ছড়ার মতো। সেই কলকলানি আনন্দ-বেদনার, সুখ-দুঃখের, নিরক্ষরতার, কুসংস্কারের বা মুক্তির। অপটু হাতে ভাষা দিতে চাই, আধো আধো কথা ছোট শিশুর মতো। যাদের জীবনকে নিয়ে আমার এই অনুভূতি তাদের হাতে সঁপে দিলাম।

লংতরাই (উপন্যাস, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৪ ও ২য় সংস্করণ জানুয়ারী, ১৯৮৭, নব চন্দনা প্রকাশনী) ঃ বিচিত্র পাখীর গানে, বন্যজন্তুর কলরবে, মানুষের হাসি কান্নায় আবেগে, দুঃখে, ছড়ার কলকলানীতে কৃষ্ণনীল বনের নিস্তব্ধতায় মুখরিত রহস্যময় লংতরাই পাহাড়। সেই জীবন থেকে অচাই তলবাংহা কয়েক ফোটা তেতো, মিঠা, কোনটা চোখের জলের মতো নোনতা মধু দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মনাইহাম (গল্প সংকলন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫, নব চন্দনা প্রকাশনী) ঃ গ্রামের পাড়ায়, পাহাড়ের টংঘরে বা সীমান্তের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে সুখ-দুঃখে বাজে বিষাদ আনন্দের মধুময় সংগীত। দেশী-বিদেশী বিষাক্ত দমকা ঝড়ে সুখ-দুঃখের ঘরগুলো কখনো ভাঙে। সংগঠিত বা অসংগঠিত চেনা অচেনা মানুষ লড়ে মরে পথে বিপথে জয়-পরাজয়ে, তাদেব কথা ভাষা দিতে চাই। কখনো হয় কখনো হয় না। তবু লিখতে চাই।

তিতাস থেকে ত্রিপুরা (উপন্যাস, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, নব চন্দনা প্রকাশনী) ঃ ত্রিপুরা এক ছোট রাজ্য। পাহাড়ে, লুঙ্গায় জাতি উপজাতি মিশ্র জনপদ। কেউ আসে তিতাস পাড়ের গ্রাম ছেড়ে। ছিন্নমূল বহু মানুষের বুকের ব্যথা নিঃশব্দে বাজে এখনো। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি কখনো থমকে দাঁড়ায় কখনো বা পাহাড়ী ছড়ার মতো কলকল বয়। পাহাড়ী মানুষ বুকের দুয়ার খুলে ছিন্নমূলদের হৃদয়ে বসায়। তারই মাঝে কেউ ক্ষত-বিক্ষত ভালোবাসার সওদা নিয়ে ঘোরে ফেরার পথে। তিতাস পাড়ের ছিন্নমূল মাছ বেপারী রেবতী দাস, আর বাদাম ফেরীওয়ালা মনো সাহা আজকে ত্রিপুরার বাসিন্দা। তাদের সহযোগিতার সাথে ত্রিপুরার চেনা অচেনা মৎস্যজীবীদের দরদঢালা সহানুভূতির কাছে চিরঋণী। জাতি-উপজাতির মিলন-সেতু দৃঢ় করতে এগিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ান সাহিত্যিক ননী কর। জাতি-উপজাতির মিলন-ব্যাকুলতা নিয়ে থাকা মানুষের হাতে সঁপে দিচ্ছি "তিতাস থেকে ত্রিপুরা"।

করাচি থেকে লংতরাই (বড় গল্প, আগরতলা বইমেলা, ১৯৮৯, ত্রিপুরা দর্পণ) ঃ ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে করাচি থেকে আগত একটি বিমান ত্রিপুরার লংতরাই পাহাড়ে ভেঙে পড়ে। ধূসর অতীতের সেই কাহিনী খুঁজে আনা বড় কঠিন। আমার পিতৃদেবের মুখে শোনা সেই কাহিনীকেই জোড়া দিতে চেয়েছি—অন্যদের মুখে শোনা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ঘটনার সাথে। কোন সরকারী রেকর্ড দেখার সুযোগ হয়নি। ভুল ভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। লেখার খাতিরে মাঝে মধ্যে কাল্পনিক নাম, কাল্পনিক চরিত্রের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সত্যি সত্যি যদি কারো জীবনের সঙ্গে মিল থেকে থাকে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত।

তখাপাড়ার ইতিকথা (উপন্যাস, আগরতলা বইমেলা, ১৯৯৪, ত্রিপুরা দর্পণ) ঃ দুঃখ নদীতে ভাসতে ভাসতে চলছে পাহাড় উপত্যকার জীবনধারা। কলহ বিবাদ, আনন্দ বিষাদের বিরহ মিলনের কিছু অগোছালো কথা লিখতে অনেক খ্যাত অখ্যাত মানুষের নাম আসে। খানিকটা কল্পনার রঙে রঙানো, খানিকটা নির্মম সত্য হতেও পারে। বাস্তব কারো চরিত্রের সাথে মিল থাকলেও তা অনিচ্ছাকৃত। কেউ মানসিকভাবে আহত হলে নিঃশর্তভাবে আগাম ক্ষমা চাইছি। তবু গহন বনে অন্তরালের কিছু মূর্চ্ছনা বেজে উঠুক দরদী পাঠকের কর্মব্যস্ত জীবনে কোন মুহূর্তে।

সত্যের আলোকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (প্রবন্ধ, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি) ঃ ইতিহাসের নির্মম গতিধারায় একটি মানব গোষ্ঠী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অবলুপ্তিব পথে ধাবিত। সেই ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠী আদি ভূমি মণিপুর থেকে উৎখাত হযেছে, এই উচ্ছেদ অভিযানও চলেছিল প্রায় তিন শতাব্দী ধরে। আদিভূমির নতুন দখলকারীরা সাজিয়ে বানিয়েছে বাস্তববর্জিত এক বিকৃত ইতিহাস। ভূ-খণ্ডের সমস্ত ঐতিহাসিক চিহ্ন, ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে ও অলক্ষ্যে অবহেলায় কিছু কিছু তথ্য হয়ে রয়ে গেছে। যাকে বিকৃত করেও বিকৃত হয়নি। তারই কিছু উপাদানের সমারোহ নিয়েই তৈরী হয়েছে ভীমসেন সিংহের এই দলিল। আশা করি এই দলিলের ধূসর ছড়ী ছেড়া পাতা এক নতুন আলোর ক্ষীণ শিখা হতাশার মধ্যে জ্বালাতে পারবে।

পৌরেই (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী প্রবাদ, এবাকা) ঃ যে গিরিগিথানীর থতাৎত হাকতাকে হাকতাকে অমৃতধারার সাদে পৌরেই নিকুলেসে ঔ নাং নাচিলেসি নিংশিঙর অতল সাগরে লেইমাঙ অপরেসিগা গিরিগিথানীরাং কাৎকরলাং। **বঙ্গানুবাদ ঃ** যে মহতীজনের শ্রীমুখ থেকে যুগে যুগে অমৃত ধারার মতো প্রবাদ বাক্য বেরিয়েছে, সেই সব জানা-অজানা, চেনা-অচেনা — যারা আজ স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হলো।

ববেইর য়ারী (রূপকথা, ডিসেম্বর, ১৯৯৬, ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজ সেল, এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা সরকার) ঃ ' ... টেইপাং এহানাত য়ারীর রাজা, রানী, কম্লুং, গড়া, বাদরর কচু রুয়ানি নেয়াও থাক। মোর হপনর মালেমহান সিলয়া গড়ায় খুরুপ দিতারা এবাকাও। কঙালা লাজে উদুরি লেইমার কাকালিত কলল পানি আনানির দৃশ্য উহান এবাকাও বেড়ে টাঙিয়া চেয়া থানা আহের। আনৌগ মালকর মিকুতর জিয়ে কঙালা সৌর রিদি ডহে ডহে যারগা উহান আজি পেয়াও ঠেগর মাঝিগত চহা অয়া বিদের। ফংকরে নুয়ারিল দুহানিয়ে ডুগ ডুগার ...'। **বঙ্গানুবাদ ঃ** '... সত্যিই, এ জগতে গল্পের রাজা রাণী, রাজমহল, ঘোড়া, বানরের কচু রোপণ না থাক — আমার স্বপ্নের আঙিনায় আজো ছড়িয়ে রয়েছে অশ্বের লম্ফন। কোমল লজ্জাপূর্ণা উদুরী লেইমার কোমরের জলপূর্ণ কলসী আনার দৃশ্য আজো চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। বিমাতার কূটচালে ছোট্ট শিশুর হৃদয় যেভাবে পুড়ে খাক হয়ে যায় তা আমার হৃদয় কুঞ্জে আঘাত হানে। যা প্রকাশ করতে না পারার দুঃখে বুক ধুক ধুক করছে... ।'

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে বিমল সিংহের অবদান

অপরাজিতা রায়

বিমল সিংহের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। তাঁর "আলোর ঠিকানা" গল্প গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। বইটা আমায় এনে দিয়েছিলেন শ্রীমান পূর্ণেন্দু গুপ্ত রিভিউ করার জন্য। "আলোর ঠিকানা" গল্প গ্রন্থ। গল্পগুলো পড়ে আমি মুগ্ধ। এইতো ত্রিপুরার খাঁটি লেখক। ত্রিপুরার নদী পাহাড় আর সেই পাহাড়ের আদিবাসী মানুষেরা, উদ্বাস্তু বাঙ্গালীও আছে তাদের সঙ্গে — এদের নিয়েই তাঁব গল্প। ত্রিপুরার গল্পকারদের লেখায় মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী পড়ে-পড়ে মনে হয়েছিল সাহিত্যেব মনোপলি বুঝি মধ্যবিত্ত জীবনের মননশীলতা আর সংস্কৃতির হাতে ধরা। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ আব আগরতলা কেমন মিলেমিশে একাকাব হয়ে যায়। আলাদা করে চেনা যায় না। বিমল সিংহের "আলোব ঠিকানা" আমাব সে ধাবণাকে একেবাবে পাল্টে দিল। শহুরে আবহাওয়ার সম্পূর্ণ বাইরে ত্রিপুবাব গ্রাম পাহাড়ে নদী ঝর্ণায যে জীবন ধারা প্রবহমান, সেখানে লেখার এত প্রচুর রসদ আছে, এসব তো জানা ছিল না আগে। এখানকাব মানুষগুলো তাদের কান্না হাসি, সুখ দুঃখ, আনন্দ উত্তেজনা নিয়ে যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে বাস করছিল, বিমল সিংহ আমাদেব সেখানে পৌছে দিলেন। সেখানে সবুজ গাছপালা ঘেবা গ্রাম, পাহাড়েব গায়ে জুমক্ষেত, প্রচুব বাঁশঝাড়, আব সবল মানুষেরা। এদেব মধ্যেই আছে গভীর প্রাণ স্পন্দন। গ্রামেব হাট, মাটির হাঁড়ী কলসী, শাক সব্জি , শুকনো মাছ—এই হাটেই ধবা আছে ত্রিপুবাব নিজস্ব জীবন ধারার আলেখ্য। তাঁব 'ইঙেললেইর মেয়ের বিয়ে" গল্পে দেখেছি মণিপুরী গ্রামের তাঁত বোনার ঐতিহ্য, ক্ষয়ে যাওয়া অর্থনৈতিক বঞ্চনার

প্রচ্ছদ : প্রশান্ত সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : স্বপন নন্দী (প্রথম মুদ্রণ)

শিকার হয়ে ভেঙে পড়া সেসব পরম্পরার ছবি।

"আলোর ঠিকানা" গ্রন্থে তিনি দেখিয়ে দিলেন, অনেক অকথিত কাহিনী ছড়িয়ে আছে এখানে মণি-মুক্তোর মত। একবারও তাঁকে গল্পের প্লটের জন্য শহরের দিকে মুখ ঘোরাতে হয়নি।

এ গ্রন্থের "ধীরে বহে ধলাই", "রাইমা উপত্যকার উপকথা" গল্পগুলির মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন, কীভাবে আগ্রাসী নগর সভ্যতা পাহাড়ীদের জীবন দখল করছে। তাঁর "ধীরে বহে ধলাই" গল্প ত্রিপুরার রঙ উন্মোচিত করেছে প্রকৃতির হাতে আঁকা ছবির মত।

"মেঘের ঘোমটা মাথায় দিয়ে উঁচু সবুজ পাহাড়টা আজও দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরার উত্তর জুড়ে। পাহাড়টার নাম লংতরাই। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে ঐ পাহাড় দিয়ে ছুটে চলা নদীটির নাম ধলাই। পাঁচ বছরের ছোট মেয়ের মত। মাকে না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ফিরবার নাম ভুলেও করবে না। শাল চামল, গামাইয়ের শিকড়ে আলতো চুমু খেয়ে দু'পারে গাঁয়ের মানুষের চোখের দুঃখ সুখের নোনতা জল নিয়ে কতদূর একলা চলে গেছে সিন্ধু পারে গল্প বলা বুড়োর কাছে"।

এইভাবে তাঁর গল্প মিশে গেছে প্রকৃতি ও মানুষের আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে। শহরের ইট কাঠ চুন সুরকি সিমেন্টের মধ্যে তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

"বসনের ঠাকুরমা" এক অবিস্মরণীয় গল্প। এ গল্প লেখা হয়েছিল ত্রিপুরার ইতিহাসের কলঙ্করেখা ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের পরেই। বড়মুড়া পাহাড়ের কোলে চম্পকনগর গ্রামের কাছে কয়েকটি টিলায় ঘর বেঁধে ওরা থাকে। কিছু আদিবাসী পরিবার আর কয়েকটি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বঙ্গবাসী পরিবার। প্রাণের দায়ে এখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে। আগের অভ্যস্ত জীবিকা বৃত্তি বাধ্য হয়ে বাদ দিয়ে নতুন ভাবে বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিচ্ছে। তারা কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই মিলে মিশে আছে। এ বাড়ির দা ও বাড়ির মানুষ চেয়ে নিয়ে কাজ সারে, ও বাড়ির কুড়ুল এ বাড়ি ধার নেয়। এক আদিবাসী শিশু অনুরক্ত হয়ে পড়ে প্রতিবেশী এক বাঙ্গালী বৃদ্ধার। হঠাৎ শুরু হয়ে যায় পাহাড়ী বাঙ্গালী দাঙ্গা, আরোপিত বিরোধ। বৃদ্ধা ছুটতে থাকে আদিবাসী শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না, বাঁচাতে পারে না শিশু বসনকেও। একই বর্শার ফলায় গাঁথা হয়ে যায় দু'জনেই। এ কাহিনী একান্তভাবে ত্রিপুরার। এ কাহিনী সমস্ত ভ্রাতৃঘাতী নৃশংসতার ওপর মানবমৈত্রীর জয়পতাকার মত।

"আলোর ঠিকানা" গ্রন্থে মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে। ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে, আলোর ঠিকানা, ধীরে বহে ধলাই, গোলাপের ছেলেবেলা, বসনের ঠাকুরমা, রাইমা উপত্যকার উপকথা। গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে ত্রিপুরার নিজস্ব পরিবেশ, গ্রাম পাহাড়ের প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা মানুষের জীবনধারা, যেখানে এখনও শহরের যন্ত্র সভ্যতা কামড় বসায়নি, কুটিল করে তোলেনি অন্তস্তল। কিন্তু তারাও সর্বংসহ নয়। তাদেরও প্রতিবাদ আছে, ক্রোধ আছে, অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস আছে।

এর দু'বছর পরে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ 'মনাইগ্রাম'। এ গ্রন্থের গল্পগুলিও ত্রিপুরার বুকের ভেতর থেকে তুলে আনা। শহরে ইলেকট্রিকের আলোয়, ফ্যানের নিচে আমরা এর অনুষঙ্গ কতটা বুঝতে পারব, জানিনা। শুধু অনুভব করি এক নতুন রসের, এক নতুন পৃথিবীর দিগন্ত উন্মোচনের। বিমল সিংহ নিজে এ গ্রন্থের স্বল্প পরিসর ভূমিকায় বলেছেন " গ্রামের পাহাড়, পাহাড়ের টংঘরে বা সীমান্তের ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে সুখ-দুঃখে বাজে বিষাদ আনন্দের

মধুময় সংগীত। দেশী-বিদেশী বিষাক্ত দমকা ঝড়ে সুখ-দুঃখের ঘরগুলো কখনো ভাঙে। সংগঠিত বা অসংগঠিত চেনা অচেনা মানুষ লড়ে মরে পথে বিপথে জয়-পরাজয়ে, তাদের কথা ভাষা দিতে চাই। কখনো হয়, কখনো হয় না। তবু লিখতে চাই।"

তাঁর এই লিখতে চাওয়ার প্রেরণাই আমাদের জন্যে সঞ্চিত করে দিয়ে গেছে এই সাহিত্য সম্পদ। ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম, একেবারে অনন্য। এত বস্তুনিষ্ঠ, এত উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক, মনে হয়, তিনি যদি না লিখতেন, যদি তাঁর কর্মবহুল ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে এই বাড়তি পরিশ্রমটুকু না করতেন, কোথায় হারিয়ে যেত মানবজীবনের এই সব অমূল্য মণিরত্ন, এইসব মানবিক মহিমা। প্রকৃতির সঙ্গে এমন মিশে যাওয়া, এমন গলাগলি, হাত ধরাধরি করে থাকা মানুষের জীবন আমরা কোথায় পাব শহরের ইঁট কাঠ পাথরের শুষ্ক বুকে? কত অবলীলাক্রমে তিনি বলে গেছেন, "মুলি বাঁশের টিলা, রূপই বাঁশের ঢালুর বিস্তৃতি, আর মিরতিঙ্গা বাঁশের ঘন বন পাব হয়ে খুমুলুং। রিয়াংদেব ভাষায় গহন বনের আরেক নাম খুমুলুঙ। বিশ্বেব যত সুর, তত সুরেব গায়ক পাখীরা থাকে ওই খুমুলুঙে। কোথাও ধনেশ, টিয়া, বটকল, বৌ কথা কও। বিচিত্র তাদেব রূপ, বিচিত্র তাদের রং। আবো বিস্ময়ের, তাদের মিষ্টি গানের ছোটো ছোটো কলি।"

এই যে গভীর বনেব আভাস দিলেন লেখক, এই বনের ভেতবের কাহিনী তিনি এমন ভাবে না বললে আমবা তো জানতেই পাবতাম না। এই বনেব ভেতব উঁচু টিলার ওপর শিমূল গাছ, অনেক উঁচু তাব ডালপালা। সেই উচ্চ চূড়ায় থাকে ময়না পাখী। সহজে তাদের ধরা যায়না। পাহাড়ী কিশোর জৈনহাম বহু কষ্ট স্বীকাব কবে শিমূল গাছের কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে, অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দু'টি ময়না শাবক পেড়ে আনে। আশেপাশের পাহাড়ী এলাকায় তার জয়জয়কার পড়ে যায়। কারণ ময়না

প্রচ্ছদ : শঙ্কর চৌধুরী

প্রচ্ছদ : প্রভাত কুমার কর্মকার (দ্বিতীয় সংস্করণ)

পাখী ধরে আনা অত্যন্ত সাহসের কাজ। সেই ময়না বাচ্চা দুটিকে খাঁচায় রেখে পোষ মানায়। খরার সময় তাদের নিজেদের যখন ভাত জোটে না, তখন আধপেটা খেয়ে ময়নাদের খাওয়ায়। এমনি করেই মমতা মাখানো গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ময়না দুটোর সঙ্গে জৈনহামের।

একদিন মহাজন আসে লাল কাপড় বাঁধানো খাতা নিয়ে। জৈনহামের বাবার অনেক ঋণ ঐ মহাজনের খাতায়। সেই অছিলা ধরে ময়না দুটো মহাজন জোর করে নিয়ে যায়। এর পর জৈনহামের যন্ত্রণা বেদনার ছবি। তার বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের প্রকাশ দিয়ে শেষ হয় গল্প। কিন্তু পাঠকের মনে রেখে যায় তার দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন। এই রস আমাদের কাছে একেবারে নতুন। শহরের ধুলো বালি, গাড়ির ধোঁয়া আর আওয়াজ আমাদের দিতে পারে না এই অনুভূতির বিন্দুমাত্র। এ এক অন্য জীবন যন্ত্রণা, আলাদা অভাব বোধ। দুটো পাখীর অস্তিত্বের মধ্যে কী এমন থাকতে পারে যে, একটা কাহিনী হয়ে যায়, আমরা বুঝতাম না, যদি বিমল সিংহের "মনাইহাম" গল্প আমরা না পড়তাম। এই দুটিই তাঁর গল্প সংকলন, আলোর ঠিকানা ও মনাইহাম। কিন্তু এ দুটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশের মাঝখানে তিনি লিখেছিলেন একটি উপন্যাস "লংতরাই"। এ উপন্যাসটি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশেষ চিহ্ন বহন করেছে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। তাঁর দুটি গল্প গ্রন্থের মাঝখানে। "লংতরাই" উপন্যাস যথারীতি বাংলায় লেখা। পাত্রপাত্রীরা সব ককবরক ভাষী পাহাড়ী ত্রিপুরার অধিবাসী। কিন্তু ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাসগুলির ক্রম অনুসারে বোধ হয় "লংতরাই" ত্রিপুরার বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস।

ত্রিপুরার পাহাড়ী দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন লেখক এভাবে, "লংতরাই পাহাড়, উচু টিলার গায়ে গায়ে বিস্তৃত জুম ক্ষেত। পাহাড়ের ঢালুতে সাদা কাপাস ফুল বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে। কাপাস ক্ষেতের উপর ভাসছে তিল গাছের থোকা থোকা ফল। আর একেবারে নীচু হয়ে জুমের লাল, সবুজ, হলুদ রং ধরা মরিচ। কাপাসের সাদা ওড়নার নীচে পাহাড়ী জামা, বিচিত্র রংয়ের বাহার। টিলার মাঝখানে অড়হর গাছ, উঁচু ডালগুলি বাতাসে নড়ছে। কোথাও আবার চিনার, খাকলু, কুমড়ো লতা থরে থরে।"এই পটভূমিতে শুরু তাঁর উপন্যাস। এই যে অনবদ্য চিত্রকল্প, কোথায় পাওয়া যাবে এর মাধুর্য শহরের মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত গল্পে?

ধীরে ধীরে এদের জীবনের সরসতা চলে যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরায় অভাব নেমে আসে। আসাম-আগরতলা রোডে রাস্তা মেরামতির কাজে মজুর হয়ে যায় ঐসব টিলার অধিবাসীরা। তারপর সরকারি নির্দেশে বন দখল। জুমিয়াদের পুনর্বাসনের নামে অনেক অপব্যবহার। অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অরণ্যের অধিবাসীরা। জড়িয়ে পড়ে মহাজনের ঋণে। এর উত্তরণ ঘটে উপজাতি পাহাড়ী এলাকায় নতুন জীবন প্রণালীর মধ্যে দিয়ে। বাড়তি জনসংখ্যা শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, এসব জুমচাষ দিয়ে মেটানো যায় না, তারা বোঝে। চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং সমবায়ের ব্যবস্থা স্বীকার করে প্রগতির পথে তাদের এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। উপন্যাসের পাত্র পাত্রী জরকামুণি, হাসমাই, সাজেরুঙ সকলেই নতুন জীবনের উপযোগিতা বুঝতে পারছে। তাদের "কানে বাজছে দূর থেকে ইস্কুলের সেই ছেলে ভোলানো বাঁশির ডাক পাহাড়ের উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত চির অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা পাহাড়ের শিশুদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে। রঙ্গিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ। চোখে যেন দীপ্ত হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। কোলের ছেলেটি তার এমনি করে বাঁশির ডাকে ছুটে যাবে। ইস্কুলের ময়দানে

কচি হাত দু'টি আকাশেব দিকে তুলে থাকবে, পাথব ফুঁডে কচি ঘাস যেমন অপাব বিস্ময়ে সূর্যেব দিকে তাকায"।

এই ভাবেই শেষ হযেছে তাঁব "লংতবাই" উপন্যাস। বহুদিন ধবে ঘুমিয়ে থাকা পাহাডী মানুষগুলো সমগ্র বিশ্বেব সাথে যুক্ত হযে যাতে নিজেদেব স্থান গডে তুলতে পাবে, সভ্যতাব অবদান কাজে লাগিযে উন্নত জীবন যাত্রায সামিল হতে পাবে— তাবই কথা বলে গেছেন লেখক।

বিমল সিংহেব "লংতবাই" উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত কবেন শ্রী দীপক ভট্টাচার্য ১৯৮৬ সালে। বিমল সিংহ নিজে এ বিষযে অনেক সহাযতা কবেন। লংতবাই ত্রিপুবাব প্রথম চলচ্চিত্রায়িতকাহিনী। তাঁব প্রথম গল্পগ্রন্থ "আলোব ঠিকানা" ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস "লংতবাই" তাঁব দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। তৃতীয় গ্রন্থ ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত "মনাইহাম"। এটি তাঁব দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ। আলোচনা সূত্রে তাই এটি "লংতবাই"-এব আগে এসে গেছে। কালানুক্রমিক হিসাবে "মনাইহাম" তৃতীয় গ্রন্থ।

এবপব তাঁব চতুর্থ গ্রন্থ আমবা পেযেছি ১৯৮৭ সালে "তিতাস থেকে ত্রিপুবা।" এ উপন্যাস ত্রিপুবাব আদিবাসী জনজাতিব জুমচাষেব সীমা ঘেবা কাহিনী নয। ত্রিপুবাব পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষা তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে নদী মাতৃক অঞ্চলেব ছাযায ঘেবা জীবনেব কথা। তিতাস নদীটিকে বাংলা সাহিত্য আজ বিশেষভাবে চিনে গেছে অদ্বৈত মল্লবর্মনেব 'তিতাস একটি নদীব নাম' উপন্যাস পাঠ কবে। তিতাস পাবেব বাসিন্দবা মৎসজীবী বেশিবভাগ। পদবী এদেব মাল বা মল্ল। নদী এদেব বানে ভাসায আবাব মুখেব গ্রাসও যোগায।

সেই তিতাসেব পাব থেকে উপন্যাসেব নাযক ঘটনাব নানা আবর্তে ত্রিপুবায আসে। ত্রিপুবায

প্রচ্ছদঃ অপরেশ পাল

প্রচ্ছদঃ স্বপন নন্দী

এসে ব্রাহ্মণ নায়ক মাখন পুরোহিতের কাজ করে। এসব কাহিনীর মধ্যে দিয়ে লেখক যেটা তুলে ধরেছেন, সেটা হল আমাদের সামাজিক অসঙ্গতি। জাতপাতের বিচার আমাদের সমাজে মানুষকে অপমানে অসম্মানে জর্জরিতই শুধু করেনি, নিজের পায়ে কুড়ল মেরেছে। অনেক মেধা প্রতিভার অপচয় ঘটিয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রেখে নষ্ট করেছে দেশের সমাজের মানব সম্পদ। সমাজ সচেতন লেখক বিমল সিংহ এদিকটাই সুনিপুণভাবে এঁকেছেন তাঁর "তিতাস থেকে ত্রিপুরা" উপন্যাসে। যেখানে সুধন মালের বংশে লেখাপড়া জানা কেউ নেই। অনেক কষ্টে সুধন তার নাতি হরিচরণকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে। কিন্তু পাঠশালার সরস্বতী পূজোয় হরিচরণ অংশ নিতে পারে না। গাবর চাড়াল কৈবর্তের নাকি পূজো করার অধিকার নেই। বালক হরি তার শৈশব থেকেই এই অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করতে থাকে। এমনি ধারা ছোটো ছোটো ঘটনা তুলে ধরেছেন লেখক বস্তুনিষ্ঠ লেখনী দিয়ে। আজও সেই অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজ থেকে লুপ্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী— "যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে/ পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে" সচেতন করতে পারেনি সব মানুষকে। মহাত্মা গান্ধীর আবেদন আন্দোলনও সর্বাংশে সফল হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—"চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই" সকলের মনে সমানভাবে সাড়া তোলেনি। আজও সমাজের কোণে কোণে জমে আছে অনেক অন্ধকার। মানুষের প্রতি ঘৃণা, জন্মসূত্র দিয়ে মানুষকে বিচার করে অনেক অন্যায় অবিচার আজও ঘটে চলেছে। সেইখানে সেইসব অন্ধকার ঘোচাতে বিমল সিংহের প্রয়োজন আজও রয়ে গেছে। তাঁর "তিতাস থেকে ত্রিপুরা" উপন্যাস সেদিক থেকে আমাদের এক বড় অভাব পূরণ করেছিল। প্রয়োজন ছিল আরও লেখার। তাঁর নিষ্ঠুর হত্যার মত মর্মান্তিক আঘাত সাহিত্যের ইতিহাসে আর ঘটেছে বলে জানা নেই। ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য শুধু নয়, মানবিক ইতিহাস যেন বোবা হয়ে গেছে এই আকস্মিক আঘাতে। এরপর দু'বছর বাদে তাঁর কাছ থেকে পেলাম এক অন্য স্বাদের উপন্যাস "করাচি থেকে লংতরাই"। অবশ্য বাইশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থকে উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলা হয়ে থাকে বিস্তৃতির সীমাবদ্ধতার জন্যে। যদিও মনে হয় উপন্যাসের বিস্তার তার মধ্যেও ঘন সন্নিবদ্ধ ছিল।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে করাচি থেকে একটি বিমান ছাড়ে দেশী বিদেশী যাত্রী নিয়ে। গন্তব্য ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান। ত্রিপুরার ওপর লংতরাই পাহাড়ের মাথায় এসে হঠাৎ ছুটে আসা আগাম কালবৈশাখীতে দিশাহারা হয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

তখন ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট তেমন ছিল না। নদীপথে নৌকা করেই যাতায়াত চলত বেশীর ভাগ। তেমনি এক নৌকার মাঝি কার্তিক ত্রিপুরা। বিমান দুর্ঘটনার পর কার্তিক পাহাড়ের উঁচু নিচু চড়াই উৎরাই পার হতে হতে বিমানের ধ্বংসাবশেষের কিছু দেখতে পায়। খুঁজে পায় কিছু সোনাদানাও। সবগুলোর গুরুত্ব সে বুঝতে পারেনি। যারা বুঝেছিল, তারা তাকে নানাভাবে প্রতারণা করে। অনেক সোনাদানা হাতে পেয়েও কার্তিক শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়েই ভিক্ষা করেই দিন কাটায়। কাহিনী শেষ হয়েছে এইভাবে : নিষ্পাপ অরণ্য সন্তান, সোনার পাহাড় মাথায় এলেও শতাব্দী ধরে সে ঘুমের ঘোরে পড়ে আছে, সে ঘুম ভাঙ্গুক, তারা জেগে উঠুক, অগ্রসরতম মানুষেরা যদি তা না চায়, হাজার কার্তিক যুগে যুগে পথে পথে এমন করেই ঘুরবে।"

এই মন্তব্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে লেখকের সংবেদনশীল মনের প্রকাশ। বঞ্চিত মানুষের প্রতি

সমবেদনাই তাঁব সাহিত্যেব মূল উৎস। তাই তিনি অন্যেব হেঁটে যাওযা বাস্তায না গিযে, নিজে পথ কেটে চলেছেন। যে বাস্তায কেউ হাঁটেনি আগে, সেখানে গেছেন, খুঁজে বাব কবেছেন নতুন দিগন্ত। দেখেছেন বঞ্চিত শোষিত মানুষেব অবস্থান। তাদেব ওপব আলো ফেলেছেন। বিশ্ববাসীকে দেখাতে চেয়েছেন এই বঞ্চনা এবং শোষণেব প্রকৃত চেহাবাটা। এভাবে অন্তত ত্রিপুবাব বাংলা সাহিত্যে এত গভীব ভাবে এত নতুন অবলোকন নিযে দেখাটা বোধ হয বিমল সিংহই প্রথম কবেছেন। তাঁব ব্যাপক অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিযেছেন।

প্রায পাঁচ বছব বাদে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হল " তথাপাডাব ইতিকথা" উপন্যাস। অখ্যাত এক জনবসতি তথাপাডা। সবকাবি খাতায় জবীপ বিভাগে এই ছোট জনপদেব নাম আছে কি নেই, তা বিশেষভাবে বলতে পাবে না জাযগাব বাসিন্দাবা। গোটা গ্রামটাব দুটো পাডা। মাঝখানে ছোটো শীর্ণ জলস্রোত, নাম বাঘাইছডা। উত্তবেব টিলায বিযাং উপজাতিদেব বাস। দক্ষিণেব টিলায থাকে আসলং উপজাতিবা। আসলং উপজাতি ত্রিপুবীদেব একটি শাখা।

এই দুই টিলাব বাসিন্দা নিযে গডে ওঠা ছোটো জনপদেও মানুষেব জীবনে ঘটে নানা ঘটনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিজস্ব প্রতিপত্তি বিস্তাবেব জন্য কলহ বিবাদ। আবাব [illegible] অন্যাযেব প্রতিবাদ কবাব মত বলিষ্ঠতা। বহু কাহিনী ত্রিপুবাব বনজঙ্গল লতাপাতায জডিযেছিল বৃহত্তব জগতেব চোখেব আডালে। বিমল সিংহ অতিযত্নে সেই লতা [illegible] সাবযে তাকে প্রকাশ কবেছেন পবম যত্নে গভীব মমতায। এত ভিতবে গিযে ত্রিপুবাব আব কোনও লেখকই এসব উপকবণ সংগ্রহ কবে আনেননি তাঁব আগে। বিমল সিংহ যেন সাহিত্যেব বস দিযে ত্রিপুবাব

প্রচ্ছদ : স্বপন নন্দী
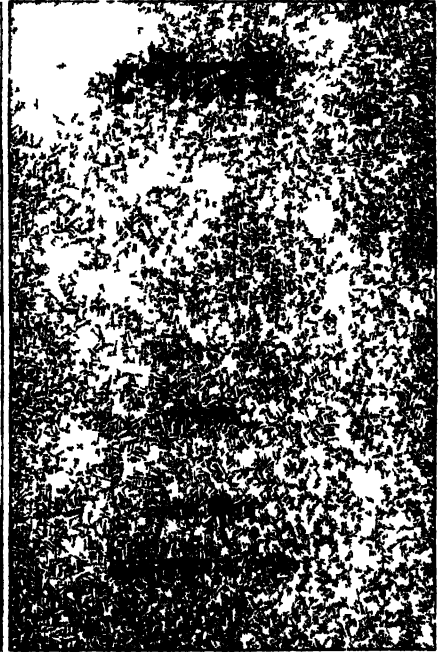
প্রচ্ছদ : সুভদ্রা সিংহ

ইতিহাস লিখে গেছেন। মানুষের জীবনে কত বৈচিত্র্য, কত বিভিন্ন অনুভব ছড়িয়ে আছে, বিশ্ববাসীর সঙ্গে তার একাত্মতা আছে কতভাবে, তাই, তিনি দেখিয়েছেন এই 'তখাপাড়ার ইতিকথা' উপন্যাসে। বিমল সিংহ যে সময়ের ঘটনা লিখেছেন, রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য তখন ত্রিপুরার সিংহাসনে। রাজা মহারাজারা রাজধানী থেকে কৈলাসহর যেতেন আখাউড়া হয়ে রেল গাড়িতে সমসের নগর পর্যন্ত। তারপর যেতেন হাতী চড়ে। রাজার প্রতিনিধিরা যেতেন, যেতেন রাজার সনদপ্রাপ্ত দলপতি, চৌধুরী, দফাসর্দার প্রভৃতি। এদের সাহায্যের জন্য ছিল বিরাট এলাকা জুড়ে একজন তহশীলদার। এসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন "মনু নদীর উজানে বাখাছড়ার পারে পারে বা মালদ ছড়ার শিয়রে যে সমস্ত পার্বত্য পাড়া, গ্রাম আছে, তার শাসন ভার ছিল দলপতি সুপতিফার উপরে। তিন'শ ছিয়াত্তর ঘরের খাজনা আদায়, ওদের ভাল মন্দ দেখা, বিচার শালিশী সব কিছুর উপর ছিল সুপতিফার কর্তৃত্ব। রাজার রক্ষী বাহিনী, যারা বিনন্দিয়া আলং নামে পরিচিত তারাও সুপতিফাকে জিজ্ঞেস করে পাড়ায় পাড়ায় যেত। তখন ঘর প্রতি খাজনার হার ছিল পাঁচ টাকা। দলপতির আদেশে পাড়ায় রোয়াজা বা চৌধুরীরা খাজনা আদায় করে দলপতির ঘরে পৌঁছে দিত। দলপতিরা ঠিকমত কাজ করে কিনা দেখার জন্য রাজবাড়ী থেকে আসতো মিসিপ। মিসিপদের নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত। মিসিপ বা কালেক্টরের দায়িত্ব থাকতো রাজারই কোন আত্মীয়ের উপর। এদেরকে গ্রামবাসীরা কর্তা বা ঠাকুর বলে সম্বোধন করতো। অনেকে ডাকতো আবার মহারাজ বলেও। এতে কর্তারা খুশীই হতো। সঙ্গে ক্রোকের পরোয়ানা আছে। দলপতি, সর্দার চৌধুরী এরা রাজার সনদ প্রাপ্ত, খাজনা দিতে হয় না। এরাই তহশীলদারদের দিয়ে খাজনা আদায় করে। আদায় না হলে রাধা ঠাকুরের কাছে সব বৃত্তান্ত জানাবে। কর্তাঠাকুর বাহিনী পাঠিয়ে যার যা কিছু আছে কেড়ে আনে। আসবাবপত্র শুধু নয়, কারো ঘরে হরিণ সিং, বনরুইয়ের চামড়া, বাঘের চামড়া বা টিয়া ময়না, এমনকি কেউ কেউ শখ করে হরিণের বাচ্চা পালে, কিছুই রেহাই দেয় না। যা পায় তাই উঠিয়ে নিয়ে যেতো। মেয়েদের অলংকার, টাকার মালা জোরে খুলে কেড়ে আনতো। শুধু অলংকার নয়, মান মর্যাদা, সতীত্ব নারীত্ব সবকিছুই লুটে নিতো বিনন্দিয়া আলংরা। কেউ কিছু বলার সাহস নেই। ওরা যে রাজার লোক। যত অত্যাচারই করুক প্রজারা নিতো ওইটাই রাজারই ফরমান।" (তখা পাড়ার ইতিকথা ঃ বিমল সিংহ রচনা সমগ্র ঃ পৃ - ১৩৬)

খুব সহজ সাধারণ বিবরণধর্মী কথায় লেখক এখানে একটি বড় ইতিহাস লিখে গেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে। ত্রিপুরার রাজতন্ত্র অবসানের পঁয়তাল্লিশ বছর পর। আমরা ইতিমধ্যে ভারতের অনেক ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, অনেক অন্ধকার খুঁড়ে দেখেছি। বহু বন্দী জীবনের লাঞ্ছনা পীড়নের বিবরণ শুনে শিহরিত হয়েছি। কিন্তু ত্রিপুরার পাহাড় জঙ্গলের অন্তরালে, বাঁশবনের পাতার আবরণে ঢাকা ঘটনাগুলো নিয়ে তেমন নাড়াচাড়া হয়নি। অথচ সেখানেও কিন্তু জমে উঠেছিল অনেক অত্যাচার নিপীড়ন, অনেক কান্না ও রক্তপাত। বিমল সিংহের মত নির্ভীক এবং অধ্যবসায়ী দরদী লেখক এসব না লিখে রাখলে চিরকালের মত চাপা পড়ে যেত সব। অসাধারণ পরিশ্রম করে গ্রাম পাহাড়ের ভেতরে গিয়ে লাঞ্ছিত মানুষগুলির কাছ থেকে শুনে জেনে নিয়ে তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর উপন্যাসে সত্যিকারের বস্তুনিষ্ঠ মানবদরদী মন নিয়ে। নতুন প্রজন্মের কাছে রেখে গেছেন ইতিহাসের দরজা খোলার চাবিকাঠি। ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে তাঁর এ অবদানের ঋণ অপরিশোধ্য। শুধু বারবার মনে হয় এই মানুষটিকে কেন আমরা হারালাম?

কেন এত বড ক্ষতি সাধিত হল ত্রিপুবাব? এব পবিমাপ কোনও কিছু দিযেই কবা যাবে না?

উপবিউক্ত ছযটি কাহিনী গ্রন্থ ছাডাও আবও তিনটি বই তিনি বচনা, সম্পাদনা কবেছিলেন, সাহিত্যেব ইতিহাসে যেগুলিব মূল্যও কম নয। তাব একটি হচ্ছে " সত্যেব আলোকে বিষ্ণুপ্রিযা মণিপুবী।" ভীমসেন সিংহ বচিত এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি সম্পাদনা কবেছেন বিমল সিংহ। গ্রন্থটিব সঠিক মূল্যাযন এখনো বাকী আছে। কিন্তু বিমল সিংহেব মানসিক অবস্থান বুঝতে বইটিব গুরুত্ব অসীম। এই নির্ভীক বস্তুবাদী আদর্শ পবাযণ মানুষটিব চিন্তাধাবা আজ আবও বেশি কবে আমাদেব জানা এবং প্রচাব কবা প্রযোজন। নতুন প্রজন্মেব কাছে এ গ্রন্থ এক উজ্জ্বল পথ প্রদর্শকেব কাজ কববে।

আব একটি গ্রন্থ " ববেইব যাবী", প্রকাশ কাল ১৯৯৬। কিছু লোককথা নিযে সংকলিত গ্রন্থটি। এই সব লোককথাব মধ্যে বিধৃত আছে বাজ্যেব অনেক ইতিহাস, অনেক সাংস্কৃতিক সম্পদ। বাজ্যেব ঐতিহ্য যা সমৃদ্ধ কবেছে। শুধু তাই নয, প্রতিবেশী বাজ্যগুলিব সঙ্গে মানসিক দেওযা নেওযাব ভালবাসা আন্তবিকতাব সাক্ষ্য বহন কবে আছে যে সব লোককথা, সেগুলি মানুষেব কাছে অমূল্য সম্পদ। বিমল সিংহ এইসব লোককথাগুলি সংগ্রহ কবতেও যথেষ্ট পবিশ্রম কবেছিলেন, কষ্ট স্বীকাব কবেছিলেন।

তাঁব আবও একটি গ্রন্থেব কথা অবশ্যই উল্লেখ কবতে হয, যদিও সেটা তাঁব স্ববচিত গ্রন্থ নয, গ্রন্থেব সম্পাদনা, তাও এককভাবে তিনি সম্পাদনা কবেননি, কবেছিলেন তিনি ও ব্রজেন্দ্র কুমাব সিংহ যুগ্মভাবে। গ্রন্থটিব নাম "পৌবেই", বিষ্ণুপ্রিযা মণিপুবী ভাষাব প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ। যদিও এ গ্রন্থ বাংলা ভাষাব সীমাবেখাব বাইবে, তবু এ গ্রন্থ বচনায তাঁব পবিশ্রম ও অধ্যবসায অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

বিমল সিংহেব মাতৃভাষা বাংলা নয, বিষ্ণুপ্রিযা মণিপুবী। যদিও ত্রিপুবায বাংলা ভাষাব এলাকাতেই তাঁব লেখাপডা, তবু পাবিবাবিক ঐতিহ্যেব বিচাবে বাংলা ভাষা তাঁব পবম্পবাগত
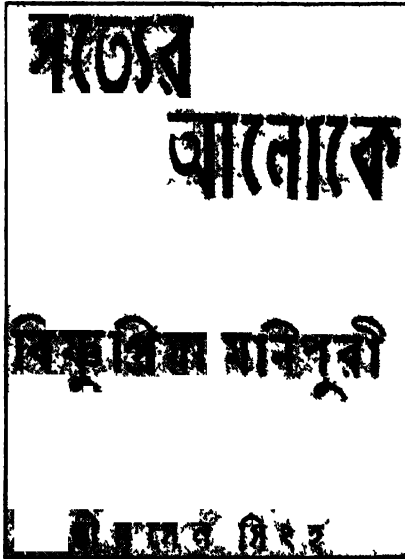
সম্পাদনা : বিমল সিংহ

প্রচ্ছদ : সুভদ্রা সিংহ

পিতৃপুরুষের ভাষা নয। বাংলাভাষার যে আগ্রহ আমরা পারিবারিক সূত্রে পেয়ে থাকি, তিনি তা পান নি। তাঁর নিজের গ্রহণশক্তি, আবেগ ও অনুভূতি দিয়েই নিজস্ব মেধায বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, এটাও তাঁর আর এক দক্ষতা এবং কৃতিত্ব।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস পরে ১৯৪৮ সালের ১৬ই অক্টোবর ত্রিপুরার কমলপুরে এক বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী পরিবারে তাঁর জন্ম। মৃত্যু ১৯৯৮ সালের ৩১ শে মার্চ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে একদল সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে। জীবনের অর্ধশতাব্দীও পূর্ণ করেননি তিনি। এর মধ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন সেই ছাত্রজীবনেই। তারপর রাজনীতিতে পুরোপুরি নেমে পড়েন। শ্রমিক আন্দোলন এবং রাজ্য রাজনীতিতে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৯৫ সালে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হন।

আশ্চর্য মনে হয়, যখন দেখি এতসব দুরূহ এবং ব্যস্ততাময় কাজের মধ্যেও তিনি এমন গভীর অনুভূতি নিয়ে সাহিত্য রচনা করে গেছেন। কীভাবে সময় পেয়েছেন, কী করে চিন্তা করেছেন, অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে ভাষায রূপ দিয়েছেন। সময় সাপেক্ষ এই সাহিত্য রচনা এভাবে রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে লেখা, হৃদয়ের কোমল অনুভবকে ছুঁয়ে তাকে পাঠকের মনের দরজায় পৌঁছুবার যোগ্য করে তোলা, এ তো অতি কঠিন কাজ। তাঁর লেখার ভাষায কোনো জটিলতা ছিল না, ছিলনা ব্যঞ্জনার অলংকার সাদামাটা কথায় এঁকে গেছেন যে কঠিন বাস্তবকে, জানিনা কোন্ অলংকার বা আতিশয্যে তা আরও বেশী স্পষ্ট হতে পারত। তাঁর সহজভাবে বলে যাওয়া কাহিনীই আমাদের বুকে গভীর ভাবে দাগ কাটে, যন্ত্রণায বুকের শিরা উপশিরায টান ধরায়।

ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে পাঠকের সংখ্যা যেমন কম, লেখকের সংখ্যাও তাই। তার ওপর স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের ভারী আবহাওয়ায চাপা ছিল অনুভূতির মুক্ত প্রকাশ। ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি বলতে ধরে নেওয়া হত রাজধানী আগরতলাকেন্দ্রিক সৃষ্টিকে রাজ আমলে যেমন পাহাড়ী জনজীবন অবহেলিত ছিল, ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থা অপসারিত হয়নি। আলোকপ্রাপ্ত বাঙ্গালী এবং ত্রিপুরার লেখকরা লিখছিলেন আগরতলায় বসেই। ফ্যানের হাওয়ায় বিদ্যুতের আলোয় আরামে। তাঁরা ছিলেন কলকাতা প্রভাবিত। লেখাপড়া করেছেন কলকাতা বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ শান্তিনিকেতনে। গ্রাম পাহাড়ের জীবন চোখে পড়েনি তাঁদের।

বাংলা সাহিত্যে তাঁরা অবশ্য পড়েছিলেন তারাশংকরের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', নারায়ণ সান্যালের 'দণ্ডক শবরী', প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কলমে কয়লা খনির শ্রমিক জীবনের কথা। ত্রিপুরার পাহাড় টিলা লুঙ্গা বাঁশঝাড়ের আড়ালে যে জীবন স্রোত বয়ে চলছিল, সেদিকে তাঁরা ভাল করে তাকাননি। বিমল চৌধুরী বা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য একটা দুটো গল্পে তাঁকে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠেনি। সেই সময়ে এসে দাঁড়ালেন বিমল সিংহ, শোনালেন ত্রিপুরার একেবারে বুকের ভেতরের আপন কথা। পাহাড়ী জীবনের সেই সব সরল রেখার ছবিগুলি আমাদের কাছে খুব পরিচিত ছিলনা। বিমল সিংহ একেবারে জীবন্ত করে তুললেন তাকে।

পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সহমর্মিতায় ভরা এই সব মুহূর্তগুলি কোথায় হারিয়ে যেত যদি বিমল সিংহ কথার ফ্রেমে তাঁকে বেঁধে না ফেলতেন। কাহিনী অবশ্যই আছে এসব ছবির পিছনে। পুল তৈরি, রাস্তা তৈরি এসব করতে কন্ট্রাক্টরবাবুরা আসে, তাদের জুলুম, মহাজনের ঋণ দানের

অত্যাচার, ফরেস্টারদের দুর্ব্যবহার সব মিলিয়ে পাহাড়ী সরল জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ওরা সন্তুষ্ট ছিল অল্পেতেই। চাহিদা তাদের খুবই কম ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে ওরা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। কলকারখানা, বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান, এসব ছাড়াই ওরা দিব্যি ছিল। এর মধ্যেই ওরা খিলখিল করে হাসত, নাচ গান করত, ওদের আদিবাসী দেবতার পুজোয় উৎসব করত। উৎপাদন বাড়লে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জীবনযাত্রা উন্নত হলে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটলে, ইতিহাস ভূগোল জানলে আরও ভালভাবে থাকা যায়, তা ওদের জানা ছিল না। অতৃপ্তিবোধও ছিল না। ওদের মেধা প্রতিভা দক্ষতা এসব সুপ্তই ছিল। মানবসভ্যতাকে তা কতটা এগিয়ে দিতে পারত তারও পরীক্ষা হয়নি।

সভ্য জগৎ কিন্তু সবক্ষেত্রে সহানুভূতি নিয়ে তখন এগিয়ে আসেনি। ওদের জন্যে প্রকল্প গড়া হয়েছে, শিক্ষা প্রসারে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, জুম চাষের সীমাবদ্ধ উৎপাদন প্রথা থেকে হাল চাষের উন্নত পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সভ্য জগতের মূল স্রোতের সঙ্গে ওদের প্রাচীন পরিবর্তনহীন বদ্ধ জীবনধারাকে মিলিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির কল্যাণে তার অনেক কিছুই তাদের কাছে পৌঁছয়নি। ফলে উঠেছে মধ্যবর্তী স্তর। সরল পাহাড়ীরা শোষিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে। নানাভাবে ঠকানো হয়েছে তাদের। তাদের ফলানো ফসল কম দামে কিনে নিয়ে, বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে, তাদের তীর্থস্থান দখল করে, ক্ষতিপূরণের টাকা গায়েব করে সভ্যতার রোলার এগিয়ে গেছে। বাইরে থেকে জানা যায়নি অনেক কিছু। বিমল সিংহ দেখেছিলেন তাদের পাশে পাশে থেকে। জীবনের এসব অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে তুলে নিয়েছেন সাহিত্যের রসদ। রাজনৈতিক অনেক কর্মতালিকা থেকে তা বড় কাজ। বাস্তবের এক কঠোর অধ্যায় স্থায়ী করে দিয়ে গেছেন ত্রিপুরার ইতিহাসে। মহাশ্বেতা দেবী "অরণ্যের অধিকার" উপন্যাস রচনা করে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সমাজে এবং সাহিত্যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সেই কাজেই হাত দিয়েছিলেন সাহসী লেখক বিমল সিংহ। এখানেও অরণ্যের সেই বঞ্চিত বিতাড়িত মানুষগুলি যারা ছড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে কুঁচো চিংড়ি আর শামুক ধরে আনন্দেই ছিল, তাদের সেই স্বল্প চাহিদার রসদটুকুও যখন প্রতারণা ছলনা আর গায়ের জোরে কেড়ে নেওয়া হয়, তখন এখানেও সাঁওতাল গ্রামের বীরসা মুন্ডার মত মানুষ লড়াই করতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু তাদের কথা বাইরের লোক তত বেশী জানেনি শোনেনি। বিমল সিংহ একে রেখে গেছেন কিছুটা। অখ্যাত মানুষগুলোর দৃঢ়তা সাহস ও সংগ্রামের কাহিনী লিখে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের যে দরজা বিমল সিংহ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন, সেখানে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ।

বিমল সিংহের এসব লেখা বাইরে তেমন প্রচার লাভ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের ঋদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির পাশে অনায়াসে যিনি স্থান পেতে পারেন, তাঁকে চিনিয়ে দেওয়ার কাজ এখনও বাকী। ১৯৯৯ সালের বইমেলা উৎসবে বিমল সিংহকে মরণোত্তর সলিলকৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু এটুকুই তো যথেষ্ট নয়।

ত্রিপুরার অন্তস্তলকে তিনি চিনেছিলেন, চেনাতে চেয়েছিলেন ত্রিপুরার মানুষকে, ত্রিপুরার বাইরের পৃথিবীকে। তাঁর কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। আকস্মিক আঘাত থামিয়ে দিয়েছে তাঁকে। সেওতো হতে চলেছে আজ দশবছর। ১৯৯৮ সালের ৩১ শে মার্চ ছিল সেই ভয়ঙ্কর দিন। ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ দশ বছর পূর্ণ হবে। আজকের প্রজন্ম, আজকের সাহিত্যিকরা তাঁর উত্তরাধিকারের দায়িত্বভার বহন করতে এগিয়ে আসবে নিশ্চয়ই, এই আশা নিয়েই তাঁর স্মৃতিচারণ শেষ করছি।

কমরেড বিমল সিংহ

অনিল সরকার

অন্তর্ঘাতী হাওয়ায়
উড়ে গেলে
মাথার মুকুট
তখনো তুমি একাই
দাঁড়িয়ে থাকো
মৃত্যুর সাথে
কোলাকুলি দিতে
এমন সাহসী তুমি।

বুকের ভিতর
ভালোবাসার পতাকা
ছিঁড়ে গেলেও
তুমি বারবার খুঁজে আনো
ছিন্নমূল হৃদয়ের জন্যেই
নরম রোদ
জ্যোৎস্নার চাঁদ
ভালোবাসার অম্লান প্রতিশ্রুতি।

এখন একটি রক্তমাখা আদরে
ঘুমে গেছ তুমি
পাশেই বসে আছে শোকার্ত সময়
পড়ে আছে জয়-ধ্বজা
বিশাল বুক জুড়ে
সশস্ত্র পতাকা
একটি দুঃসাহস
এবং প্রতিশ্রুতি একটি কলম.
যা জীবনের মত দুরন্ত
বন্দুকের নলের চেয়েও দামী
মানুষের প্রতি ভালোবাসায়।
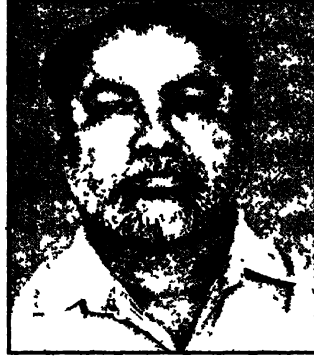
তোমার রক্তস্নাত পদযাত্রায
ফের আমাদের যাত্রা শুরু
পদানত শোষিত আর ঘৃণিতকে
তোমার মৃত্যু আবার হাতছানি দিল,
বন্ধুগণ, এখনো নেমো না।
তারা হাটছেন
সামনে ফাঁদ
সর্পিল ষড়যন্ত্র
মৃত্যুর গোঙানি
ঘাতক সময়
তার মধ্য দিয়েই তোমার মরণ ডাক
টানছে আমাদের জয়রথ।

অন্তর্ঘাতী হাওয়ায়
উড়ে গেছে তাঁর মুকুট
তবুও পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন
কমরেড বিমল সিংহ, যিনি
শুধু একটি লাল শালুর নিশান উড়িয়ে
রুখে দেন সমস্ত পরাজয়কে।

জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেও
পংকজ চক্রবর্তী

ফুলের চাদর গায়ে —
তুমি ঘুমিয়ে আছ কমরেড,
তোমার মাথার উপরে প্রলম্বিত সূর্য -
ক্রোধে-ঘৃণায় যেন জ্বলছে।
বেলা গড়িয়ে দ্বি-প্রহরের দিকে
এই অবেলায় কেউ ঘুমায়?
তুমি জাগ, জেগে উঠ কমরেড
তোমার বৈঠকখানা পূর্ণ
অসুখী মানুষের ভিড়ে।
শিকারী বাড়ীর আদিবাসী রমণী,
দস্তিরুং রিয়াং
বসে আছে তোমার জন্য,
কথা বলবে না তুমি?
নাইটিঙ্গল পাড়ার পরানজয় হালাম
অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে, গুণছে প্রহর
তোমার অপেক্ষায়,
তুমি একটা কিছু কর, না হয় ছেলেটা যে
মুকুলেই ঝরে যাবে।
চানকাপে গণ্ডগোল, শ্রীরামপুরে শান্তিসভা
পাহাড় আর সমতলে, গড়ে তুলতে সেতু
তুমি যাবে না সেখানে?
তোমার টেবিলে জমেছে ফাইলের পাহাড়
উঠ কমরেড, চোখ খোলে দেখ
কি ভীষণ প্রতিজ্ঞায়, জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেও
আছড়ে পড়েছে, তোমার আঙ্গিনায়।
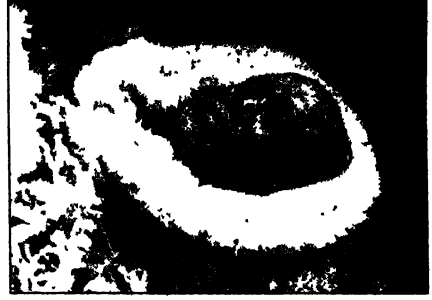
একত্রিশে মার্চ
উনিশশো আটানব্বই এ
করবী দেববর্মণ

আজ যদি বুকের রক্তে কলম চুবিয়ে
একটা কবিতা লিখতে পারতাম
তবে আসল দুঃখের শতভাগের একভাগ নিয়ে
অক্ষরগুলি রক্তের রঙে বিমল হয়ে
হৃদয়গুহা থেকে বেরোতে পারতো
তা এত সহজ নয়
এত সহজ নয়।
কোন শোকের শ্লোক ঠিকঠাক গাঁথা
বিন্দু বিন্দু করে একটি মানুষের প্রতিকৃতি
সিন্ধু হয়ে উঠে উঠেছিল নিজের গৌরবে
প্রতিকৃতি একটা প্রতিষ্ঠান
হতে হতে রক্তের প্লাবনে উদয়গিরিতে
এমন আচমকা চিরস্থায়ী হতে গিয়ে
মেঘে ঢেকে গেল
কে তাকে নেভালো — ঘৃণায় থুতু ফেলতে
গিয়ে দেখি গলাচিরে একদলা রক্ত
এসে গেলো — পরিচ্ছন্ন রুমালে এ দাগ
চিরস্থায়ী থাক।

একটি অবিস্মরণীয় গল্প —

বসনের ঠাকুরমা

বিমল সিংহ

দুধ দোহায় বুড়ী। বালতির ভিতর সশব্দে ফেনিয়ে উঠে দুধের ঝরা ধারা। গাভীর পেছনে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষে বাঁশী। বাঁশী মানে বাঁশীরাম। সহজ করে কেউ ডাকে বাঁশী কেউবা ডাকে বসন। আকাশ জুড়ে প্রখর রোদ। ড্যাবা ড্যাবা ভরাট মুখে রোদের ঝলক। আপেল রাঙা ফুলা গাল দুটি ঘামে চিক্ চিক্। পাতলা ভুরুর নীচে গোল গোল চোখ। পাতা পলকহীন। শুধু নীল তারা দুটি চঞ্চল হয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে। নাকটা এত বোঁচা দুটি ছিদ্র ছাড়া কিছু আছে বলে মনে হয় না। রবারের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে। গাভীটা লাথি মারতে পারে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

নাদুস্ নুদুস্ মোটা বুড়ীটা হঠাৎ দুধের বাঁট পিছনে বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে দিল। গাভীর পেছনে পায়ের ফাঁকে বাঁশীর চোখে মুখে দুধের ধারা পিচকারীর মতো পৌঁছে কলেব পুতুলের মতো দুধভিজা চোখের পাতা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে কিছুক্ষণ। জিভের আগা ছুঁচালো হয়ে বেরোয় বিস্ফারিত ঠোঁটের ফাঁকে। বোঁচা নাক বেয়ে দুধ মুখে ঢুকে। ঠোঁটের কোণে টোল তুলে দুষ্টুমি ভরা হাসি। তামাসা দেখে খল খল করে বুড়ী হাসে, গলায় শিবা উপশিবা ফুলিয়ে ফোকলা দাঁতে শব্দটা বিকট হলেও মুখে ছড়ানো অনাবিল আনন্দের ছটা। ঘাড়টা দুলে উঠলো চঞ্চল বালিকার মতো। এই তামাসা রোজ ঘটে।

কৃষ্ণনীল বড়মুড়া। পাদদেশে বাঁকা নদী হাওড়া। শান্ত দিন বাঁশীর চোখের মতোই নীল। একটু উজানে চিকনতুইছা ছড়া আর বেলফাং ছড়া মিলিত হয়ে হাওড়া নদীতে মিশেছে। দুই পাহাড়ী ছড়া বড়মুড়া পাহাড়ের উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে কল কল করে বইছে দুই ছড়া নয় এ যেন বড়মুড়ার শিখরের কোন বনবালার দুই চোখের দুই ধারা। কি নাম কে জানে সেই বনবালার। চম্পা না চামেলী কোন বুড়ো আদিবাসীরও মনে নেই? না থাকলেও সবুজ বনানীর দিগন্তে লোকালয় শুরু। সেই বিস্তীর্ণ হাওড়া নদী বিধৌত অঞ্চলের নাম চম্পকনগর। চম্পা ফুল ফুটে কিনা কে জানে। তব বনবালিকার হাসি ফুটে। রূপিনী নামে এক আদিবাসী জাতি। রূপের বাহার তাদের থাক বা না থাক। চম্পক শব্দের মতোই ছন্দময় রূপিনী উপজাতিদের জীবনের কলকলানী নিয়ে ছুটছে হাওড়া নদী। পাশে সমান্তরাল হয়ে দুরন্ত বেগে আগরতলা মুখী আসাম-আগরতলা রোড। বাঁশকামলার বাঁশের ভেলা সাজানো হাওড়া নদীর বুকে। বাঁশ কামলারা আসে উত্তরের রক্তিয়া পাড়া, কমলানগর, পদ্মমোহন বাড়ী, চিন্তারাম কবড়া পাড়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। তেমনি আসে দক্ষিণ পাড়ের গ্রাম থেকেও। দক্ষিণে বলরাম বাড়ী, বিদ্যামোহন সাধুপাড়া, মহারাম সর্দার পাড়া, বিশ্বমুণি পাড়া পার হয়ে সুদূর জাঙালিয়া পর্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক আসে। বাঁশের পাইকার, কাঠ কারবারী, বাঁশ দালাল, ছোট ছোট চায়ের দোকান, বন দপ্তরের কিছু কর্মী সব মিলিয়ে জায়গাটা বেশ গমগমে। লরী আসে। থামে। বাঁশ, কাঠ, লাকড়ী নিয়ে আবার ছুটে শহরের পানে। পাহাড়ী বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখময় এক বিচিত্র কলরবে মুখর চম্পকনগর।

রাস্তার উত্তরে 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের এক লাল পাহাড়ী পথ। একটু এগিয়ে ঢাল

নেমেই চন্দ্রসাধুপাড়া। চন্দ্রসাধুপাড়া পার হয়ে আরো উত্তরে নিস্তব্ধ একটা পাড়ায় এলোমেলো কিছু টিলা। নাম মংকুরুই সাধুপাড়া। মংকুরুই মানে হচ্ছে নামহীন। একই আকাশ একই বাতাসের নীচে দশ বারোটি ছিন্নমূল পাহাড়ী বাঙালী ভূমিহীন পরিবার। আগের নাম ঠিকানা তারা ভুলে গেছে। নাম ঠিকানার পুরনো রোমন্থন করে লাভ নেই। শুধু তা ব্যথা বাড়ায়। তাই বোধ হয় মংকুরুই নামটারও একটা তাৎপর্য্য আছে।

এক টিলায় দুধ দোহানী মোটা বুড়ীর ঘর। ছেলের নাম সুরেন দাস। আদি নিবাস ছিল মেঘনার পাড়ে। যৌবন অতিবাহিত মেঘনার কালো গহীন জলে। পনের বছর আগে মেঘনার তীর ছেড়ে ছোট পরিবারটিকে নিয়ে ছুটে এসেছিল দুর্গম পাহাড়ে। দেশান্তরী পরিবার যাযাবরের অনেক জীবন কাটিয়ে ছুটছে কিছু জমি আর একটা নিরুপদ্রব কুটীরের সন্ধানে। বছর দশেক আগে এসে পৌঁছায় এই মংকুরুই বাড়ীতে। এতদিনে বুড়ীর মেঘনার মতো গহীন কালো চোখে বর্ষার ঘোলাটে হাওড়া নদীর রঙ ধরে। আবাদ করে লুঙ্গা, টিলা। চামল গাছের গুড়ি, কড়ই গাছেব শিকড় উপড়িয়ে উতলা কেটে দেড় কানির মতো চাষের জমি বানিয়েছে। যক্ষের ধনের মতো ওইটুকু সম্পদ পাহারা দিয়ে থাকাই হচ্ছে বুড়ীর কাজ। সুরেন দাসের ঘরে বৌ, বাচ্চা, আর মাকে নিয়ে সবশুদ্ধ আটজন। লোকেও গুণে আট। বাঁশী মানে ওই পাহাড়ী শিশুটা, ওকে নিয়ে বাড়ীর লোকে গুণে ন'জন।

আগে ওরা জাল বুনত মাছ ধরত। রাতদিন দিশেহারা নৌকা নিয়ে ছুটত মেঘনার বহস্যময় অতল গহ্বরে মীন চক্ষুর নেশায়। 'নদী আপন বেগে পাগল পারা' সেই ধারার জীবন এখানে রুদ্ধ। মাতাল হয়ে ছুটন্ত নৌকার পাল বড়মুড়ার পাথরে ছিন্ন ভিন্ন। সব হারিয়েও জীবনে লাগাতে চায় নতুন গতি। সেই গতি যতোই মন্থর হোক। বন্ধুর হোক পাহাড়ের চাষবাস। তবু পাথর পাহাড় অরণ্যের সাথে দাঁত কামড়ে বেঁচে থাকার একটা কঠিন চেষ্টা চলছে নিরন্তর। এখানে জাল দিয়ে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। কোদাল, দা, টাক্কাল নিয়ে আদিম মানুষের মতো জীবনযুদ্ধের কৌশল রপ্ত করতে হচ্ছে সুরেন দাসের পরিবারকে। আত্মীয়স্বজন কে কোথায় ছিটকে গেছে দেশ-দেশান্তরে কে কার খবর রাখে। নতুন পড়শীই হচ্ছে চলার সাথী। চাইলেও না চাইলেও এই সম্পর্ক কেউ উপেক্ষা কবতে পারে না। পারে না বলেই স্নেহ কাতর কোন এক দুর্বল মুহূর্তে বাঁশী এই পরিবারের আপনজন হয়ে গেলো। সেই সন তারিখ কেউ মনে রাখেনি।

বাঁশীরামের বাড়ী পাশের টিলায়। ওর বাবা ললিত রূপিনী, পরিবারের ছয়জন লোক নিয়ে এখানে আসে। আগে বাড়ী ছিল জিরানীয়া। ওর বড় মেয়ে জিরানীয়াতে বিয়ে দিয়েছে। এখনো ওখানেই থাকে। ললিত যখন এখানে আসে বাঁশীর জন্মও হয়নি। কিছু জুম করে সংসার চালাত। এখন কাছে পিঠে গভীর বন নেই তাই জুম হয় না। যে বন আছে তাও আবার বন দপ্তরের সংরক্ষিত এলাকা। দিন মজুরী না করলে উনুন ধরে না। বাঁশীর মা, বাবা, ভাই সবাই আসাম -আগরতলা রাস্তায় বর্ডার রোডের কাজে। এক ভাই শুধু পাহাড়ে গিয়ে লাকড়ি আনে। চন্দ্রনগর বাজারে বেচে।

সবাই যখন কাজে যায় বাঁশীর মা বাঁশীকে সুরেন দাসের মায়ের কাছে রেখে যায়। বাঁশী যখন হামাগুড়ি দিতে শিখে তখন থেকেই বুড়ী ওকে কোলে পিঠে মানুষ করছে। সুরেন, সুরেনের বৌ, ছেলে তারাও যায় বর্ডার রোডের কাজে। শুধু বুড়ীটা ঘর পাহারা দিয়ে বসে

থাকে পাহাড়ী নাতিটা কোলে নিয়ে।

বুড়ীর আছে নিজের নাতি-নাতনী। বয়সে ওরা সবাই বাঁশীর চেয়ে বড়। বড় বলেই বুড়ীর কাছে ভিড় করে না তা ঠিক নয়, ওই পাহাড়ী ছেলেটা বুড়ীর কোল দখল করেছে। যদিওবা কেউ বুড়ীর কোল ঘেষতে চায়, ঠোঁট বাঁকিয়ে, গাল ফুলিয়ে ধুলোর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁদে বসন। সুরেন একদিন ওই দৃশ্য দেখে ঠাট্টা করে গালে চিমটি কেটে বলেছিলো— হায়রে পাহারা পোলা, তুই যেমন বুড়ীর কোলটা ডিসটিক কাউন্সিল বান্যাইয়া লইছস্। ঠিক যেন তাই। বুড়ীর কোলে তার অবাধ অধিকার। যেমন খুশী চলার এক মুক্ত বাতায়ন। এই কোলেই সে বেড়ে উঠেছে। বুড়ীর স্তনে বসিয়েছে জন্মগত দখল স্বত্বের মতো মালিকানা। স্তনে দুধ থাক না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। বাঁশীর মা কাজে যখন যেতো কান্না পেলে থামানো যেতো না। না গেলেও শিশুটা মানুষ চিনতে শিখেনি, মানুষের উষ্ণ কোল বুঝতে শিখেছিল। শিখেছিল বলেই বুড়ীর কোলে ভারী মোটা হাত পা ছুঁড়ে মাতিয়ে তুলত। বুড়ীই তার শুকনো স্তন মুখে পুরে থামিয়ে দিতো। সে অভ্যেস এখনো যায়নি। বুড়ীও এমন, তার বিশাল বক্ষ উদাস করে বাঁশীকে নিয়ে বসে থাকে। বুড়ী যেন মাতৃত্বের এক খোলা পসরা সাজিয়েছে। স্নেহ মুগ্ধ চাউনির ভাষা অন্তত তাই বলতো।

বাঁশীর আধো আধো কথা। হৃষ্ট পুষ্ট দেহ। ফর্সা শরীরে কোমরে কালো তাগা। শূয়রের দাঁত ছিদ্র করে একটা ঘুঙুর সহ তাগায় বাঁধা। ছুটে চলার সময় ঝুমুর ঝুমুর বাজে। চেপ্টা মুখে ফুলা গাল। সেই পার্বত্য মুখে ছোট ছোট ফাঁক ফাঁক দাঁতে এক টুকরো নির্মল হাসি উদ্ভাসিত। বড়দের সবকিছু অনুকরণ করে। সুরেনের মা যখন গোবর তুষ পাটকাঠি দিয়ে ঘুঁটে তৈরী করে সেও তখন ছোট ছোট মুষ্টি দিয়ে ঘুঁটে বাঁধে। কখনো বা বাপের মতো টাক্কাল হাতে নেয়। বিরাট টাক্‌কাল তুলতে না পারলেও দু'হাতে তুলে পাহাড়ী কামলার মতো এলোপাথারি মারে। টাক্কাল ধরা পাহাড়ী জীবনের অনিবার্য অভ্যাস। সেই অভ্যাস থেকে সেও ব্যতিক্রম নয়। কখনো বা বাপের মদ খেয়ে টলতে টলতে চলার ভঙ্গিমা দেখিয়ে হাসায়। নিজের মা বাপকে সুরেনের ছেলে মেয়েরা কাকা কাকী ডাকে, সেও তেমনি কাতা কাতি ডাকে। সেই গোলমেলে উচ্চারণই সবার স্নেহ আদর আদায় করে। বুড়ী নিজের মুখের চিবানো পান বাঁশীর মুখে দেয়। ঠোঁট লাল করে সবাইকে দেখায়। বুড়ীর ডালা দিয়ে ধান ঝাড়ার ভঙ্গীর অবিকল অনুকরণ সবার কাছে চমকানো।

চমকানো শুধু নয় বলা চলে দু'টি সংসারকে মাতিয়ে তুলছে অদ্ভুত মমতার নেশায়। বুড়ীকে নাতি নাতনীরা ডাকে ঠাম্‌মা। বাঁশীর মুখে ঠাম্‌মা উচ্চারণ আসে না। আসে টাম্‌মা। টাম্‌মা শব্দের ধ্বনিতে বুড়ীর মনে দুর্বোধ্য এক মমতাময় যন্ত্রণা সঞ্চারিত হয়। বাঁশীর মা মাঝে মধ্যে পাহাড়ে যায় মুখমিলতই কুড়িয়ে আনতে। মুখমিলতই হচ্ছে মুলিবাঁশের বনে গজানো ব্যাঙের ছাতার মতো এক ধরনের সব্জী। মুখমিলতই দিয়ে পাহাড়ীরা বাঁশের চোঙায় ভরে শুঁটকী, মরিচ, নুন একসাথে পুড়িয়ে গুঁতিয়ে গোদক নামে তরকারী করে। বাঙালী রুচির প্রভাবে মুখমিলতই এখন ওরা তেলে দিয়ে ভাজে। যেদিন মুখমিলতই দিয়ে ভাজা বা গোদক রান্না হয় সুরেনের বাড়ীতে একবাটী যেমন করেই পৌঁছে দেয় ললিত বৌ।

এমনি একদিন মুখমিলতই ভাজা পৌঁছে দিতে গিয়ে, বাঁশীকে বুড়ীর কোল থেকে ডাকতে গিয়ে বাঁশীর মা ব্যর্থ হলো। কিছুতেই বুড়ীর স্তন ছাড়াতে পারেনি। শুধু নিষ্পাপ চোখের দীপ্ত তারা থেকে বিচ্ছুরিত এক চাউনি ছাড়া। হাসে সবাই। শুধু বাঁশীর মা বলে উঠে, খুড়ী গো খুড়ী এই

পোলা আগের জন্মে তোমার পোলা অইব! না অইলে জামাই অইব। বাপরে বাপ্! নিজের পেতের (পেটের) ছাওয়াল অত আদর পায়না। এক কাম কর। ছোত (ছোট) ছোত লাউ সিদ্ধ বেশী বেশী খাও। আমরা তিপরা মানু বুনিত দুধ আনবার অইলে লাউ বেশী বেশী খায়।

সারা বাড়ী জুড়ে হাসির রোল উঠে। বুড়ীও জানে কাঁচা লাউ সিদ্ধ বুকের দুধ বাড়ায়। লুকিয়ে লাউ সিদ্ধ খেতেও চায়। বুকে দুধ আনার তাড়নায় চিংড়ি দিয়ে লাউ তরকারী ঘন ঘন খেয়েছে তবু দুধ আসেনি। মনে মনে বুড়ী ভাবে তরকারী না করে সিদ্ধ খেলে বোধ হয় দুধ আসত। কিন্তু সকলের সামনে ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে চায় না। বাঁশীর মায়ের কথাটায় বুড়ীর বুকে অদৃশ্য এক মোচর দেয়। বাঁশীর উপর স্নেহের অধিকার একচেটিয়া করতে চায়। সেই অবাধ স্নেহের উপর পাহাড়ী বউ-এর হস্তক্ষেপ বুড়ীর অবচেতন মন সহ্য করতে পারে না। তাই বুড়ীর ক্ষোভ প্রকাশ পেলো অন্য এক ভঙ্গিমায়। বুড়ী বলে উঠে ছড়ার সুরে! পবের পুত! কুকুরের মুত! উড়ন শিখলে কোহিলের ছাল্যা (ছেলে) কি কাকের বাসায় থাকব!

মুখে যাই বলুক, কোকিল ছানা উড়ে যাবে নিশ্চিত তবুও মায়ার বাঁধন খুলতে পারেনি বুড়ী। যত দিন যায় মাকড়সার জালে আটকে পড়া পতঙ্গের মতো বুড়ী জড়িয়ে যাচ্ছে রহস্যজনক অদ্ভুত এক মায়াজালে। সন্ধ্যে বেলা সুরেন দাস রাস্তার কাজ সেরে ঘর ফেরে। ললিত ফেরে একই সাথে। দু'জন বসে ললিতের বাবান্দায। ললিত বৌ ঘবে তৈবি জুমের চালেব মদ ঢেলে দেয বাঙালী ভাসুরের সামনে। ললিত সুরেন একসাথে মদ খায়। সাবা দিনেব ক্লান্ত দেহে অবসাদ ঝরে খানিকটা। কখনো সুরেন বৌ শুঁটকী তরকারী পাঠিয়ে দেয় পাহাড়ী দেওরের

সান্ধ্য আসরে। গভীর রাতে বৌ কথা কও পাখী ডাকে। একই সুরে-পরশে দুই প্রতিবেশী ঘুমিয়ে পড়ে আগামী নিষ্ঠুর সকালের অপেক্ষায়।

ভালবাসা, সন্তান পালন, আনন্দ, খুশী নিয়ে যেমন বিশ্ব সংসার আবর্তিত, তেমনি ভয়, ক্রোধ, হিংসা, ঝগড়া, বিদ্বেষ সংসারের রথের চাকায় অনিবার্য্য ভাবে সঞ্চালিত এক শক্তি। দুই সংসারের কেবল ভালবাসা মিলই থাকে না ঝগড়া কলহও আছে।

আছে বলেই একটা ছাগী নিয়ে ঘটল তুমুল কাণ্ড। দুই পরিবারে কেউ সেদিন কাজে যায়নি। শুধু ললিত গেছে দু'দিন আগে জিরানীয়া জামাইবাড়ী। লম্লিতের একটা ছাগল সকাল বেলা দড়ি ছিঁড়ে সুরেনের বাড়ীতে সিম গাছ খেয়ে ফেলে। সুরেন বৌ ছাগলটাকে ধরে নিয়ে ললিতের বাড়ী পৌঁছে দিল! আর বলল, বসনের মা, অ বসনের মা, ছিমগাছের কি করছে দেইখ্যা যাও। একটা ছুইও তুলন যাইত না, বান্দ ছাগলটা বান্দ! ছুই দুইলা গাছে ধরলে তোমরা তো খাইবা। বান্দ! ছাগলটা বান্দ! সময় থাকতে বান্দ! বেঁধেও ছিলো। দড়িটা জলে ভিজে নরম। কখন যে আবার দড়ি ছিঁড়ে চলে গেছে কেউ খেয়াল করেনি। খেয়াল করেনি বলেই সুরেনের বাড়ীর ঝিঙে গাছ, ডুগী গাছ, সিম গাছ সব কাঁচি দিয়ে কাটার মতো শেষ করেছে। ললিত বৌ তার নিজের টং ঘরে বসে চরকী চালিয়ে কার্পাস থেকে বীচি ছাড়াচ্ছিল।

সুরেন বৌ দু'তিনবার ললিত বৌকে ডাকে। অ বাঁশীর মা, অ বাঁশীর মা, তোমরা মনে করছি কি! ললিত বৌ চরকার ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজে সেই ডাক শুনেনি। সুরেন বৌ উঠোনে একটা মুলি বাঁশের চেরা টুকরা ছুঁড়ে মারে ছাগীটার দিকে। চেরা বাঁশ ছাগীর পেছনের পায়ে লেগে কেটে রক্ত ঝরায়। হাঁটুর উপরে রক্তের একটা শিরার উপর আঘাতটা লেগেছে। সুরেন বৌ এতটা হয়েছে জানতে পারেনি। ছাগীটা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিত এই দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না সুরেন বৌ। "কেউ দেখেনি" ভাব করে ঘরে ঢুকে। রক্ত ঝরা আহত ছাগীটা ম্যাএ .. ম্যাএ .. শব্দে খুঁড়িয়ে ললিতের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট ছোট পাহাড়ী চোখ বিস্ফারিত কাতর মুখে ছুটে বেরোয় ললিত বৌ। রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে তখনো। দ্রুত নিঃশ্বাসে পেট কাঁপছে ছাগলের। রাগের রক্তিম ছটায় ললিত বৌ এর মুখ রাঙিয়ে উঠে। ছোট পার্বত্য চোখের গোড়ায় নিমেষে আগুন জ্বলে। সোজা ছাগলটাকে বুকে তুলে ধেয়ে যায় সুরেনের উঠোনে। চি চি চি! বিতরে অত হিংসা! কাচা কাচা কামড় দিয়া ছাগল খাও। বেজান হিংসা! সরম নাই! তোমরা মানুও কাতত (কাটত) পারব। চোখ মধ্যে তোমার দয়ামায়া নাইনি। শুয়র বাচ্চা! ছাগল আমি নিত না। তোমার ক্ষেতি (ক্ষতি) করাল, ফসল খাইলে খোয়ার যায়না কেরে। এর লাইগ্যা ছাগল কাতত নি। চোখে অগ্নি ঝলক। চেপ্টা নাকের পাটা ফুলালো রাগে।

সুরেন বৌ মাথার খোপা সজোরে বেঁধে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে বেরোয়। না দেইখ্যা খামাখা মানষেরে কইস্ না।

ললিত বৌ গর্জে, তুমি না কাতলে কে কাতব। তেলিয়ামুড়ার মানু আয়া কাতবনি! আমি বুঝে নানি কে কাতব!

সুরেন বৌ — যা বালা করছি, ফসল খাওয়ালে কাটুম, আরও কাটুম।

ললিত বৌ ধৈর্য্য ধরতে পারে না — কাত! দেখি কাত! বলতে বলতে সুরেন বৌকে ধাক্কা দেয়। সুরেন বৌ হঠাৎ চীৎকার দিয়ে উঠে। মাইর‍্যা লাইল, মাইর‍্যা লাইল। ঘর থেকে সবাই ছুটে

বেরোয়। সবাই কেমন যেন বিব্রত। চট করে মুখ থেকে কারো কোন কথা বেরোয় না।

সুরেন বৌ ধাক্কা সামলে, নাচের ভঙ্গীতে নিতম্ব দুলিয়ে হাতের তর্জনী নেড়ে সংহাররূপিনী ক্রুদ্ধ স্বরে বলে বাইর অ। বাইর অ! বেটী বাইর অ! ভিটিত থাইক্যা বাইর অ! বলতে বলতে গলায় ধাক্কা দেয়। বিশাল চোখে ক্রোধ ফুটে, কপাল জুড়ে রাগের বলিরেখা।

চকিতে ললিত বৌ ছুটে আসে নিজের উঠোনে। ঝাড়ু হাতে উদ্যত ভঙ্গীতে, প্রায় উলঙ্গ ভাবে বিশ্রী ভঙ্গী করে, রাগের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে। রাগে, অপমানে, ক্ষোভে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নি দৃষ্টি। সুরেনের ছেলেমেয়ের সবার ঝগড়ার চীৎকারে এক কোলাহল। উঠোনের মধ্যেই লম্ফ ঝম্ফ। খোঁটা দেওয়া। শাণিত সব বাক্য বাণ। ধাতব শব্দের মতো ঝনঝনায়। ললিত বৌ-এর ক্রুদ্ধ নৃত্য। সুরেনের বাড়ীর লোকরা সহ্য করতে পারেনা। সর্বনাশা এক ধ্বংস দৃশ্য। নিমেষে বিদ্বেষ আর কলুষতার, অবিশ্বাসের কালো মেঘ গ্রাস করে প্রকাণ্ড এক বাসুকীর উদ্যত ফণার মতো।

বুড়ীটা এল। অনেকক্ষণ থেমে ঝগড়ার কথা সাজিয়ে গুছিয়ে। হাঁটুর উপর কাপড়। মোটা উরু দুটি ভীমবলে লাথি মারার জন্য প্রস্তুত। ছিনালীরে! ছিনালী! লজ্জা সরম নাই। নির্বংশিয়ার বৌ। ছাগল সামাল দিতে পারস্ না। খোয়ার দেখাস্ আবার। টেহা (টাকা) রাখবার জাগা যেমন পাইছস্ না। ছাগলের পায়ে লাইগ্যা গেচে! কেউ তো আর ইচ্ছা কইরা মারছে না। বালা মতন কতা কওয়া চিনস্ না। সকাল্যা বেলাও তোর ছাগলে ছই গাছের কি গতি করছে।

ললিত বৌ চড়া সুর খানিকটা নামিয়ে বলে — বুড়ী তোরে মনে করছে বালা : তোর ঘরে আমায় ধেক্কা দিসে তুই কিছু মাতছে না। আয়অ না! আমার ঘরে দুইকা না। (দুইক্য) আইলে আমি পিসা মারব। ক্ষোভে অপমানে, জ্বলে উঠে বলতে বলতে।

বুড়ীও ছাড়ে না। হায়রে মাগী ঘর লয়া যেমন, ফুটানি মারস্। তোর ঘরে কি আছেরে! সক্যাল্যা বেলাও লবণ নিছস্ মনে নাই। ওয়াক থূ। চি চি চি ... বুড়ীটা গলা ফাটা বাঁশের মতো চেরচেরিয়ে উঠে। শননুড়ির মতো মাথার সাদা চুল উড়ানো উঁচানো।

বুড়ী বেশী ফুটানি কইর‍্যা না। তোর নাতি আমার কোদাল নিসে ফিরত দিসে নি! সরম পায় না! বড় ফুতানি মার। সুরেন বৌ ঘর থেকে চুটে গিয়ে কোদালটা এনে ছুঁড়ে ফেলে। নে কোদাল লয়া ভাজা খা! তোর পোলা যে কুড়াল লয়া সারা বছর কাম করে তখন তোর কপালে পিছা বাইন্দা হাটস্‌নি। কোদাল নেই সুরেনের বাড়ী। তেমনি আবার ললিতের বাড়ীতে কুড়াল ছিল না। উভয়ে ধার হাওলাত করে চলে। সুরেনের বৌ যে খোঁটা দিল। ললিতের মেঝো ছেলে সুবীন্দ্রের মনে তীরের মতো বিঁধে তীব্র অপমানে। চকিতে ঘরে ঢুকে কুড়ালটা নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করে সুরেনের উঠোনে। লম্বা দেহে ইস্পাতের দৃঢ়তা। কুড়াল একতা লয়া বড় ফুতানি অইছে। কুড়ালের আছার আমি লাগাইছে, মাগনা লাগাইছে নি? নেও! কুড়াল ছাড়া আমি বাচত পারব।

বিদ্রুপে বুড়ী ফোকলা দাঁতে বিকট রকম ভেংচি কাটে। সুবীন্দ্রের কথার পুনরাবৃত্তি করে বিকৃত উচ্চারণে -- কুড়াল ছাড়া আমি বাচত পারব' বড় বাচাইন্যারে। তোরে কেডা কইছিল মানুষের কুড়ালে আছার লাগাইতে।

ঘরেই ছিল সুরেন। শরীর ভাল না, না উদাসীন কে জানে! ফল ফসল নষ্টের ব্যথায় সেও সংক্রামিত। তবু রহস্যজনক ভাবে নীরব। থামতে বা লাগতে বাড়ীর লোকদের কিছু বলেনি। এই নীরবতা ফসলের ভালোবাসায় না গোঁয়ো সংকীর্ণতার জন্য বলা কঠিন। গাম্ভীর্য! নাকি ললিত বৌ

এর চোখাচোখি হওয়ার দুর্বলতা। বাড়ীর লোকরা বুঝে উঠেনা। সুরেন বৌ বিলাপ করে কাঁদে, তবু সুরেন নির্বিকার। বৌ এর পক্ষে সহানুভূতিসূচক একটি কথাও বলেনি। কয়েকবার গলাখাকারি দিয়ে বুঝিয়ে দিল ব্যক্তিত্ববান মানুষের জ্যান্ত অস্তিত্ব। ঝগড়া সাময়িকভাবে শান্ত হলেও ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠে ধিকি ধিকি।

হঠাৎ কোন কথা না বলে বেড়ার একটি বাঁশের টুকরা উপড়ে দমাদম বৌ ছেলে মেয়েকে কয়েকটা ঘা মারে। চটে গেলে বিপদ। কোন কথা না বলে যে যেদিকে পারে পালায়। তারপর কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়। গম্ভীর বজ্র নিনাদের মতো বলে — বসনের মা আগুন জ্বালাইসনা, ললিত আয়া কি করে দেকতাম্। হয় আমি থাকুম্ নয় হে থাকত! এই রকম কইয়্যা পাড়া পড়শী হয়্যা থাকন যায় না।

কোলাহল অস্তাচলে। বেলা গড়িয়ে পড়ে মংকুরুই টিলায় বিষাদের ছায়া মেলে। বিকেলের ঘুম ভাঙে বাঁশীর। ঝগড়ার কথা সে জানে না। বাঁশের একটা কঞ্চি ধরে উপরে চড়ে ঘোড়া চড়ার ভঙ্গীতে ছুটে দাস বাড়ীর পানে। ওর মা ওকে টেনে আনে। আনলে কি হবে। কে আটকায় তাকে। দাস বাড়ীর বাঁশঝাড়ের 'আয় আয়' শিশু মনে উঁকি দিচ্ছে। জড়িয়ে ধরে তার মা আটকায়। টামমা মা .... চীৎকারে বিষাদ বনানীর স্বপ্ন ভাঙে। ফুলাগাল ফুলিয়ে উঠোনে গড়ায় বিকট চীৎকারে।

সন্ধ্যে নামে চামল গাছের নরম ডালের চামর দুলিয়ে। আকাশ জুড়ে খই ফোটা লক্ষ তারা। ব্যাকুল শিশু বুঝ মানে না। কলা দিয়ে, মকই পুড়িয়ে খাইয়েও শিশুকে বুঝানো যাচ্ছে না। শুয়ার মুরগী ঘরে তুলে তাড়িয়ে খেদিয়ে জন্তু জীবের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়েও শিশুর মন আনমনা করা যাচ্ছে না। দুর্বার টানে শিশুর বুক থেকে মোচড়ে উঠে। দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় চীৎকার তুলে হঠাৎ সাপের ছোবল খাওয়া আর্তনাদের মতো। তার মা গল্প শোনায়। পাছড়া দিয়ে পিঠে বাঁধে। অন্য ভাই-বোনেরা উঠোনের কোণে আতঙ্ক সঞ্চারী পাখীর বিচিত্র ডাক ডাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ভয়ে শিউরে। অবারিত ঘরছাড়া মন ভয়ও মানেনা। আকুল আগ্রহে মেলে দু'চোখ। উৎকর্ণ কান ডানা মেলা মন। খাঁচায় পাখী থাকে ; সঙ্গীত কেউ খাঁচায় বেঁধে রাখতে পারেনা। পাখীর মন শিশু মায়ের পিঠে বন্দী। পাশের ঘরে টাম্‌মার নরম কোলের অদৃশ্য হাতছানি তার মনটাকে দুরন্ত সঙ্গীতের মতো নিয়ে গেছে। অনেক রাতে বাঁশী ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের পিঠে। স্বপ্নের ডানায় উড়ে টাম্‌মার কোলে ফিক্ ফিক্ হয়ত হাসে। বাঁশীর মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কিছুটা নিশ্চিত মনে বাঁশের হুঁকোতে মুখ দিয়ে তামাক টানে।

উঠোনের এপাশে ওপাশে পায়চারি করে সুরেনের মা। নির্বাক বাঁশীর চীৎকার বুড়ীর বুকে ধারালো বল্লমের মতন বিঁধে। খেতে বসে খেতে পারেনি। গলায় কী যেন কঠিন কিছু আটকে গেছে। বুকের আবেগ সাপের মতো পেঁচিয়ে উঠে গলাটা জড়িয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে। গ্লানি পড়া চোখে ঘুম আসে না। মায়াজালের এত জ্বালা আগে অত বুঝেনি। ঘন ঘন চোখে ভাসে ওই পাহাড়ী শিশুর গোল চোখের দীপ্ত তারা। অবচেতন মনে অনুভব করে বুকের কাছে, পুষ্ট কোমল শিশু হাতের আঁকড়ে ধরার বেদনা। অনুশোচনা জাগে অবাঞ্ছিত কলহের জন্য। নিষ্পাপ শিশুর কি দোষ! কেন পারবে না বুকের কাছে ছুটে আসতে। নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ওদের বাড়ী গিয়ে ওর পাশে শুয়ে বুকে পিঠে সস্নেহে হাত বুলাতে কিসের আপত্তি !

বুড়ী আবার ভাবে পরের শিশু। তাকে নিয়ে অত ভাবনায় লাভ কি। ওর মা আছে

বাপ আছে। ভাবনার দায়িত্ব নিয়েই ওরা মা বাপ। তবু যেন কোথায় একটু ভাবার দরকার। বিশ্ব সংসার তো স্নেহ আর ভালবাসার মধুর অথচ ভয়ঙ্কর মরীচিকার পিছনে ধাবিত। বিচিত্র পৃথিবীর মাঝে অহেতুক বুড়ীর স্নেহের উৎসের আর এক নাম বোধ হয় মানবতা। বুড়ী জানে-চিনে দুই জীবন প্রবাহের আকাশ-জমিন ফারাক, পরিবেশের বিভিন্নতা, ভাষার তফাৎ, মুখের আদলের দিক দিয়ে বাঙালী পাহাড়ীর প্রকট অমিল, তবু যেন দুই জীবন ধারার মাঝে একই জীবনের মূর্ছনার সূত্র আঁকড়ে ধরেই ধীরে ধীরে মানুষের মিলন সমুদ্রের অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছে বুড়ীর অবসন্ন ব্যথাতুর মন, বিচিত্র বিশ্বের মাঝে এই মহান অনুভূতি আছে বলেই মানুষ সবার উপরে। ধান ভানার ঢেঁকি সুরেনের বাড়ীতে নেই। এই পাড়ায় একটা ঢেঁকি তাও আবার ললিতের বাড়ীতে। গোটা পাড়াটায় দিনমজুরের বাস। চাল কিনে খায় প্রায় সবাই। ধান ভানার প্রশ্ন উঠে না বললেই চলে। কিছু জুম আর কিছু গিরিস্তি করে এই দুই বাড়ীতে। সুরেন্রের বৌ, সুরেনের বড় মেয়ে অনিমা দু'জনের দুশ্চিন্তা। কোথায় গিয়ে ধান ভানবে। এতদিন ওরা ললিতদের বাড়ীতে ধান ভানতো। গতকালের রাগ সবার মনে বেশ খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। তবুও একটা সঙ্কোচ, লজ্জা। কেমন করে ললিতের উঠোনে ভানবে। যদিও বা যায়, ললিত বৌ-এর সাথে কি বলেই বা আলাপের সূচনা হবে।

বেলা বাড়ে। অনেক সাত পাঁচ ভেবে প্রায় নির্লজ্জের মতো মা ঝি (মেয়ে) মাথায় ধানের টুকরী আর ডালা নিয়ে যায় ললিত বাড়ী। উঠোনের পাশে গোয়ালে বসানো ধানের ঢেঁকি। উৎকর্ণ কান, মনটা দুরু দুরু। নিশ্চিত অপমানের অপেক্ষায়। যেমন ভাবনা তেমনি ঘটনা। ঘরে বাঁশের হুঁকো নিয়ে ললিত বৌ। সুরেনের বৌ, ঝি তাকে চমকে দিলো। ঘর থেকেই চোখের তারা ঘুরিয়ে এক জ্বলন্ত চাউনি ছুঁড়ে ওদের দিকে। চাউনি বললে ভুল হবে, কুড়ালের আঘাত হানলো।

মাথা থেকে ধানের টুকরী নামাতে না নামাতে ললিত বৌ মৌনী ভাঙে, মেঘহীন দিনে বজ্রপাতের মতো। ধনি মানুর বৌ ফুতানি করিয়া মানুষের দেকি (ঢেঁকি) মধ্যে আয়, তুমি সরম পায় নানি। আমার ঘরে ঢুইকা না। কাইল কতবার কইছে। নিজের দেকি নিজে বানাইত পারে না। বলতে বলতে বিচিত্র ভঙ্গিমায় কেঁপে উঠে ললিত বৌ-এর সেই পার্বত্য থুতনি। গতকালের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারায় চোখে দীপ্ত বিজয়িনীর উল্লাস।

সুরেন বৌ কটমটিয়ে তাকায় ঝি-এর দিকে। দোষটা সম্পূর্ণ যেন ঝি-এর। ঝিও অগ্নিদৃষ্টি হানে মায়ের দিকে। অপমানে ভীষণ মেঘলা মুখ দুটি। গলা শুকিয়ে কাঠ। মন হাতড়ে হাতড়ে কোন উত্তর খুঁজে পায়না। ঝি-এর চোখের পাড়ে টলটলিয়ে ওঠে জল। নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। টলটলানো চোখের ইশারায় মা ধানের টুকরী মাথায় তুলে। নিঃশব্দে দু'জনে বেরিয়ে এল চকিতে। পাহাড়ী বৌ-এর 'সরম পায় নানি' শব্দটি খচ্ খচ্ করে টাক্কাল দিয়ে জুম খুঁচানোর মতো সুরেন বৌর মনটা তীক্ষ্ণ জ্বালায় খুঁচায়।

বিকেলে সুরেনের বড় ছেলে হরেকৃষ্ণ ধানের বস্তা রিক্সায় নিয়ে ছুটল মংকুরুই থেকে চম্পকনগরের ধানের মিলের দিকে। জিরানীয়া থেকে জামাইবাড়ী হয়ে ফিরছে ললিত। পথে দেখা হরেকৃষ্ণের সাথে। একে একে সব ঘটনা শুনে। ধানের বস্তা প্রায় জোর করে রিক্সা থেকে নামায়। হন্ হন্ করে ক্ষিপ্র বেগে ছুটে এল সোজা সুরেনের বাড়ী। সুরেন বৌ মুখোমুখি দাঁড়ায় নিশ্চল পাথরের মতো। কিছু বলার মতো খুঁজে পায়না। কপালে চিক্ চিক্ করে কয়েক ফোঁটা ঘাম। মৌন

মুখে রাগের চেয়ে অভিমানের গাম্ভীর্য্যই বেশী।

ললিত কাতর। আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে বলল, বৌদি! আমার মুখ চায়া তুমি গোসা ফালাইতে পারে নানি! পোলাপানের লগে গোসা করিওনা। আমি সরম পাইছে! যা অইবার অইছে, আমার মন্দ কপাল! তুমি বুঝে না। আমার দেকি (ঢেঁকি) তোমার অইতে পারে না। ছাগলতা পশু বুঝতে পারছে না। মানু ত বুঝত পারে। ইশ মানুষ শুনলে কিতা কইব। তোমার দিয়া আমার এত মিল! অত মিল ম্যাঝে কেমনে মারামারি করছে! সুরেন বৌ কথা বলার ফুরসৎ পেল না। হাত সজোরে চেপে ধরে ললিত হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসে একেবারে নিজের উঠোনে। সুরেন বৌ প্রতিবাদ করতে পারে না। অনেক করেও বাধা দেওয়ার মতো শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে না। ললিতেব মুখে সারল্যের দ্যুতি। ছোট ছোট চোখ জোড়াতে বিকীর্ণ হচ্ছে অকপট বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল স্নিগ্ধতা।

কি জানি উঠোনে দাঁড়িয়ে ককবরক ভাষায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কি বোঝাল বৌটাকে। চোখ মুখে দৃঢ়তায় বুঝিয়ে দিলো তার সিদ্ধান্তে সে অটল। সুরেন বৌ ককবরক বুঝে। বলতে পারে না। বুঝল ললিত বৌকে সুরেন বৌ-এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলছে। ললিত বৌ ঠোঁট কামড়ে কামড়ে এগোয়। ললিত বৌ পায়ের দিকে নুইয়ে এগুতেই, সুরেন বৌ জাপটে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। বুড়ীও এসেছিল পেছনে পেছনে। সবার অলক্ষ্যে বাঁশী বুড়ীর কোলে কখন গেছে কেউ জানে না। চারিদিক মুখরিত এক মিলন মধুর কান্নার রোলে। একটি দুঃস্বপ্নের মতো দিনের পুঞ্জীভূত গ্লানি, বিদ্বেষের কালিমা ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ধারায় নিমেষে ধুয়ে যায়। ললিতের মুখে হাসি তবু কিসের যেন আবেগ চিক্ চিক্ করে চোখের কোণে।

মংকুরুই টিলায় এমনি ধারায় বহে পাহাড়ী-বাঙালীর আবাদ বিবাদ সুবাদের কলরোল। কল্লোলিনী হাওড়া নদীর মতোই বিচিত্র। বড়মুড়ার শিখর বিধৌত বর্ষায় যেমন এর সর্বনাশী রূপ তেমনি পাহাড়ী ঢল হারিয়ে গেলে বিস্তীর্ণ বুকের চর ভাসিয়ে হাজারো মানুষের পায়ের ছাপ এঁকে চলে নিরন্তর। দেশান্তরী, জমিহারা মানুষ অরণ্যের কোল সাফ করে জীবনের এক নূতন ঠিকানার সন্ধানে এখানে জড়ো। তারা চায় নিরুপদ্রব জীবন ধারা। দেহ যতক্ষণ আছে খাটবে। তবু যেন অশান্তির কালো কলুষতা তাদের স্পর্শ না করে। হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে গহীন অন্ধকার জালে এক মধুময় আবেগের দীপ শিখা। তারই নাম বোধ হয় উৎসব। আজকে তাই ঠিক হলো সুরেনের বাড়ীর চাম্প্রতলায় কীর্ত্তন হবে। আনারস, কাঁঠাল সবই আছে। খোল করতাল নিয়ে মদন বৈরাগী আর তার ভাগ্নে রাখালকে আনতে পারলেই হয়। সুরেনের ছেলে ছুটল হাওড়া নদীর ওপারে দক্ষিণে মহারাম সর্দ্দার পাড়ায়। ললিত ছুটল প্রতিবেশী পাড়া চিন্তারামকবড়া পাড়ায়। যেখানে বলরাম দাস একতারা বাদক থাকে, ওখানে। ললিতের ছেলে ছুটে চন্দ্রসাধু পাড়ায় লোকজন নেমন্তন্ন করতে। কীর্তনের প্রস্তুতি নয়, যেন সান্ধ্য আসরে মিলনগীতির এক বিচিত্র সমারোহ। বুড়ী পাহাড়ী কায়দায় পাছড়া দিয়ে পিঠে বাঁধল বাঁশীকে। গুন গুন করে ঘুম পাড়ানী গান গায়। মেঘনার তীরে নিঃসঙ্গ মাঝির গাওয়া গানের মতো। দীর্ঘ একদিন পবে হারানো মানিক খুঁজে পেয়েছে। বিরহ অভিমান স্নেহের বন্ধনটা যেন আরো দৃঢ়। এই বিরহ বিলম্বিত হলে মানুষের জীবনধারা কোন্ ধারায় বইত কে জানে! আঁকাবাঁকা হাওড়া নদীর মতোই স্নেহের বিগলিত বেগ। কখনো মানুষকে কাঁদায়, কখনো বা হাসায়। আঁকাবাঁকা হোক ক্ষতি নেই, চলার পথে ছিটকে গেলেই বিপদ। কোথায় মরা নদী নাম নিয়ে নিশ্চল হয়ে থাকবে কে জানে। শ্যাওলা জমবে, স্রোত থামবে,

কোনদিন গতি সঞ্চারিত হবে না।

ভালোবাসার নদী গতিপথ ছিটকে যায়নি বলেই মংকুরুই পাড়ার লোকরা দু'দিন পরে বর্ডার রোডের কাজে ছুটে এক সাথে চম্পকনগর থেকে বড়মুড়া। পাহাড়ের গভীরে কাজ। মাইল তিনেক হেঁটে গিয়ে একটা পাহাড়ী বস্তী বনকুমারী। বনকুমারীর পাশে যে উঁচু পাহাড়ী খাদের মতো টিলা, সেই টিলার নাম খামতিং বাড়ী। খামতিং বাড়ী টিলার পেট কেটে তৈরি হচ্ছে আসাম-আগরতলা রোডের সংক্ষেপ গতি।

যেতে যেতে কেউ ছুটছে হাসির নিক্কনে বন মুখর করে। কেউবা বিগত ঝগড়ার গল্পে গুনগুনিয়ে। পুরুষ আছে নারীও আছে। নারীদের মধ্যে পাহাড়ীই বেশী। চোখে মুখে কর্মঠ-রুক্ষতা, তবু যাচ্ছে বুনো ফুল খোপায় কানে গুঁজে। কেউ গাইছে উদাসী গান। বনের হাওয়ায় উদাস তাদের মলিন ধূসর উড়না। তেমনি উদাস তাদের বুনো সুর। আগের দলকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষিপ্রতা চলার বেগে। কখনো দৌড়ে কখনো হেঁটে। বিবাহিত অবিবাহিত অনেকেই। চুটছে দুরন্ত বেগে। কাজের তাগিদ যত বেশী তার চেয়েও ভয় দেবেন্দ্র মেটের। লজ্জা সরম লোকটার কিছু নেই। কেউ দেরীতে গেলে হাজিরা খাতায় নাম তুলে না। যে সব মেয়েদের চাউনিতে ধার ওরা কোনদিন বাদ যায় না। কেউ হাজির না হয়েই খাতায় নাম উঠে। যারা ওর ওইসব আচরণের প্রতিবাদ করে তাদের বিপদ।

আস্তে আস্তে সামনে আসে আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ। শামুকের মত পেঁচিয়ে ওঠা কখনো পর্বত শিখর থেকে কখনো-বা তরতরিয়ে নামা। আসাম-আগরতলা রোড। পর্বতের নাম বড়মুড়া। মুড়া শব্দের মানে পাহাড়। এই পর্বতমালায় সবচেয়ে বড় পাহাড়। এর চূড়াটা আছে কিনা কেউ কোনদিন মেপে দেখেনি। কালো আর ঈষৎ পীত মানুষের ভীড়। নরনারী দুই-এরই কলরব। আজকে চোখে তাদের ভয়ঙ্কর বিস্ময়। কেউ কেউ রাখালিয়া দাবা খেলছে রাস্তার উপর কোঠা ঘর এঁকে। তাদের চোখেও নির্বাক আতঙ্ক। অন্যদিনের মতো তেমন উচ্ছ্বাস নেই। তাদের চোখে মুখেও পাহাড়ের স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য। কোদাল, টাঙ্গি, শাবল এদিক ওদিক এলোমেলো ছড়ানো ছিটানো। কেউবা পাহাড়ের গায়ে কোনারক মন্দিরের বিস্মৃত শিল্পীর মতো লাস্যলীলার ছবি আঁকছে। নির্বাক নির্জন পাহাড়ে এলে মানুষের অবচেতন মনের লাস্যলীলার ছবিই প্রকাশ পায় কিনা কে জানে।

বন্ধুর পথের রেখা ওদের শিল্পী পরশে কখনো সোজা কখনো মসৃণ। পাহাড় কেটে সারা অরণ্য জুড়ে আনছে ক্রমাগত প্রকৃতির পরিবর্তন। বন্য হস্তীর চারণভূমি আজ মানুষের কলরবে মুখর। চারধারে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকায় জুম ক্ষেত। ধানের কিশোরী ডগা বাতাসে ঝিরি ঝিরি নাচে। বাতাসে পালের মত উড়ছে বাঙালী মজুরিনীর শাড়ী বা বনবালার আঁচল। মেটে দেবেন্দ্র শুনিয়ে যাচ্ছে দাঙ্গার ভয়াবহ গল্প। — চম্পকনগর অমর মহাজনের গদীত্ শুইন্যা আইলাম লেম্বুছড়া রাণীরবাজার মান্দাই এক রাইতে বেটাইনতে তিন হাজার বাঙালী কাইট্যা লাইছে। বাড়ীই বুলে পুড়ছে কম্‌সে কম পঞ্চাশ হাজার। দেশে আর থাকন যাইত না।

সুরেনের বৌ একটা পাহাড়ী বৌ-এর মাথার উকুন খুঁজছে। নখের উপর নখ চেপে একটা উকুন মেরে বলল — মন্টুর বাপ আন্দাজ্যা গপ ছাইর্য না। নিজে দেখছনি কও! পঞ্চাশ হাজার বাড়ী পুড়ছে যে কইলা আগরতলা সর্বমোট বাড়ী অইব ক' হাজার। লেম্বুছড়া আমার বইনপুতের বাড়ী। দুই তিনবার গেছি।

বিজ্ঞের মতো চটে গিয়ে দেবেন্দ্র প্রায় ধমকের সুরে বলে — হারে বেটী! তুই কি জানস্। পত্রিকা পড় না, রেডিও শুনো না। তোর সঙ্গে কী কমু। দেশের খবর যারা জানে তারা কইতে পারব, আমার কথা ঠিক না মিছা। এই রাস্তাদা (দিয়া) তিন দিন ধইর‍্যা কোন গাড়ী চলছে নি। ক নিজের চোখে দেইখ্যা থাকলে ক। দুনিয়ার খবর রাখলে না জানবা।

গাড়ী চলাচল তিনদিন ধরে বন্ধ সুরেন বৌ নিজে দেখছে। তাই আপত্তি করতে পারে না। নীরব থাকে। দেবেন্দ্র বলে চলে — বাড়ীঘর ছাইর‍্যা দুই তিন লাক লোক আগরতলায় ঢুইক্যা গেছে। যাইবার সময় একটি ঘটিও লয়া যাইতে বুলে পারছে না। কেমনে নিব। মানুষে জান বাঁচাইব না জিনিস নিব! মাগ পোলা দুরের কথা! নিজের জানটা লয়া বাঁচনই দায়।

আস্তে আস্তে কৌতূহলী লোকরা ভীড় জমায় দেবেন্দ্রকে ঘিরে। ছোট এক জনসভা। একটা থান ইটে বসে দেবেন্দ্র। সবার বিস্মিত দৃষ্টি-শলাকা তার উপর নিবদ্ধ। ভীড় যত বাড়ে গলা কেশে সাফ করে বলে নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী। মাইয়্যা মানুষেরে গাছে দড়ি দিয়া বাইন্দ্যা শতে শতে বুনি কাইট্যা দিছে। এক টুকরী ভইর‍্যা পোলাপানের মাথা পাওয়া গেছে দুই তিন হালি। ভয়ঙ্কর বিস্ময় রাস্তার কামলাদের চোখে মুখে। চোখের পাতা কুঁচকে, ঠোঁটে গালে অসহ্য সহানুভূতির ভাঁজ ফুটে।

— নদীর জলে হাজার হাজার মানুষের লাস ভাইস্যা যায়। কোনটার মাথা নাই। কোনটা নাভি থাইক্যা উপর দিক আছে, নীচের দিক কই রইছে কে কইব। পাহাড়্যারা কুপাইতে কুপাইতে বড়মুড়া পার অইয়া কোনদিন যে তেল্যামুড়া পর্যন্ত যাইব কে জানে! যাওয়ার পথে আমরারে ছাড়ব? ভীড়ের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে, অত বাঙালী কাইট্যা লাইল, বাঙালী বেটাইন শাড়ী পরে না কেরে।

বাঙালী বেটাইনতে কী করব খালি হাতে। টাক্কাল, বন্দুক, কামান লয়া আক্রমণ করে পাহাড়্যারা। প্রশ্নকর্তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে দেবেন্দ্র — অবশ্য পরে দিয়া শোধ লওয়া আরম্ভ করছে। আগরতলার বাঙালীরা বোমা লয়া, রামদা লয়া আক্রমণ করে পাহাড়্যা মারণ আরম্ভ করছে। বাস থাইক্যা গাড়ী থাইক্যা টাইন্যা টাইন্যা কুপাইয়্যা কুপাইয়্যা কম মারছে না। আগরতলা খুইজ্যা একটা প্যাহাড়ী পাইবা না। বস্তা ভইর‍্যা কাইট্যা কাইট্যা পাহাড়্যা শালারারে ঢুকায়্যা নদীর মধ্যে কম ছাড়ছেনি। নাক চেপটা দেখলেই সারে, অক্করে টুমায়্যা লাইব। লরি ভইর‍্যা বাঙালীরা পাহাড়্যা খুঁজত বাইর অইচে। এদিক দিয়াও আইব। তখন আমরাও ছাড়তাম না। তিপরা বেটাইন দেখবা কোন্তা জানে না, অক্করে সাধু। বিতরে বিতরে শালারা এক।

একজন আরেকজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। সন্দেহের অবিশ্বাসের কালো মেঘে কালবৈশাখীর মত কালো হয়ে আসে সবার মুখ। কে কাকে কাটব কে জানে। কাটার কারণই বা কি বুঝে উঠে না কেউ। ভাবতে গিয়ে শরীর অবশ হয়ে আসে। ঝিনঝিনি বাতগ্রস্ত রোগীর মতো। পরিবেশটা থমথমে যখন — দুম করে সুরেন দাস জিজ্ঞেস করে, মন্টুব বাপ অনেক কথা তো কইল্যা, একটা কথা জিগায়, তুমি যে কইলা চম্পকনগর শুইন্যা আইছ। আমিও তো কাইল রাইত দশটা পর্যন্ত চম্পকনগর বইয়্যা আইছি। আমরার কানে দেখি ইতান কথা কেউ কইল না।

দেবেন্দ্র গলায় ঝাঁজ ফুটিয়ে বলে — তুমি শুনবা কই। নিজে অমর মাহাজনে দেইখ্যা আইছে। সুরেন বাধা দিয়ে বলে — অমর মাহাজনের কথা ছাড়! নিজে দেখছনি কও? নিজে তো দেখছ না। অমুকরে জিজ্ঞাইলে কইব হমুকে কইছে, হমুকরে জিজ্ঞাইলে কইব, হমুক, নিজে দেখইন্যা কেউ নাই। ইতান মিছা কথা কইয়্যা কী লাভ।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে আস্তিন গুটিয়ে উদ্যত ভঙ্গীতে দেবেন্দ্র দাঁড়ায় — বাঙালী বাঙালীর রক্ত চাস্। দাঁতে দাঁত চেপে কটমট তাকায়। পারলে যেন চিবিয়ে ফেলবে। সবার প্রতি উদ্দেশ্য করে সুরেনকে দেখিয়ে বলে — ইটি রাজাকার! আগে ইটিরে কাটন লাগব। আগে ঘরেরটি পরিষ্কার কইর‍্যা পরে পাহাড্যা কাটন লাগব। ইটি না কাটলে শান্তি আইত না দেশে। পাহাড়্যার দালাল! বেশী কথা কইলে ইখানই টুম দিয়া লাইমু। ওর চোখ মুখে নেকড়ের মুখ। চোখ দুটি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে ধূর্তামির শাণিত চাউনি। শকুনের চেয়েও ধার লাগে সুরেনের কাছে। সুরেন্দ্র এতটা বিব্রত হবে আশা করেনি।

হঠাৎ নীরবতার বরফ ভাঙে পাঞ্জাবী ওভারসীয়ারের বাঁশীর শিসে। মন চলে না, হাত পা চলে না তবু টাঙ্গি, কোদাল, ঝুড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে মজুররা এগোয় পাহাড় কাটার কাজে।

দেবেন্দ্র মেটের শুনানো গল্পে, সবার মনে বিলম্বিত এক প্রতিধ্বনি। সুরেন বিশ্বাস করে না ওকে। উড়িয়েও দিতে পারে না ওর কথা। তবু জানে দেবেন্দ্র তার মতই মজুর ছিল। আগে একবার মজুরি নিয়ে মজুররা হরতাল করে। তখন পাহাড়ী বাঙালীর দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবেন্দ্র হরতালটাকে বানচাল করেছিল। সেই থেকেই মজুর থেকে মেট বা সর্দার পদে উন্নীত। তাই সুরেন বাঙালী এক মজুরিনীর ঝুড়িতে মাটি ভরতে ভরতে বলে — শুনলানিগো। দেবেন্দ্র মেটের হাতী মারন্যা গপ্। নিজের চোখে যেমন দেইখ্যা আইছে! এই রকম গুজব মাইর‍্যা কামলারার মনে ভয় ঢুকায়্যা দিছে। ইতান গপ শুইন্যা কেউ কারে বিশ্বাস করব? তিলরে তাল কইর‍্যা গন্ডগোল বাজায়্যা লাভ কি! বাঙালী মজুরিনীর মনে আতঙ্ক সঞ্চারিত, সে হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি। দেবেন্দ্র মেটের কানে এসব কথা পৌঁছলে ছাঁটাই করে দেবে। আবার ঘটনাগুলো পুরো অবিশ্বাসও করতে পারেনা।

দেবেন্দ্র পাশে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে কথাটা শুনে। হঠাৎ চীৎকার করে বলে, পাহাড়্যার দালালটা কি কয়রে। কেউ উত্তর দেয় না। কোন কথা কেউ বলেনি ভাবটা এমন। সবার মনে উৎকণ্ঠা কখন ঘর ফিরবে।

পরের দিন কেউ কাজে যায়নি। ভয়ে আতঙ্কে সবাই সবার ঘরে। শব্দের চেয়েও তীব্র বেগে ছুটছে গুজব। হাজারো বছরের মানুষ মানুষের বিশ্বাস চূর্ণবিচূর্ণ করে। ললিত চম্পকনগরে নুন কিনতে আসে অমর মহাজনের ঘরে। আধা কেজি লবণের দাম এক টাকা রাখে মহাজন। ললিত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে — কি মা-জন বাকি পয়সা ফিরত দিত নানি। অমর মহাজন কালো বিশাল মুখের অতিকায় চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বেলে বলে — দাম আর কইর‍্য না, পাহাড়ী বেটার কাছে লবণ বেচছি যে তোমার কপালটা বালা। যাও, এইখানতে যাও। সময় বালা না।

ললিতের বুকটা খামচে উঠে। নিশ্চল চোখের তারা। কিছু বুঝে না এই অবজ্ঞার, বঞ্চনার কারণ কী? পার্বত্য মুখে থমথমে আতঙ্কের গাম্ভীর্য্য। কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বুকে অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলে — মা-জন বিচারের মানু অয়া তুমি এমন কেমনে কয়।পাহাড়ী মানু তোমার দোকান মাঝে মাগনা জিনিস খায়নি। অমর মহাজনের গদীর কোণে দেবেন্দ্র মেট। চোখের ইশারায় কি বলল কি জানি। অমর মহাজন লাফ দিয়ে গদী থেকে নেমে লবণের পুটলি কেড়ে ধমকায় — যা বেটা যা, পয়সাও পাইতে না, লবণও পাইতে না। যা পারস্ কর গিয়া। দেবেন্দ্র মেট বলে, আমরা বালা দেইখ্যা এখনও খাতির করি তোমারে। কোনদিন রাম দা লইয়া কচু কাটুম ঠাকুরই জানে। দেবেন্দ্রের মুখে চোখে তখন ধূর্ত হাসি।

বিস্ময়ে চমকে ওঠে ললিত। প্রতিবাদের ভাষা পায় না। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক

গিলে বারবার। থমথমে পার্বত্য মুখটা লজ্জায়, অপমানে ঘৃণায় রাঙিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড অসহায় লাগছে নিজেকে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু। বিচার, প্রতিকার, শব্দগুলো যেন তার নিজের জগৎ থেকে মুছে যাচ্ছে নিমেষে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বেরোয়। জোড়া জোড়া সন্দিহান দৃষ্টি-তীর তার দিকে নিক্ষিপ্ত। চারদিকে একবার তাকায় এক সন্ধানী দৃষ্টি ছুড়ে। না, বাজারটাতে পাহাড়ীর সংখ্যা খুব কম। বাঙালীদের মধ্যেও খুঁজে ঘনিষ্ঠ কাউকে। তার পক্ষে দাঁড়িয়ে এই অন্যায়ের মুখোমুখি প্রতিবাদ করার মতো। কাউকে দেখে না। যাদেরকে দেখছে অপরিচিতই বেশী। অনেকের সাথে পরিচয় আছে তবে ঘনিষ্ঠতা নেই। যারা ঘনিষ্ঠ তারা আবার অসহায় ভীরু ধরনের লোক। রিক্ত হাতে, জগদ্দল পাথরের মতো একবুক অপমান, বঞ্চনা নিয়ে ঘরে ফেরে।

দু'তিন দিন বাজারে যায়নি মংকুরুই টিলার লোকগুলো। ভয়ে কাজে যায় না। গত রাতে সুরেন একটা কাঁঠাল আনে। সেটা খেয়ে দু'বাড়ীর লোকগুলো একরকম রাত কাটায়। আর উপোস করা যাচ্ছে না। আতঙ্কের কালো ধোঁয়া ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশঃ। রাখাল বৈরাগী বৌ বাচ্চা নিয়ে বোচকা বেঁধে ঘর ছেড়ে পরশুদিন চলে গেছে রাণীরবাজার। ধনপদ জমাতিয়া বোচকা নিয়ে পাহাড়ের গভীরে বৌ ছেলেমেয়ে রেখে এসেছে। ঘর একেবারে ছাড়েনি। একা রাতভর জেগে ঘরে বসে থাকে। শিবচরণের কিছু নেই, একা বুড়া মানুষ। সেও তার অন্ধ মেয়েটাকে পাহাড়ে নিয়ে রাখতে গেছে। এখনো ফিরেনি। মহাজনরাও লরি করে জিনিসপত্র সহ মেয়েছেলেদের শহরে পৌঁছে দিয়েছে। সন্ধ্যে হলেই সারা চম্পকনগর ছমছমিয়ে উঠে। বড়মুড়ার পাহাড়ে লুকানো শতাব্দীর সমস্ত রাত্রির অন্ধকার চম্পকনগরেব সমস্ত অঞ্চল জুড়ে জমে।

ক্ষুধার জ্বালা আর মানা যায় না। ভোর বেলা দু'বাড়ীর লোক ছুটল বর্ডার রোডের কাজে। যাদের ঘরে কিছু আছে তারা কেউ যায়নি। যাদের উপোস যন্ত্রণা সহ্য হয়নি তারাই কেবল কাজে গেছে। অন্যদিন দেড়শো দুশোজন কাজে যেতো, সেদিন ষাট সত্তরের বেশী হয়নি।

সবাই যখন কাজে, বুড়ী তখন বাঁশীকে নিয়ে ঘর পাহারায়। ক্ষিদের জ্বালায় বসন কাঁদে। থামাতে পারে না বুড়ী। ঘর তন্ন তন্ন করে কিছু খাওয়ানোর মতো খুঁজে পায় না। অনেক কষ্টে দশ বারোটা কাঁঠালের বীচি যোগাড় করে পুড়ে খাওয়ালো। পেটটা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হলো। বেশীক্ষণ কান্না থামিয়ে রাখা যায়নি। ভাতের ক্ষুধা কাঁঠাল বীচি দিয়ে কত মিটাবে! সুরেন ললিত ওরা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হবে। দুটো বাড়ীতে এই দুটো মনুষ্য প্রাণী ছাড়া অন্য কোন মানুষ নেই। ঝিরঝির্ বাতাস বইছে অন্য দিনের মতোই। তবু মনে হচ্ছে বুড়ীর কোন সর্বনাশা কাল বৈশাখীর পূর্বাভাষ। কাজে যারা গেছে ওরা ফিরে আসবে কিনা কে জানে! বুকের ভিতরটা অজানা আশঙ্কায় তীক্ষ্ন নখে কোন জন্তু খাঁমচে খাঁমচে ধরছে। উৎকর্ণ কান পাখীর ডাকেও চমকে উঠে। উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ।

সন্ধ্যে বাতি জ্বালিয়ে দিলো কি দিলো না। হঠাৎ শুনলো এক আকাশ চিরানো আর্তনাদ। বুড়ী বাঁশীকে বুকে চেপে বেরোয়। পূর্ব পশ্চিম দু'দিকে আগুন জ্বলছে। দুম্ দাম্ গুলির শব্দ না বাঁশ ফাটা শব্দ কে জানে। আতঙ্কে বসন আরো জোরে বুড়ীর গলা জড়িয়ে জাপটে ধরে। কোনদিকে পালাবে বুড়ী ভেবে পায়না। হাত পা কাঁপে ঠক্ ঠক্। ঘোলাটে চোখ জোড়া ঝাপসা হয়ে আসে। থরথরিয়ে চোখের পাতা কাঁপিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকায়। তবু দেখে না। শুধু আগুন চীৎকার কান্না শুনছে। নজর চড়াতে গিয়ে ঠোঁট হ্যাঁ হচ্ছে। ঠাহর করতে পারে না। গরু বাছুর ছাগলের বিকট চীৎকার কানে তীক্ষ্ম শলাকার মতো বিঁধে। বোঝা গেলো আগুনে-ঝলসে দড়ি ছিঁড়তে না

পেরে আর্তনাদ করছে। নিজের অজান্তেই চীৎকার করে। নিজেই আবার আতঙ্কিত হয় নিজের চীৎকারে। একবার ছুটে ললিতের উঠোনে একবার নিজের উঠোনে। ধরার মতো কোন অস্ত্র খুঁজে পায়না। আগুনের হল্কা আকাশে উড়ে তীব্র বেগে। নীল আকাশটা মশারীর মত পুড়ে পুড়ে খান খান। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সমস্ত দিগন্ত লাল হয়ে আসে। চোখে জ্বলুনি ধরে। চারদিক জুড়ে আগুনের ব্যূহ। বিশাল দানবের মতো আগুন হাঁ করে জিভ লক্‌লকিয়ে তাদের দিকেই ছুটে আসছে। ঝড়ো বাতাসের মাতাল ঘূর্ণি চারদিকে পাক খায়। আগুনের ঢেউ চারদিকে আঠারমুড়ার চেয়ে উঁচুতে উত্থিত। আগুনের ঢেউ বাঁশ ঝাড়ের দিকে কম। সেদিকে উদভ্রান্তের মতো ধায়। সর্বনাশা ধ্বংস নাচে। উন্মত্ত আগুন সে দিকেও ছুটে। বুড়ী হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আবার ছুটে হাওড়া নদীর পানে! মানুষ, পশুর আর্তনাদ ছাপিয়ে আগুনের গর্জন। এই ভীম গর্জন বজ্রপাতের চেয়ে বিলম্বিত ও ভয়ঙ্কর। সমস্ত ক্রোধের জেহাদ যেন দুটি মনুষ্য প্রাণীর বিরুদ্ধে। ভীত চকিত হরিণী যেন ছুটে জ্বলন্ত জুমের ভিতর। বাঁশ ঝাড়ে সহস্র পাখীর কলরব। কলরব নয় ধ্বংসের মুখোমুখি আর্তনাদ। বাঁশের অজস্র কঞ্চি সূচালো কাঁটাব মতো উদ্যত। সেদিক ছাড়া পথ নেই। সেই পথে বেরোয় বুড়ী। সারাটা দেহ কঞ্চির তীক্ষ্ণ নখরে ফালা ফালা। কোন রকম নুইয়ে নুইয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে। হঠাৎ খুব কাছে বিকট চীৎকার। সমস্ত বিশ্ব সংসার যেন থর্ থর্ কেঁপে উঠে নিমেষে। পাশে একটা কুশবন। নিজেকে আড়াল করে সেখানে ঢুকে। একটা অর্ধদগ্ধ বাছুর যন্ত্রণায় লেজ উঁচিয়ে প্রাণপণে দিশেহাবা ছুটে। শিউরে উঠে বুড়ী। সারাটা দেহ অবশ। পা দুটি ভাবী লাগছে, কে যেন জোর করে বাঁকিয়ে দিচ্ছে হাঁটুব জোড়া। থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। সম্বিত ফিরে আসে। কোন দিকে এগোবে কূল কিনারা পায় না। বাঁশীর কোমল ঠোঁট থেকে নিঃসৃত উষ্ণ লালা বুড়ীর কাঁধ গলা ভিজায়। বাতাসে তীব্র শিস্ দিয়ে এক ঝাঁক তীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধায়। আরেক ঝাঁক তীর পশ্চিম থেকে পূবে মিলায়। গলা উঁচিয়ে কপালে বলি রেখা ফুটিয়ে আতঙ্কিত চোখে একবার তাকিয়ে চোখ আবার বুজে। শহরের পানে ছুটে। ছুটতে ছুটতে কিছুদুর গিয়ে মনে পড়ে কোলের শিশুটা ভিন জাতের। ওর বোঁচা নাক দেখে কেউ ছাড়বে না। ক্রুদ্ধ উন্মত্ত নরখাদকের চোখে পড়লে পায়ে ধরে ছুড়ে মারবে জ্বলন্ত আগুনে। বুড়ী বাঁশীর বোঁচা নাকটা চিমটি দিয়ে; প্রাণপণ শক্তি দিয়ে টানে। যন্ত্রণায় একবার চীৎকার করে বুড়ীর বুকে আবাব লেপটে মিশে যায়। উন্মাদিনীর মতো বুড়ী উল্টো দিকে পাহাড়ের দিকে ধায়। যেতে যেতে খচ্ খচ্ করে বুকটা। ওইখানে তার নিজের মৃত্যু নিশ্চিত। টাক্কালের মুখে কাঁধের উপর গলা থাকবে না। একূল ওকূল দুই কূলেই ভয়। হঠাৎ ভাবে যা হবার হবে। বাঁশীকে ফেলে যাবেই। নিজেকে নিজে নিষ্ঠুর পরামর্শে শক্ত করে বাঁধে। কোলটা একটু শিথিল হতেই বাঁশী খসে যাওয়ার ভয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুড়ীর গলা চেপে ধরে। ছোট হাতে যেন এক দানবীয় শক্তি। বুড়ীর বুকের পাঁজরে যেন এক নিরাপদ খাঁচা। সেখানেই সে পায় বাঁচার রক্ষার দৃঢ় অথচ উষ্ণ আশ্বাস। এই কূল ওই কূল কোন কূলেই যাওয়া নিরাপদ নয় যাদের, তারা কোন পানে ধায়! বুড়ী ষাট বছরে অভিজ্ঞ মন তন্ন তন্ন করে সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না। হঠাৎ বুড়ী চমকে উঠে দু'দিকের তীব্র টর্চের আলোতে। টর্চের আলো বলা ভুল, দুই দিকে দুই হিংস্র নেকড়ে বাহিনীর লোলুপ চাউনি। বুড়ী কুশবনের দিকে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তিনদিন পর পুলিস কুশবনে খালের ধারে আবিষ্কার করলো দুটো মৃতদেহ। বুড়ীর বুকে আলিঙ্গন আবদ্ধ পাহাড়ী শিশুটা। একটা বর্শায় একসাথে গেঁথে রয়েছে দুটি মানুষ।

— গল্পটি ২৬শে মার্চ, ১৯৮৩, 'আলোর ঠিকানা' গল্প সংকলনে প্রকাশিত।

সহধর্মিনী শব্দটি আমার জীবনে সার্থক

বিজয়লক্ষ্মী সিংহ

প্রকাশনার অনুপ্রেরণায় এই অযোগ্য হাতে কলম নিয়েছি। আমার জীবনে এত দুঃসাহস কখনো করিনি। এক অপরিমেয় ব্যক্তিত্বের পরিমাপ এবং তার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রকাশ অন্তত আমি বড় কঠিন কাজ বলে মনে করি। তাছাড়া তাদের পক্ষে এ কাজ সম্ভব বা শোভা পায় যারা সাহিত্যিক, কবি, গ্রন্থকার, শিল্পী ও গীতিকার। তাদের মধ্যে তো আমি কেউ নই। এই অভিনব প্রকাশনায় প্রকাশিত সমগ্রে প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ অসাধারণ, অমূল্য অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সে তুলনায় আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতার প্রকাশ স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। তবুও এই অতুলনীয় প্রকাশনার সাথে আমার অভিজ্ঞতাকে স্থান দেয়ার জন্য প্রকাশনীকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি।

১৯৮০ সালের ৯ই মে আমার নতুন জীবনের শুরু। অর্থাৎ পারিবারিক জীবন। খুব কম সময়ে জানতে পারলাম যে তিনি নাকি পরিবারের অর্থাৎ মা-বাবার চাপে বিয়েতে বাধ্য হন। মা-বাবা চেয়েছিলেন যে ছেলে হিসেবে পারিবারিক জীবন লাভ করুক এবং সংসারের দায়-দায়িত্ব পালন করুক। এছাড়া মা-বাবারাও নিজের দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে ছিল ঠিক উল্টো। বিবাহিত জীবনের আবদ্ধতায় তিনি থাকতে চাননি। আবদ্ধহীনতায় থেকে জীবনকে দেশের সেবায় নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ব্যক্তি সাধারণতঃ উদাসীন হন। সেটা পারিবারিক জীবনের প্রতিকূল। সময়ের গতিতেই বলুন আর পারিবারিক চাপেই বিয়েতে রাজী হন। ইচ্ছে প্রকাশ করেন যে অতি সাধারণ পরিবারে এবং খুব সাধারণভাবে বিয়ে করবেন। তখন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত বিধায়ক। বিয়ের দিন বাড়ি থেকে টি. আর. টি. সি.-তে সাধারণ প্যাসেঞ্জার হিসেবে একা বিয়ের মণ্ডপে পৌছান। কেউ তাঁকে বর হিসেবে চিনতে পারেননি বা মনেও করেননি। কমলপুর থেকে পরিবারবর্গ ও সহযাত্রী পৌছাবার পর তাঁকে বর বলে পরিচিত করান। যথারীতি নিয়ম অনুসারে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিয়ের শুভারম্ভ হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, লৌকিক কতকগুলি নিয়ম পালন করতে দেননি। তার মধ্যে বিলাসিতামাফিক কোনও কিছু করতে দেননি এবং কতকগুলি নিয়মও পরিত্যাগ করেন। ক্রমশঃ বাড়ি ফিরে আসা হল। ঠিক পরের দিন থেকেই যথারীতি রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করেন।

প্রতিদিনের কর্ম ধারাবাহিকতা আমাকে ভাবতে বাধ্য করতে থাকল। সমস্ত মানুষের পারিবারিক জীবন ও আমাদের পারিবারিক জীবন, দুটোর মধ্যে কোনও মিল পেলাম না। স্বাভাবিকভাবে নিজেকে প্রশ্ন করি—এই ব্যক্তির ইচ্ছা কি হতে পারে, উদ্দেশ্য কি হতে পারে এবং কি লক্ষ্য হতে পারে? খুবই কম সময়ে প্রশ্নের উত্তর হিসেবে একটা সুন্দর উদাহরণ দেখতে পাই। সেটা হল বাড়ির পাশে একটা শিশু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে আশ্রমে ২৫ জন মেয়ে শিশু বসবাস করে লেখাপড়া করত। আর সে আশ্রমের যত ব্যয়ভার ত্রিপুরা সরকার বহন করতেন। ঐ অনাথ আশ্রম এখনো আছে সেটা কমলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে। তাঁর কাছে একটা আচরণ সবসময় দেখতে পাই যে, কাউকেও কোনদিন অবহেলা করেননি। কত লোকের

আসা-যাওয়া বাড়িতে লেগে থাকত সারাদিন। তবুও কোনদিন বিরক্তি বা অসহ্য মনে করতেন না। উপরন্তু প্রত্যেকের মনের দুঃখ, অভাব ও সুবিধে-অসুবিধে জানতে ব্যস্ত থাকতেন।

রাজনৈতিক জীবন থেকে পারিবারিক জীবনে আসতে চাননি— তার একটা প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ছোট্ট ঘটনা প্রকাশ করতে চাইছি। সেটা তাঁর জীবনে কেন প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যক্তির ভাবনা ও অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়। আমাদের বিয়ের ঠিক ১৯ দিনের দিন শুরু হয় ১৯৮০ জুনের দাঙ্গা। সে দাঙ্গা চলাবস্থায় তিনি সদর আগরতলায় ছিলেন, আমি ছিলাম কমলপুরের বাড়িতে। দাঙ্গার খবর শুনে গ্রামবাসী থেকে শুরু করে সমস্ত রাজ্যের মানুষের হতাশার সীমা ছিল না। সে সময়ে কোন কিছুর খবর পাওয়ারও উপায় ছিল না। ছিল না টেলিভিশন, ছিল না টেলিফোন। মোবাইলের তো প্রশ্নই আসে না। খবর পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল রেডিও আর পত্রিকা। সেটাও একদিন পর। দাঙ্গার গতি আগুনের মতো এগিয়ে চলেছে। তাঁর কোন খোঁজ নেই। এদিকে সদরে তাঁকে স্থানীয় লোকেরা সশস্ত্রভাবে পাহাড়ী অঞ্চলের লোক ভেবে কামান চৌমুহনী থেকে পেছনে ধাওয়া করে। মৃত্যুর ভয়ে জীবন রক্ষার তাগিদে, জীবনকে হাতের মুঠোয় করে ছুটতে ছুটতে এক অপরিচিত মহিলার ছোট্ট কুটিরে আশ্রয় নেন। ঐ মহিলাকে অনুরোধ করে বলেন যে, কতগুলো লোক অস্ত্র হাতে তাঁকে ধাওয়া করছে, তাদেরকে যেন তাঁর কথা না বলেন। অনেকক্ষণ মহিলাশ্রয়ে থেকে নিজেকে লোকদৃষ্টির আড়াল করে স্থানীয় বিধায়ক ভবনে পৌছান। সেখানে আরও কয়েক লোকজন জীবন রক্ষা করছিলেন। আবার সেখানেও আশঙ্কাজনক ব্যাপার। ভবনের দাবোয়ান বন্দুক হাতে আশ্রিত লোকদের হুমকি দিচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত ভবনে একটা টেলিফোন

বিয়ে ৯ই মে, ১৯৮০। এক মাস পরে তোলা (বাঁ দিকে) এবং দু'বছর পরে তোলা (ডান দিকে) ছবি বিমল সিংহ ও বিজয়লক্ষ্মী সিংহ।

ছিল, সে টেলিফোনে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীকে বিস্তারিত ঘটনা জানান। মুখ্যমন্ত্রী সি. আর. পি. এফ. পাঠিয়ে তাঁকে ও লোকজনদের প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ দেববর্মার বাসভবনে পৌঁছে দেন। দাঙ্গার ঠিক ১০ দিন পর তিনি কমলপুর আসলেন। পরিবারবর্গদের হতাশা দেখে খুব মর্মাহত হলেন। বাড়ির সবাইকে কাছে বসিয়ে ক'দিনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে শুনালেন। মৃত্যুকে কাছে থেকে দেখে যে মানুষ জীবনদান পায় সে মানুষ কখনো কাউকে মৃত্যুর মুখে যেতে দেবেন, না ঠেলে দেবেন? আর সে সময় থেকেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি-উপজাতিদের মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়। সে মতানৈক্যের সেতু বন্ধনে এবং উভয় জাতিগোষ্ঠীর মিলনদূতরূপে তিনি নিরপেক্ষতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিধায়কতার কার্যকলাপের মধ্যে প্রতিনিয়ত একের পর এক আন্দোলনের সূত্রপাত করতে থাকলেন। তাঁর জীবনে ছাত্র আন্দোলনতো অনেক আগের কথা, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ভূমি সংস্কার আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে খুব ব্যস্ততার মধ্যে থাকতেন। আমাদের রাজ্যে অসংখ্য মানুষ গৃহ ও ভূমিহীন ছিলেন। ভূমি সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে বন আরক্ষা দপ্তর থেকে ভূমি কেড়ে "ভূমিহীন" নামে গ্রামের সুব্যবস্থা ও ভূমিহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। খাজনা আইন তিনি খর্ব করেন যেটা লেভি বলে প্রচলিত ছিল। সরকারী আইনে পুলিস ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষিজাত ফসল কেড়ে নিয়ে আসত যেটাকে আজকাল ইনকাম টেক্স নামে আদায় করা হয়। সে দুরবস্থা থেকে খাজনা মকুব পর্যন্ত গরীব কৃষকদের পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করেন। আরও উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে গরীব কৃষকদের জন্যও বর্গা আইন আন্দোলন সংগঠিত করেন। জমিদারী ব্যবস্থাপনা আমাদের ত্রিপুরাতেও কিছুটা ছিল সেটা বর্গা আইন আন্দোলনের মাধ্যমে হ্রাস করাতে সক্ষম হন। বনাঞ্চলের গরীব শ্রেণীর মানুষ বন থেকে জ্বালানী কাঠ বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। বন আরক্ষা দপ্তর তাদের দা, কুড়াল কেড়ে নিয়ে জেলে পুরে দিতেও অপেক্ষা করত না। তাদের জীবন যাত্রায় প্রতিনিয়ত জুলুম করে বেড়াত—সে দিক থেকেও গরীব শ্রমিকদের সাহায্য করতে হাত ফেরাননি।

পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার চা-শ্রমিকদের সম্পর্কে ভাবতেন। আমাদের ত্রিপুরায় বিশাল বিশাল এলাকা নিয়ে মালিকানাধীন চা-বাগান ছিল। কার্যরত শ্রমিকগোষ্ঠী তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে প্রতি মুহূর্ত বঞ্চিত হত। এসব বিষয় তাঁকে খুব আহত করত। আকর্ষণীয় বিষয় হল, এই সমস্যা সমাধানে তিনি মিত্র আন্দোলন করেন। মালিকগোষ্ঠীর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। সে মিত্র সম্পর্কের উপহার হিসেবে শ্রমিকদের মজুরী, বাসস্থান, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন চাহিদার ঘাটতি পূরণ করাতে সক্ষম হন। তিনি ভূমি সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক ভূমি বন বিভাগ থেকে টি-কর্পোরেশনের আওতায় আনেন। সে ভূমিতে ছোট ছোট চা-বাগান করে শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে তুলে দেন। পাহাড়ী এলাকায় যেসব চা-বাগান তৈরি করান সে বাগানগুলি উপজাতিদের ঐতিহ্যে ঐতিহাসিক নামকরণও করেন। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ্য, "মায়েনতুকু" (বন্য হাতীদের নিরাপত্তাস্থান), "অহিচক" (নূতন সূর্য্যের আলো), নতুন বাগান ইত্যাদি।

একের পর এক আন্দোলনের পর তাঁকে সারা ভারতবর্ষের সি. আই. টি. ইউ. সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কোচিনে যেতে হয়। সম্মেলনে তিনি সর্বভারতীয় সি. আই. টি. ইউ. সংগঠনের সহ-সভাপতি পদে মনোনীত হন। সে সময়ে তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার

উপাধ্যক্ষ ছিলেন। উপাধ্যক্ষতায় থেকে ত্রিপুরার মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কে চিন্তা করতেন। কিন্তু প্রশাসনিক গণ্ডীবদ্ধতার জন্য মানুষের সংস্পর্শে তেমনভাবে আসতে পারতেন না। তাতে মনে মনে খুব অনুতপ্ত হতেন। তবুও কাজের ব্যস্ততার অবসরে টেলিফোনে সাধ্যমত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। প্রত্যেক পরিচিত ও অপরিচিত মানুষের সুখ-দুঃখ ও সমস্যায় হাত বাড়াতেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে শুরু করে বাল্য বন্ধু-বান্ধবদের সহৃদয়তা দেখাতে তিনি ভুলে যাননি। দিনের অধিকাংশ সময় লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ঐ সময়ে কয়েকটি লেখা তিনি সম্পূর্ণ করেন। সেগুলির মধ্যে "লংতরাই", "মনাইহাম', "তিতাস থেকে ত্রিপুরা", 'ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে", "বসনের ঠাকুরমা", "আলোর ঠিকানা", "ধীরে বহে ধলাই", "গোলাপের ছেলেবেলা", "রাইমা উপত্যকার উপকথা", "কাঁসার বাটি". "জাবেদ আলির আজান", "বিপথের পথিক" এবং "তখাপাড়ার ইতিকথা" উল্লেখযোগ্য। "লংতরাই" উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্র জগতেও তিনি রূপ দান করেন। অনেক পাঠকবর্গ ও শুভাকাঙক্ষীদের সহযোগিতায় তিনি এই অভিনব কার্যেও সফল হন। সে সিনেমা শুটিং-এর সময় ত্রিপুরায় উগ্রবাদীদের তীব্র আক্রমণকাল। এক টিলায় সিনেমার শুটিং হত—সে আবার মোটর গাড়ীর লাইটের আলোতে; অন্য টিলায় সন্ত্রাসীদের আক্রমণ ও বন্দুকের আওয়াজ শুনা যেত। এমন অবস্থায় সে সিনেমা সম্পন্ন করেন। উপন্যাসের কাহিনীটি বিশেষ আকর্ষণীয়। তৎকালীন মহাজন গোষ্ঠী অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা পাহাড়ী অঞ্চলের সহজ, সবল, সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন পন্থায় শোষণ করত। সে অবিচার থেকে বাঁচাবার জন্য সিনেমার মাধ্যমে তিনি ঐ জাতিগোষ্ঠীদের চেতনা দিতে চেয়েছিলেন। সে চেতনা আজকের উপজাতিদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে তুলেছে। সহজ সরল ও নিরীহ মানুষজাতি নিজস্ব সংস্কৃতি, কলা ও কৃষ্টির প্রতি যে শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী — সে দিকটা এখানে উল্লেখযোগ্য। রিয়াং জাতিদের পৃথিবীর কোন অঞ্চলেও দেখা যায় না। তথাপি গণিত লোকসংখ্যার মধ্যেও নিজস্বতাতে নিগূঢ় প্রেম ও বিশ্বাস তাদের আচরণে শিক্ষণীয়।

তার সাথে সাথে নিজের জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতেও তিনি খুব যত্নবান ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ও. বি সি- তে অন্তর্ভুক্ত করা পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা কম যায়নি। এদের কৃষ্টির উপর একটা টেলিফিল্ম ও সিনেমা তৈরি করেন। তার নাম হল (১) "নুঙসিপি" (২) "সরালেতে রাজা'। ত্রিপুরা রাজ্যের বিষ্ণুপ্রিয়াদের জন্য শ্রীশ্রী কৃষ্ণ মন্দিরের সংস্কার, কমিউনিটি হল নামে যোজনা তৈরি করেন। কোন গ্রাম এই যোজনা থেকে বঞ্চিত হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মণিপুরীদের সংগঠিত করার জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টায় ১৯৯৫ সালে তিনদিনব্যাপী "মহামেলা" অনুষ্ঠিত করেন আসামের পাথারকান্দি মহকুমার 'মণ্ডমালায়'।

অজানাকে জানার ইচ্ছা আমি তাঁর চরিত্রে দেখতে পাই। ত্রিপুরা, ত্রিপুরার বাইরে এমনকি ভারতের বাইরেও এই চর্চা করতেন। যখনই তিনি যেখানে যেতেন, নির্ধারিত কাজ সেরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যেতেন। সেখানে বয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের ভাষা শেখার চেষ্টা করতেন। তাদের কৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতি, বংশ পরম্পরা ও জাতির ইতিহাস প্রভৃতি জানার চেষ্টা করতেন। নিজস্ব ভাষা ছাড়াও তিনি অন্যান্য ভাষা জানতেন। প্রত্যেক মানুষ নিজস্ব ভাষাকে অতিশয় ভালবাসে। তিনিও প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর ভাষা আয়ত্ত করতে সচেষ্ট থাকতেন। তাদেরকে ভালবাসা দিতে, তাদের ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করতেন।

১৯৮৯ সালে রাশিয়ায় সি. আই. টি. ইউ. সংগঠনের বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের এক আকাঙ্খাও ঐ যাত্রায় পূর্ণ হয়। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ নিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন। তখন থেকে তাদের কীর্তিকলাপ ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো এবং বিশেষ করে লেনিনের সমাধি পরিদর্শনের ইচ্ছা রাখেন। সম্মেলন পরিশেষে তিনি লেনিনের সমাধি পরিদর্শনে যান। সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে ছাত্র জীবন থেকে পড়ে ও শিখে আসা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ অবলম্বনে নিজেকে এক প্রকৃত 'কমিউনিস্ট' গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন ঐ মুহূর্তে বাস্তব রূপে উপলব্ধি করেন। সে অনুভব এবং উপলব্ধি নিয়ে তিনি ত্রিপুরায় ফিরে আসেন।

দু'বছর পর দুর্ভাগ্যবশতঃ এক গাড়ী দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। সদরের জি বি হাসপাতালে দীর্ঘ ২৫ দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মনে মনে এক স্বপ্নও দেখেন। সে স্বপ্ন হল কোন না কোন সুসময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ হলে ত্রিপুরার চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ এবং আবশ্যকীয় ব্যবস্থাপনা উন্নতমানের দিকে নিয়ে যাবেন। কিছুদিন পর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে ভূষিত হন। অধ্যক্ষাবস্থায় তিনি সাইপ্রাস কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। সাইপ্রাসের মতো এক ছোট্ট দেশের জীবনযাত্রা ও উন্নত পরিকাঠামো দেখে ভাবতে থাকেন এবং তার তথ্য সংগ্রহ করেন।

তিন বছর পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রীত্বের সম্মান লাভ করেন। স্বপ্নেব বাস্তব রূপদানেও তিনি সময় নষ্ট করেননি। সচেষ্ট ভাবে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে গ্রাম, আধা-শহর ও শহর এমনকি আগরতলা পর্যন্ত তাঁর পরিষেবা থেকে বাদ যায়নি। সাথে সাথে রাজ্যের নগর উন্নয়ন পরিষেবার দায়িত্বে থাকাতে ত্রিপুরার প্রত্যেক নগরাঞ্চলকেও রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ-সহযোগে বিদেশী শহরাঞ্চলের মতো সাজিয়ে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। তার আংশিক রূপ হিসেবে আগরতলা শহরের পরিধি বিস্তার থেকে আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন যোজনাও তিনি করেন।

সহধর্মিনী শব্দটি আমার জীবনে সার্থক। পথপ্রদর্শক কথাটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর আচরণ থেকে যে শিক্ষা আমি পেয়েছি সে শিক্ষা আমাকে মানুষের কাছে যেতে প্রেরণা দিয়েছে। মানুষকে বিশ্বাস করা, মানুষকে শ্রদ্ধা করা, সহানুভূতিশীল, সমবেদনশীল হতে শিখিয়েছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, যখন কারও কাছে তাঁর আত্মকথা শুনি—সে লোকজন প্রত্যেকেই তাঁকে আমার চাইতেও আপনজন বলে দাবী করে। আর তাঁর সম্পর্কে আমি যা জানতে পেরেছি তার বহুগুণ বেশি সে লোকজন তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরেছে। প্রত্যেক লোক তাঁর আন্তরিকতাকে দাবী করে। সে আন্তরিকতা আমি তাদের মধ্যেও দেখতে পাই যা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন। আবার সে আন্তরিকতা মানুষ আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যেন মনে হয় আমার জন্য তাঁর ভালবাসা ও আন্তরিকতা মানুষের কাছে পুঞ্জীভূত করে রেখে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য তাঁর চিন্তা, আদর্শে চলা, বলা আমার পক্ষে কতটা সম্ভব হবে জানি না। তবুও এখন পর্যন্ত পাওয়া দিগদর্শন নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিষেবা করে চলেছি। আর যে সব স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তার বাস্তব রূপ দেয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তবুও মনে আশা রাখি সময়ের গতিতে সে স্বপ্নও বাস্তবায়িত হোক। সমাজ ঐ বাস্তবকে সাক্ষীরূপে তাঁর অমরত্ব দান করুক।

"বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"

রুজালীন সিংহ

ফুল আপনার জন্য ফোটে না। এটা সকলের কাছেই জানা। তবুও প্রশ্ন জাগে তবে কার জন্য বা কিসেব জন্য ফুল ফোটে? জানি, এ প্রশ্নের উত্তর আছে তবে আমাব মনে এ উত্তব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সংশয় থাকা খুবই স্বাভাবিক। ১৯৪৮ সালেব ১৬ই অক্টোবব একটি দিন। যে দিনটিতে অজানা অচেনা অখ্যাত একটি ফুল ফোটেছিল।

শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজ, আমি যে ফুলটির কথা বলছি সেটি আসলে কোন ফুল নয মানুষ কূলে জন্ম নেওয়া কমলপুব শহরের রূপসপুরের মাটিব মানুষ, আমাব শ্রদ্ধেয 'কিচিং' স্বর্গীয় বিমল সিংহ। এখানে যদি এই কিচিং শব্দেব অর্থ না বলি তাহলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে মনে হয়। বাবাব যে বিভিন্ন ভাষাব উপব দখল ছিল তা সকলেব জানা। আমি বাবাকে কেন কিচিং বলে সম্বোধন কবি, তা এখানে তুলে ধবছি।

জন্মেব পব যখন আমার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ বেব হত তখন তিনি আমায আদব কবে কোলে তোলেন। এমনি একদিন আমাব মুখ থেকে বেব হওযা এক শব্দেব সাথে 'কিচিং' শব্দেব হুবহু উচ্চাবণগত মিল শুনতে পান। আর তখনই তিনি ধবে নেন যে, আমি বাবা না বলে কিচিং ডাকাব চেষ্টা কবছি। আব সেই থেকেই এই কিচিং শব্দটি আমাদেব পবিবাবেব সঙ্গে জড়িত। এই

কোলে পুত্র বিচার্ড

রুজালীন কোলে, বিচার্ড কাঁধে।

কিচিং শব্দটি রিয়াং ভাষাজাত একটি শব্দ। যার অর্থ 'বন্ধু'। শব্দের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ পর্যন্ত আমি, কিচিং ও রিচার্ড একে অপরের সাথে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ আমাকে ও রিচার্ডকে কিচিং কখনই ছেলেমেয়ের মত দেখেন নাই। ভাবি এক দুই করে ১৮-১৯টা বুলেট যখন কিচিং-এর বুকে বিদ্ধ হল তখনও বোধ হয় কিচিং—রিচার্ড ও আমাকে নাম না ধরে চিৎকার করে কিচিং কি — চি—ং বলে প্রিয় লংতরাই-এর পাদদেশে প্রবহমান ধলাই নদীর পাড়ে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ছাড়েন। কতই কষ্ট না পেয়ে আমাদের কিচিং মৃত্যুবরণ করেন। না-না কিচিংতো কষ্ট পেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নাই, বীরের মতো হাসির ঝলক মুখে করে মৃত্যুকে শ্রদ্ধা সহকারে আলিঙ্গন করেছেন। যারা কিচিং-এর প্রাণ স্পন্দনহীন দেহ দেখেছেন তারা দেখেছেন সেই উজ্জ্বল হাসির ঝলক। এই হল আমার কিচিং।

আমার কিচিং নেই মারা গেছেন কথাটি যতই নিগুঢ় সত্য হোক না কেন আমি তা বিশ্বাস করি না, করবও না। তবে হ্যাঁ, কিচিংকে যে সু-কৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই। '*জন্মিলে মরিতে হইবে*' কথাটির যথার্থতা আছে কিন্তু জন্মিলে হত্যা করা হবে কথাটির যথার্থতা খুঁজে বের করার ভার আমি নত মস্তকে পাঠক সমাজের উপর ছেড়ে দিলাম।

বিমল সিংহের মতো লোককে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা কি? কি স্বার্থ এখানে জড়িয়ে আছে? এর সদুত্তর কি কেউ দিতে পারবে? সদুত্তর যতই জানা থাক তা অপ্রকাশিত থাকবেই তার কারণ To me, the plan and blueprint to assassinate Bimal Singh is very very big and vast. আমার কিচিং-এর মতো সাধারণ, সহজসরল মানসিকতার লোক এযাবৎ আমি খুবই কম দেখেছি। তার ভালবাসার মধ্যে কোন দাগ থাকত না। যখন যাকে যেভাবে সাহায্য করা যায় করত। আর এজন্যই তো Quarter-এ অপেক্ষাকৃত লোকের ভীড়টা বেশী থাকত। কিচিংকে জিজ্ঞেস করতাম যে, কি বলে ওদেরকে আশ্বস্ত কর? বলত, দেওয়ার কিছু নাই শুধুই চেষ্টা করতাম লোকগুলোর মনের ভেতরের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা, মান অভিমান জানার। আর এতেই খুশী ওরা। সবাই তো সাহায্য পান নাই, পেয়েছেন সান্ত্বনা, আশ্বাস। তাই এখনও লোকজন আসে কিছু পাওয়ার আশায় না - কোন দাবির জন্যও না। উনারা আসেন সান্ত্বনা-আশ্বাসের বাণী নিয়ে। আর, আমার মা আমি ও রিচার্ডসহ আত্মীয় স্বজনেরা বেঁচে আছি সেই সান্ত্বনা-আশ্বাসের বাণী ও চিড় ধরা হৃদয় নিয়ে।

আমার প্রিয় কিচিং সবসময় চিন্তা করত কিভাবে অনুন্নত এলাকাকে উন্নত করা যায়। সর্বহারা পিছিয়ে পড়া লোকদেরকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। তিনি সবসময় বলতেন আমরা যদি সেইসব লোকদের বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তুলতে পারি, তাদের মনের সুখ-দুঃখের সাথে এক হতে না পারি, তবে করবে কে, আর পারবে কে ?

সবসময় দেখতাম, কিচিং বাগিচা-শ্রমিক থেকে শুরু করে সকল পিছিয়ে পড়া লোকদের সমস্যা ভাবনা নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে থাকত। তাদের কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে বা শুনতে পেলে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতেন। সেইসময় কিচিং-এর কাছে দিন রাত, ভয় অভয় কিছুই থাকত না। থাকত শুধু সেইসব লোকের অব্যক্ত ব্যথা বেদনা, আর্তনাদ ও হাহাকার। তিনি সবসময় বলতেন যে, আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের জন্য আমি আছি, ওদের চিন্তা করি, ওদের মাঝেই নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাই, নিজেকে দেখতে পাই আর চেষ্টা করি যেন কোনদিন তাদের মাঝে থেকে হারিয়ে না যাই।

এ হত্যাব ফলে আমবা শুধু কিচিংকে হাবাইনি। শত সহস্র লোক হারিয়েছে তাদের মনেব মানুষেব একজনকে। এ হত্যাকাণ্ডেব প্রতিফলন ঘটছে ও ঘটতে থাকবে। কিচিং রাজ্যকে, জন্মস্থান এবং বাজ্যবাসীকে ভালবাসত বলেই এ বাজ্যে ছিলেন। না হলে প্রচণ্ড সুযোগ ছিল বাজ্য ছেড়ে চলে যাবাব। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলি International Trade Union এব সম্পাদক না সভাপতিব প্রস্তাব এসেছিল। মোহ, লোভ, লালসা ও স্বার্থকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান কবেছিলেন শুধু বাজ্যে থাকার জন্য। রাজ্যবাসীব সুখ দুঃখেব সাথী হতে পাবাব জন্য।

কিচিং মাবা যাযনি, হত্যা করা হযেছে। সব হত্যার মরণ হতে পাবে না। মাবা যাযনি, কেন জানেন? যদি মাবা যেতেন তাহলে তো স্বাভাবিক মৃত্যু হতো। আর তা না হয়ে কিচিং-এব প্রশস্ত বুকে ১৫ থেকে ১৬টা বুলেট আব পেছনে ডানদিকে তিনটা বুলেট বাধ্য কবালো পৃথিবী থেকে সবে যেতে। যদিও পেছনেব তিনটা বুলেটের হিসাব নেই।

এ হত্যাকাণ্ড কিসেব? কাদেব ইন্ধনে ও কাদেব স্বার্থে? বাজ্যের কোন্ উন্নযনমূলক কাজে লাগাবাব জন্য কিচিং-এব বক্ত ঝবানো হলো? এব কি বিচাব হবে? বিচাবেব ফলে কি কিচিংকে ফিবে পাবো, না বাজ্যবাসী প্রিযজনকে ফিবে পাবেন? এ হত্যাকান্ডে তাবা জডিত যাবা একাধিকবাব উপকৃত হযেছে কিচিং ˚ বিমল সিংহেব দ্বাবা, তাব মধ্যে কোন মানুষ হযত চাকুবীব দ্বাবা আব কেউ-বা হয়ত অন্য কোনভাবে।

যাবা এ হত্যাকাণ্ডে জডিত প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষভাবে তাবা প্রতি সেকেন্ড অনুশোচনা কবছে ও মাবা যাচ্ছে। এটাই তাদেব পাওনা প্রাযশ্চিত্ত। "মৃত্যুব আগে কাপুরুষেবা হাজাববাব মাবা যায কিন্তু বীব এব মৃত্যু হয।" কোর্টে যে বিচাব সে বিচাব বিচাবেব জন্য, বাযেব জন্য। যেখান থেকে সৃষ্টি সেখানেই হয প্রকৃত বিচাব। অপ্রিয সত্য - প্রকৃত বায কখনো প্রকাশ হবে না তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি "বিচাবেব বাণী নীববে নিভৃতে কাঁদে।" *— স্মবণিকা বিমল সিংহ স্মৃতি নাট্যোৎসব, ১৯৯৯, দুর্বাব নাট্যগোষ্ঠী কমলপুব*
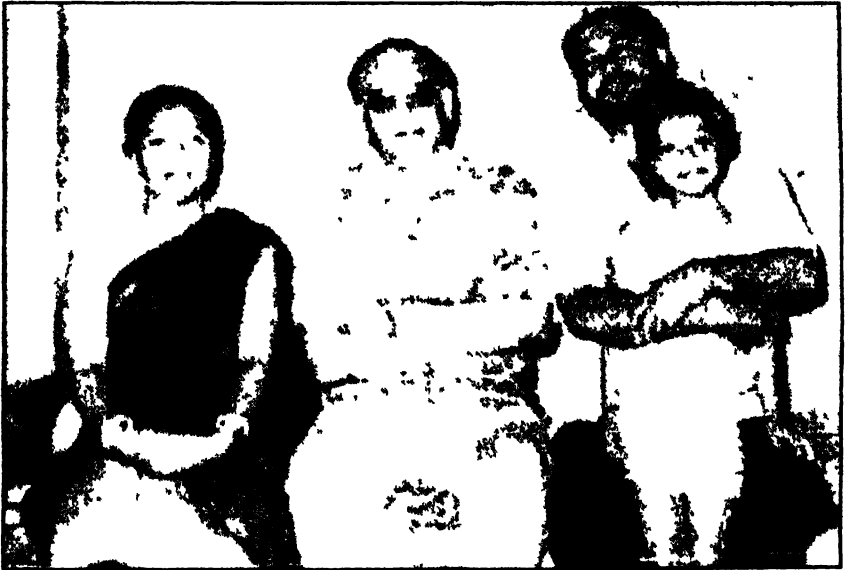
প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পবিচালক বসন্ত চৌধুবীব সাথে স্ত্রী বিজযলক্ষ্মী, মেযে রুজালীনসহ বিমল সিংহ।

কথাশিল্পী বিমল সিংহ স্মরণে

বিমল চৌধুরী

বিমল সিংহকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। খবরটা শোনামাত্র হৃদয় উদ্বেল হয়ে দুটো ধারা ফল্গুর মত উৎক্ষিপ্ত হলো। শোকতপ্ত অশ্রু আর দুরন্ত ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ। বিশ্বাসঘাতক সন্ত্রাসবাদীরা, সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক, জননেতা তথা মন্ত্রী বিমল সিংহকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করেছে। সঙ্গে ওঁর ভাইকেও। এই অশ্রু, ঘৃণা, ক্রোধ শুধু ব্যক্তি আমি নই, প্রতিজন ত্রিপুরাবাসীকেই দগ্ধ করেছে। এই ক্রোধ ও ঘৃণা সম্মিলিত হয়ে ফুটন্ত লাভাস্রোতের মত নেমে আসবে সমস্ত চক্রান্তকারী অশুভ শক্তির উপর। ত্রিপুরার লেখালেখির পরিমণ্ডলে বিমল সিংহ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। উচ্চশিক্ষিত, বহুভাষায় পারঙ্গম বাহুল্য বর্জিত সুভদ্র এই কথাশিল্পীর লেখায় পাহাড় বনানীময় ত্রিপুরার মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবনচর্যা, গাছগাছালি, পশুপাখি-সমন্বিত প্রকৃতি, পরিবেশ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে কারণ তিনি এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতেন।

আমার মনে হয় আর কারোব লেখায় ত্রিপুরার ঘাস-জমি-পাহাড়-টীলা-জঙ্গল নিয়ে অঙ্গাঙ্গী জড়িত মানুষের কথা এত সজীব এবং আন্তরিক হয়ে ধরা দেয়নি। এদিক থেকে কথাশিল্পী বিমল সিংহ অনন্য। ওঁর লেখা উপন্যাস নিয়ে ককবরক ভাষায় প্রথম চলচ্চিত্র 'লংতরাই' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। "তথাপাড়ার ইতিকথা", "মনাইহাম", গল্প-উপন্যাস অবলম্বনে নাটক উপস্থাপিত হয়েছে। "আলোর ঠিকানা", "করাচি থেকে লংতরাই" প্রভৃতি গল্প লোকগাঁথায়, ওঁর সাহিত্য-নিষ্ঠ মনের পরিচয় মেলে।

মন্ত্রীপদে বৃত হবার পর কোন অনুষ্ঠানে দেখা হলেই খেদ প্রকাশ করতেন, দাদা, লেখালেখিতে একদম সময় দিতে পারছি না। কী বা করবো! তবে আমরা জানতাম, তারুণ্যে ভরপুর, প্রাণচঞ্চল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এই কথাকার পরিণত মন নিয়ে আরও অনেক লিখবেন। ত্রিপুরার স্মাহিত্য দিনেদিনে আঁরও পরিপুষ্ট হবে ওঁর নিষ্ঠ লেখনিতে। কিন্তু হঠাৎ এই নির্মম মৃত্যুঘাত, প্রচুর সম্ভাবনাময় ত্রিপুরার বলিষ্ঠ কলমটিকে অকালে থামিয়ে দিল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং ত্রিপুরার লেখকদের পক্ষে আমাদের প্রিয় কথাশিল্পীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি জানাচ্ছি সহমর্মিতা।

এই নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রতিটি ত্রিপুরাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং বামফ্রন্ট সরকারকে যথোপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি করছি। *—ত্রৈসি দেশের কথা, ২রা এপ্রিল, ১৯৯৮*

সেই অবসরে বিশ্রাম

'এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে?'

প্রসঙ্গ ঃ বিমল সিংহ

ডঃ মহাদেব চক্রবর্তী

বিমল আমার প্রিয় ছাত্র। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ওকে পেয়েছিলাম। সাধারণতঃ প্রয়াত শিক্ষকের স্মরণসভায় ছাত্ররা স্মৃতিচারণ করে; আজ কত বড় দুর্ভাগ্য : প্রয়াত ছাত্রের স্মৃতিচারণা করতে হচ্ছে শিক্ষককে। এই দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে কত ছাত্র এসেছে, হারিয়ে গেছে — অধিকাংশকেই মনে নেই; কিন্তু যাদের ভোলা যায় না, চেষ্টা করেও কেউ ভুলতে পারে না, তাদেরই একজন বিমল সিংহ। কলেজের নবীন-বরণ উৎসবে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিচ্ছে ফর্সা, ছিপছিপে, ফুলের মত সুন্দর এক তরুণ — তখন কিন্তু সে মাত্র প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসের ছাত্র। ইংরেজী যে সবটাই শুদ্ধ হচ্ছে তা হয়তো নয়; কিন্তু কি গভীর আত্মবিশ্বাস! আজও মনে আছে শিক্ষায়তনে ছাত্র ও শিক্ষকের স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিমল সেদিন বিখ্যাত Broke (ছোট্ট নদী) কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল ঃ

" .... Men may come,
and men may go,
but I go on forever"

(কত মানুষ আসে, কত মানুষ চলে যায়, কিন্তু আমি চিরদিন বয়ে চলি)।

সেদিন কলেজটা ছিল আমাদের প্রাণ। সকাল থেকে সন্ধ্যে কলেজেই কাটতো। শুধু আমরা কিছু শিক্ষক কলেজে এতটা সময় কাটাতাম তা' নয়, আমাদের কিছু প্রিয় ছাত্রও সাথে থাকতো। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটা অনেকটা পারিবারিক বন্ধনের মত ছিল। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার 'ইঁদুর দৌড়' কৈলাসহরে তখনো ঠিক আজকের মত শুরু হয়নি। হাতে সময় যথেষ্ট ছিল বলে সমাজ-পৃথিবী-মানুষ নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং আগামী সুন্দর পৃথিবী তৈরীর স্বপ্ন অনেক তরুণ ছাত্রের চোখে-মুখেই দেখা যেত। বিমল বই পড়তে খুব ভালবাসতো, বিশেষ করে দুর্জয় সাহস ও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। ওর সবচেয়ে প্রিয় মডেল ছিল : চে-গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো, হো-চি-মিন ও মাও-সে-তুং। এইসব মহান যোদ্ধাদের উপর আমার কাছে যত বই ছিল, সবই ছিল বিমলেরই জন্য। কলকাতা থেকে গ্রীষ্ম বা পূজোর ছুটির পর যখনই ফিরে আসতাম, প্রথম ছুটে আসতো বিমল নতুন কি বই এনেছি দেখার জন্য। সেইসব দিন কোথায় হারিয়ে গেল! সেদিনের তুলনায় আজকের তরুণ ছাত্রসমাজ কেমন যেন বিবর্ণ, হতাশাগ্রস্ত। জিজ্ঞাসু বা অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের সংখ্যা দিনদিনই দ্রুত কমে যাচ্ছে! এ-তো আর ছাত্রদের দোষ নয়, দোষ আমাদের সকলের, দোষ সমগ্র সমাজের। একদিকে আমরা আজ বলছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদে পৃথিবীটা আজ একটা ছোট্ট গ্রামে পরিণত হয়েছে, এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে ছুটছে মানুষ; অন্যদিকে আবার দেখছি আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ক্রমশঃ গন্ডিবদ্ধ ও স্বার্থপর হতে হতে নিজেকে ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বন্দি রাখতেই বেশী পছন্দ করছে, আশ-পাশের ঘটনা বা প্রতিবেশী সম্পর্কে তার কোনও উৎসাহ নেই। বিমলরা মানুষকে ভালবাসতো; রাং-রুং অথবা গোলকপুর চা-বাগানের বঞ্চিত, মালিকের অত্যাচারে

নিপীড়িত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই ছাত্র-জীবন থেকেই ওদের সংগ্রামের শরিক ছিল বিমলের মত কিছু ছাত্র। এরই জন্য দেখতাম ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে বিমল যখন বিপুল ভোটে জয়ী হত তখন কৈলাসহরের আশে-পাশের চা-বাগানে শুরু হত আনন্দের জোয়ার। ঢাক-ঢোল-বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যখন চা-বাগান থেকে বড় বড় মিছিল আসতো, তখন ছাত্র-সংসদের নির্বাচন এমন একটা রূপ নিত মনে হত যেন সাধারণ নির্বাচন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমরা এসব দেখতাম, উপভোগ করতাম, ছাত্রের বিজয়ে আমরাও গর্বিত হতাম। মানুষের জীবনের সার্থকতা বোধ হয় এখানেই। পরস্পর যদি সুখ-দুঃখের সাথী হতে না পারি, আমার মৃত্যুতে যদি পরিচিত দু-একজনেরও চোখের পাতা একটুকুও ভিজে না ওঠে তাহলে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে যায়। সুকান্ত'র 'ছাড়পত্র' প্রায়ই আবৃত্তি করত বিমল আমাদের ঘরোয়া আসরে ঃ

"...... চলে যাব — তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি —
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।।"

সব কাজ বিমলের সারা হল না; এ পৃথিবী আজও নবজাতকের কাছে পুরোপুরি বাসযোগ্য হয়নি, জঞ্জাল এখনো অনেক, অনেক বাধা-বিঘ্ন; আরও একটু সতর্ক থাকা দরকার ছিল। ফুল পরিপূর্ণভাবে ফোটার আগেই ঝরে গেল! ষাটের দশকে কৈলাসহর কলেজের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কলেজটা তখন ছিল বেসরকারী। স্বৈরাচারী অধ্যক্ষ ও পরিচালকমণ্ডলীর ভয়ে অনেকেই জড়সড়। সে ছিল এক 'ত্রাসের রাজত্ব'! কত নিরপরাধ অধ্যাপককে একের পর এক ছাঁটাই করা হয়েছে; মৃদু প্রতিবাদ করতেও কেউ সাহস করেনি। বিমলের মত কিছু ছাত্র কলেজে ঢোকার পর এই অবস্থার পরিবর্তন হল। এক সাথে দু'জন অধ্যাপক ও একজন ডেমনস্ট্রেটারকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করার সাথে সাথেই ছাত্র-আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। দীর্ঘদিনের এই আন্দোলন অনেক আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রমের পর অবশেষে সফল হল ঃ ছাঁটাই অধ্যাপকরা (তাদের মধ্যে একজন বর্তমানে ঐ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) চাকরী ফিরে পেলেন এবং যার অঙ্গুলি হেলনে এতসব অঘটন ঐ কলেজে এতদিন হয়েছিল সেই স্বৈরাচারী অধ্যক্ষকে বিদায় নিতে হল। সম্ভবতঃ বিমলের জীবনে এটাই ছিল প্রথম আন্দোলন (কমলপুরে স্কুলে ছাত্রাবস্থায় বিমল কোনও আন্দোলনের শরিক ছিল কিনা ঠিক জানি না)— এই কঠিন আন্দোলনের শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিশুর মত মাঝেমাঝে অভিযোগ করত : 'স্যার, ওরা আমাকে বিমল সিন্‌হা বলে ডাকে। আমি তো 'সিন্‌হা' নই, আমি 'সিংহ'। উত্তরে বলতাম : 'ঠিকই তো তুমি তো 'সিংহ'ই। আসলে, ও ছিল একটা খাপ খোলা তরোয়াল ; ওর দুর্জয় সাহস দেখে আমারই মাঝে মাঝে ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত হতাম। এবার রাজভবনে যখন মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যপালের সামনে শপথ নিচ্ছিল, দূরে বসে কৌতূহলী হয়ে আমি শুধু একটা শব্দ ও কিভাবে বলে লক্ষ্য

করছিলাম : 'সিন্‌হা' উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই ও শুধরে নিয়ে 'সিংহ' বলল এরপর। আসলে মন্ত্রী হলেও আমার চোখে ও ছাত্রই ছিল চিরদিন (শিক্ষক জীবনের এই এক খারাপ অভ্যাস); এরই জন্য শপথ অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ করেছিলাম। রাজনীতির জগতে যে মানুষটি বিমলকে হাত ধরে সামনে এনেছিলেন তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈদ্যনাথ মজুমদার। একদিকে ত্রিপুরার কিংবদন্তী পুরুষ দশরথ দেব এবং অন্যদিকে সর্বত্যাগী নির্লোভ বৈদ্যনাথ মজুমদার—এই দু'জনের প্রশংসায় সব সময় পঞ্চমুখ ছিল ছাত্র বিমল সিংহ। এদের দেখেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বিমল।

একবার আমাদের কলেজে 'মক্ - পার্লামেন্ট' বা 'নকল - লোকসভা'র আয়োজন হয়েছিল। মনে আছে, সেই সময় বিখ্যাত সাংসদ পিলু - মোদী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বিমল। তার অভিনয় দক্ষতা দেখে অনেকেই সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল। শেকস্‌পীয়ার আবৃত্তি করে মাঝে মাঝেই বলত : 'স্যার জীবনটা তো এক নাট্যশালা, যেখানে বিভিন্ন ভূমিকায় আমরা শুধু অভিনয় করে যাচ্ছি।' ১৯৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমলেব সাথে দেখা — ও তখন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থেকে আইন ও সাংবাদিকতা পড়ে। সেই সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আধাফ্যাসি সন্ত্রাস, দুপুরবেলায় অন্ধকার, তার উপবে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে যেতেও মানুষ ভয় পেত। জিজ্ঞাসা করেছিলাম · 'তুমি ওখানে থাকো কি কবে?' উত্তরে বলেছিল বিমল "স্যাব, চে - পড়েছি, পবিচয আত্মগোপন কবে কিভাবে অন্যদের সাথে থাকা যায় সেইসব কৌশল আমি জানি। মোটেই চিন্তা কববেন না। আমি বেঁচে থাকব।"

গত ২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) কলকাতায় 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ' কর্তৃক আহূত 'বিমল সিংহ স্মরণসভা'য় আমিও গিয়েছিলাম। কলকাতায বিমলের অনুরাগী এত মানুষ আছেন জানতাম না। ঐদিনের সভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের গতি - প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক

৩৯তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী কনফারেন্সে

মদত ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি যখন উল্লেখ করলাম যে, 'আন্ডার গ্রাউন্ড' উগ্রপন্থী এবং 'ওভার গ্রাউন্ড' সহযোগী ও মদতদাতারা কিভাবে একযোগে জাতি-উপজাতির মিলনভূমি ত্রিপুরাকে ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছার-খার করার জন্য রক্তের হোলি খেলছে এবং কেন বিমল সিংহ হত্যা ঘটনার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিদের একটা বড় অংশ অ-উপজাতি —তখন কিন্তু শ্রোতাদের অধিকাংশই বিস্মিত হয়েছিলেন। আসলে, ত্রিপুরার সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নেই, তাই উল্টোপাল্টা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যান। ভোটের সময় আবার এইসব বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা তুঙ্গে ওঠে। যারা গোপনে উগ্রপন্থীদের মদত দিচ্ছে, তাদেরই একটা অংশ আবার উগ্র-বাঙালী জাত্যাভিমানকে উস্কে দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগীর বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নিলেই সাথে সাথে থানা - ঘেরাও, রাস্তা-অবরোধ, বনধ্ ইত্যাদির ডাক দিয়ে শান্তিরক্ষী বা নিরাপত্তা বাহিনীর পদক্ষেপকে ওরা ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। যারা সমগ্র রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণার দাবি জানাচ্ছেন (যদিও বেশীরভাগ ঘটনাই উপদ্রুত থানা এলাকাতেই ঘটছে) তাদেরই একটা অংশ আবার মানবাধিকার লঙিঘত হচ্ছে বলে চিৎকার শুরু করছেন। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ আজ অমানবিকতা ও বর্বরতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। যেরকম ভয়ঙ্করভাবে ওরা বিমল সিংহকে খুন করল তাতে সভ্যতা, মানবিকতা কারও যদি ছিটেফোঁটাও থাকে সেও প্রতিবাদী না হয়ে পারবে না। এইসব ঘৃণ্য খুনী ও মদতদাতাদের কোনও ক্ষমা নেই। বিক্রম সিংহ আজ ফিরে এসেছে, কারণ বিক্রম ওদের লক্ষ্য ছিল না, ওদেব লক্ষ্য ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের চিত্ত জয় করা দুর্জয় সাহসের মূর্ত প্রতীক বিমল। এই রক্তে রাঙা পথে দাঁড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগিয়ে যাওয়া সুকঠিন — একথা কে না জানে। তবু জীবনেব প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পাই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি ঃ

"রক্তেরাঙা ভাঙ্গনধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধতে হবে সেতু।"

— অথবা বুদ্ধদেব বসু'র বিখ্যাত সেই 'প্রতিবাদ' কবিতা ঃ

'আজ এই ক্রান্তিকালে নিজেরে শুধাই ফিরে-ফিরে
ক্ষমা ? এরও ক্ষমা আছে? এ-উন্মত্ত হননবৃত্তিরে
নীরবে সহিতে পারে এত বড়ো মানবমহিমা
জানি না সম্ভব কিনা। ....
উদ্দীপ্ত তরুণ প্রাণে
ঘাতকের অস্ত্র যারা হানে,
মানুষের যে — মূল্য পরম
তারে করে পদাঘাত — যাদের বিক্রম
তাদের দুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি আগ্নেয় ঘৃণায়,
যদি না ঝঙ্কারি' ওঠে ধিক্ ধিক্ আমার বীণায়
তবে ব্যর্থ কবিজন্ম — মনুষ্যত্ব, তাও তবে বৃথা।"

আসলে, বিমল তো কবি। তার সাহিত্যকীর্তি, তার গল্প, উপন্যাস তো এক একটা অনবদ্য কবিতা। জীবনে কবিতা না থাকলে তো জীবনই অর্থহীন হয়ে যায়। প্রবাদ আছে, যে কবিতা ভালবাসে না, সে খুনী হতে পারে। আমি যখন কলকাতার সভায় বিমলের 'লংতরাই' উপন্যাসটি ছোট্ট করে বলছিলাম, কিংবা ১৯৮০'র দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা গল্প 'বসনের ঠাকুরমা'র শেষ অংশটি পড়ছিলাম, তখন ঐ সভায় সমবেত অনেক বড় বড় সাহিত্যিক বিমলের উপস্থাপনা, গ্রন্থনা ও শব্দচয়ন দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। 'জীবনে জীবন যোগ' না করলে যে এই সৃষ্টি সম্ভব নয় — একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সকলেই স্বীকার করলেন। বিমলের যে ক'টা বই আমি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সবই ওদের কাছে রেখে আসতে হল। আমার প্রিয় ছাত্রের সৃষ্টি সত্যিকারের সমঝদারদের জগতে এইভাবে আদৃত হচ্ছে দেখে সেদিন খুব গর্ব অনুভব করছিলাম। নিজের মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিমলের চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। আমার সাথে মাঝে মাঝে ওর এ ব্যাপারে কথা হত। খুন হবার মাত্র কয়েকদ্দিন আগে ওরই উদ্যোগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার জন্য একটা কর্মশালা হয়েছিল। কিন্তু ওর বেশীরভাগ কাজই অসমাপ্ত রয়ে গেল। কত বিরাট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না! ক'দিন আগে দুর্গাবাড়ী চা-বাগানে গিয়েছিলাম। শ্রমিক সংগঠন 'সিটু'র নেতা হিসেবে বিমল প্রায়ই সবুজে সবুজ ঐ বাগানে চা-শ্রমিকদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো। কত মধুর স্মৃতিকথা সেদিন ঐ শ্রমিকদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের এইসব কথাই ওর সাহিত্যে স্থান পেত। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই ছিল বিমলের সাহিত্যের দর্পণ। গজদন্তমিনারে বসে, মানুষ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে 'শৌখিন মজদুরী' বিমল কোনদিন করেনি; এরই জন্য তার সৃষ্টির এত কদর।

বিমলকে যারা ছিনিয়ে নিল তারা তো জানে না যে, জাতি-উপজাতির মৈত্রী, সম্প্রীতি ছাড়া আর কোনও বিকল্প ত্রিপুরায় নেই। দুর্বল সংখ্যালঘু উপজাতি সমাজ আজ পর্যন্ত যতটুকু অধিকার অর্জন করেছে (হারানো জমি ফিরে পাওয়া, ভাষার স্বীকৃতি, চাকুরীসহ সর্বত্র সংরক্ষণের বাস্তবায়ন, স্বশাসিত জেলা পরিষদ, ষষ্ঠ তফসিল ইত্যাদি) সবই প্রগতিশীল জাতি-উপজাতি মানুষের মিলিত সংগ্রামের ফসল। একা একা সংগ্রাম হয় না; সেই সংগ্রাম যারা করতে যায়, তারা শুধু ব্যর্থতারই মুখোমুখি হয়। সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্য আজ সবচেয়ে বেশী ক্ষতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর; দুর্গম পাহাড় এলাকায় পঠন-পাঠন ও উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় স্তব্ধ হবার মুখে। স্বার্থান্বেষী চক্র এমনি কায়দায় বিভিন্ন জায়গায় একটার পর একটা ঘটনা ঘটাতে সাহায্য করছে যাতে জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ৮০'র জুন মাসকে ফিরিয়ে আনার বারবার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু ত্রিপুরার জাগ্রত সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এটা কিন্তু ত্রিপুরার অহঙ্কার। সব রাজনৈতিক দলের সুস্থ চেতনার মানুষকে এটা আমাদের বোঝাতেই হবে যে, উগ্রপন্থার পথ আত্মঘাতী পথ; এই পথে চললে কারও মঙ্গল হবে না। আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষিত উপজাতি জনগোষ্ঠীর আরও বেশী সরব হওয়া; বিভ্রান্তদের গণতান্ত্রিক পথে ফিরিয়ে আনতে একমাত্র তারাই কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পারেন। আজ বা কাল বরফ নিশ্চয়ই গলবে; অন্ধকার রাত তো আর চিরদিন থাকে না।

— স্মরণিকা, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি,
২৪তম কমলপুর বিভাগীয় ৭ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ৭ জুন, ১৯৯৮

বিমল সিংহ : কিছু স্মৃতি

গৌতম দাশ

১৯৭০ সাল। এম বি বি কলেজসহ ত্রিপুরার কলেজগুলো তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ডিগ্রি কলেজ। নারায়ণ কর, অশোক মিত্র, বাদল চৌধুরী, শ্রীদাম পাল, গজেন্দ্র দেবনাথ, আমি সহ অনেকে তখন এম বি বি কলেজের এক নম্বর ছাত্রাবাসের আবাসিক। কলেজটিলার ওপারের মাঠের পূব ধারে আমাদের ছাত্রাবাস। আমরা তখন ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন করতাম (পরে যা সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়)। সে বছর আমাদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার ক'দিন আগে জানতে পারি কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সিট পড়েছে আমাদের কলেজে এবং কৈলাসহরের কয়েকজন পরীক্ষার্থী আমাদের ছাত্রাবাসে থেকে পরীক্ষা দেবেন। ছাত্রাবাসের সমস্ত আবাসিকের একসাথে পরীক্ষা পড়ে না, ফলে যাদের পরীক্ষা থাকে না ওরা সে সময় বাড়ি চলে যান। তাদের সাময়িক শূন্য সে সিটগুলোতে কৈলাসহরের পরীক্ষার্থী বন্ধুদের থাকার ব্যবস্থা হল।

সম্ভবত পরীক্ষার দিন দুয়েক আগে কৈলাসহর কলেজের পরীক্ষার্থী বন্ধুরা এলেন। সন্ধ্যায় আমাদের কক্ষে কক্ষে গিয়ে তাদের কয়েকজন পরিচিত হলেন। তাদেরই একজন সুঠাম দেহী, লম্বা চওড়া, মুখে চাপ দাড়ি— দোতলায় ডি ব্লকে আমার কক্ষে পরিচিত হতে এলেন। মুখে তাঁর অনাবিল হাসি। করমর্দন করে জানালেন, নাম তার বিমল সিংহ। অনেকক্ষণ গল্পগুজব হল। কথায় কথায় জানালেন, তিনি কৈলাসহর কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন করেন এবং ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। আমরা সবাই একসাথে পরীক্ষায় বসলাম। পরীক্ষা শেষে ফেরার আগে বিমল সিংহ আবারও দেখা করতে এলেন এবং ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। মুখে সেই হাসি। কলেজের পার্ট ওয়ান পরীক্ষার সময় বিমল সিংহের সাথে সেই প্রথম পরিচয়।

সে বছরের ডিসেম্বর মাসে কেরালার রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে (বর্তমান নাম তিরুভানন্তপুরম) ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন। ত্রিপুরা থেকে আমরা সম্ভবত ৪৫ জন ডেলিগেট নির্বাচিত হয়েছিলাম। তাদের মধ্যে বিমল সিংহও ছিলেন। আগরতলা থেকে কলকাতা হয়ে ট্রেনে ত্রিবান্দ্রম যাবার পথে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। জনসংঘের (বর্তমান বি জে পি) ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সম্মেলনও একই সময়ে ত্রিবান্দ্রমে। একই ট্রেন পরস্পরের বিপরীত মতাদর্শের ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ট্রেনেই সংঘর্ষ হল। মাদ্রাজ নেমে ত্রিবান্দ্রমগামী ট্রেন ধরার জন্য ইগমোর স্টেশনে যাবার পর বিদ্যার্থী পরিষদের প্ররোচনায় ডি এম কে সরকারের পুলিস আমাদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করল। পরে রাতে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। পরদিন কড়া পুলিশ পাহারায় আমাদের ট্রেন ত্রিবান্দ্রমের উদ্দেশে ছাড়ল।

ত্রিবান্দ্রমে এস এফ আই'র প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন — এ কে গোপালন, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, পি সুন্দরায়ার মতো কিংবদন্তী মার্কসবাদী নেতাদের সান্নিধ্য পেলাম। সম্মেলনের পর

সেসব আসরে দিলখোলা বিমল ছিলেন সবার মধ্যমণি। এস এফ আই'র প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন আমার প্রথম ও শেষ ছাত্র সম্মেলন।

১৯৭১-এর মার্চে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ শুরুর আগে আমি সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাপ্তাহিক 'দেশের ডাক' পত্রিকায় নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করি। ছাত্র সংগঠনের সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার ফলে বিমল সিংহের সাথে ক'বছর তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে বিমল আগরতলা এলেই হয় বটতলায় তখনকার পার্টি রাজ্য দপ্তরে বা সেন্ট্রাল রোডে জনশিক্ষা প্রেসে এসে মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করে যেতেন। ত্রিপুরায় কলেজের পড়া শেষ করে বিমল কলকাতা গেলেন এম এ পড়ার জন্য। সম্ভবত তখনই জ্বালা এবং অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকায় বিমলের লেখা গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। অসাধারণ সে সব গল্প। ত্রিপুরায় বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা নিয়ে এতো চমৎকার গল্প বিমল সিংহকে সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক হিসেবে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

. সাংবাদিকতা নিয়ে এম এ এবং আইন পাশ করে ত্রিপুরায় ফিরে বিমল সি পি আই (এম)-এর একজন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। জনগণের মধ্যে কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেন একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। একজন রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সময় বের করে তিনি নিয়মিত সাহিত্য সৃষ্টি করতেন। ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে, বসনের ঠাকুরমা, লংতরাই ইত্যাদি গল্প, উপন্যাস শুধু রাজ্যে নয়, কলকাতার

নিহত বিমল সিংহ'র মরদেহের সামনে শোকে মুহ্যমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ও পার্টির অন্যান্য নেতৃবর্গ।

সাহিত্য-জগতেও বিমল সিংহকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করল।

আমি কখন, কিভাবে বিমলের 'খুড়ো' হলাম জানি না, আমিও ওকে ডাকতাম 'ভাইপো' বলে। আমাদের সম্পর্কও আপনি থেকে তুমি হল। একদিন বিমল এসে আবদার করলেন, খুড়ো, আমার 'লংতরাই' উপন্যাস নিয়ে সিনেমা করব, প্রযোজক জোগাড় করে দিতে হবে। আমি বললাম, ত্রিপুরায় কেউ এখনো পর্যন্ত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি করেনি, ভাইপো, তুমি কি করে সাহস করছ? আর, তাছাড়া কে টাকা দিতে রাজি হবেন? আমি আরও বললাম, প্রযোজক হতে পারেন এমন আমার জানাশোনা কেউ নেই। বিমল আমার কাছ থেকে কোন ভরসা না পেলেও উদ্যম হারাননি। শুনেছি, অনেকের কাছ থেকে ধার করে অর্থ জোগাড় করেছেন। যারা কোনদিন হলে বসে সিনেমা পর্যন্ত দেখেনি তাদের অভিনেতা-অভিনেত্রী করে অসম্ভবকে সম্ভব করে বিমল শেষ পর্যন্ত তাঁর 'লংতরাই' উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত করলেন। এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দুঃসাহসী ছিলেন বিমল।

পরিষদীয় রাজনীতিতে বিমল তার পারদর্শিতা দেখালেন প্রথমে বিধানসভায় উপাধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে। সেসময়কার ঝোড়ো দিনগুলোতে, যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীদের হিংস্র আক্রমণ, গণহত্যার ঘটনা নিয়ে বামফ্রন্ট বিরোধীরা বিধানসভায় অগণতান্ত্রিক পথ নিয়ে বারবার রণক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা করছিল, বিমল অধ্যক্ষের আসনের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামলাতে চেষ্টা করতেন।

বন্ধু বিমলের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিল মন্ত্রী হওয়ার, যাতে জনগণের জন্য, রাজ্যবাসীর জন্য কিছু করে দেখাতে পারেন। ১৯৯৫ সালে বিমল সিংহ মন্ত্রী হলেন, তাঁকে দেয়া হল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং নগরোন্নয়ন দপ্তর। মাত্র ক'বছর বিমল মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিমল রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে যে অবদান রেখে গেছেন, তা তুলনাহীন।

রাজ্যে হাসপাতাল ছিল না, তা নয়। কিন্তু তখন জটিল রোগ নির্ণয়ের বা তার চিকিৎসার কোন সুযোগ ছিল না বললেই চলে। আগরতলার প্রধান দু'টি হাসপাতালে শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল, অধিকাংশ চিকিৎসক সকালবেলা হাসপাতালে এলে বিকেলে বা সন্ধ্যায় আর হাসপাতালমুখো হতেন না। মফঃস্বলের অধিকাংশ হাসপাতালেও এ ধরনের শৃঙ্খলাহীনতা চলছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাসপাতালগুলোতে কোন চিকিৎসক বদলি হলে যেতে চাইতেন না।

তখনো মেডিক্যাল কলেজ করার রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা ছিল না, আর পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ না হলে জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ মেলা ভার। সোনোগ্রাফী, এন্ডোস্কোপীর জন্যও রাজ্যের বাইরে রোগীদের রেফার করে পাঠাতে হত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে বিমল সিংহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করলেন। সোনোগ্রাফী, এন্ডোস্কোপী, হার্টের পেস মেকার যন্ত্র বসানো, টি এম টি, ইকো কার্ডিওগ্রাফী, সিটি স্ক্যান, মাইক্রোসার্জারী, ডায়ালেসিস ইত্যাদি যাতে ত্রিপুরার হাসপাতালগুলোতে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া যায় সেজন্য সময়সীমা ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকদের কলকাতার এস এস কে এম এবং দিল্লির এইমস হাসপাতালে তিন থেকে চার মাসের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠালেন। শুধু তাই নয়, প্রশিক্ষণ শেষে হাতে কলমে যাতে এসব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা

লভ্য করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেডিক্যাল সরঞ্জাম কেনা, অপারেশন থিয়েটারগুলো উন্নত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অনেক ডিগ্রিধারী চিকিৎসককে সুপার স্পেশালিস্ট হতে পড়তে যেতে উৎসাহিত করেছেন বিমল।

গণ্ডাছড়া, দশদা, রইস্যাবাড়ি, শিলাছড়ি ইত্যাদি দুর্গম এলাকার মানুষ যাতে নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পান সেজন্য বিমল অনেক চিকিৎসককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতেন এবং প্রতিশ্রুতি দিতেন এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে তাদের আবার শহরে ফিরিয়ে আনবেন। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে চিকিৎসকরা ওইসব এলাকায় যেতে আর না করতে পারতেন না। তেমনি, সুযোগ পেলে যে কোন সময় আচমকা হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন বিমল। চিকিৎসকরা উপস্থিত আছেন কিনা তা সরেজমিনে যাচাই করতেন এবং রোগীদের সাথে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগ জেনে নিতেন। তিনি চিকিৎসকদের স্পষ্টভাবে বলতেন — প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তিনি বাধা দেবেন না। কিন্তু হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দেয়া চলবে না। দু'বেলাই নিয়মিত হাসপাতালে আসতে হবে। যারা এই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবেন না তারা স্বেচ্ছায় সরকারী চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিন। মাত্র ক'বছর। সরকারী হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন বিমল সিংহ। যারা সে সময় প্রশিক্ষণ দিয়ে এসে জটিল রোগের চিকিৎসায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পেরেছেন তাদের অনেকে এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সময় কাজ করেন। কিন্তু অন্তত এখনো এই পরিষেবাগুলো সরকারি হাসপাতালে চালু আছে। এই অবদান বিমল সিংহের।

অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তির উৎস জনদরদী, মরমী লেখক বিমল সিংহকে রাজ্যবাসী অকালে হারাল। দেশী-বিদেশী কায়েমী-স্বার্থবাদী শক্তির মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘাতকের বুলেট বিমলকে আমাদের সবার কাছ থেকে কেড়ে নিল। মা-বাবার দত্তক নেয়া বিমলদের ভাইকে সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করেছিল। ওকে মুক্ত করতে বিমল ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অপহরণকারীদের তরফ থেকে নানা টোপ দেয়া হচ্ছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম টোপ দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বিমলকে শেষ করে দেবে — ওটাই বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আমরা পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বিমলকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলাম, ভাইয়ের মুক্তির জন্য সন্ত্রাসবাদীদের সাথে বিমলকে প্রত্যক্ষভাবে কোথায়ও আলোচনার জন্য যাওয়া চলবে না। ১৯৯৮'র ৩০ মার্চ, বিমল তখন কমলপুর। সেদিনই টেলিফোনে ওর সাথে শেষ কথা হয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবেও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর নির্দেশের কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। কথাবার্তায মনে হচ্ছিল, বিমল অস্থির। বলল, খুড়ো, পরিবারের চাপ আছে। সবকিছু খুলে বলতে পারব না।

৩১ মার্চ, ১৯৯৮। ধলাই নদীতে ঘাতকদের একঝাঁক বুলেটে বিমলের প্রশস্ত বুক ঝাঁঝরা করে দিল। যে ভাড়াটে ঘাতকরা এই নিষ্ঠুর হত্যা সংঘটিত করল, তারা এ রাজ্যের কত বড় সর্বনাশ, কত প্রচণ্ড ক্ষতি করল তা কি ওরা কোনদিন উপলব্ধি করবে?

বিমল সিংহকে যেমন দেখেছি

ডঃ সিরাজুদ্দীন আমেদ

ঘটনাটি দুঃখের, খুবই দুঃখের। বিমল সিংহকে এইভাবে অকালে হারাতে হবে আমরা কেউই ভাবিনি। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা তিনি উগ্রপন্থীদের হাতে শহিদ হলেন। এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তিনি এক ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হলেন। যারা ত্রিপুরার অনগ্রসর শ্রেণীর, বিশেষত উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন চায় না, অথচ এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এক জঘন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের খেলায় মেতে উঠেছে, তারাই এই প্রতিশ্রুতিবান, স্বপ্নদর্শী, সমাজ-সচেতন কর্মী ও সাহিত্যিককে দিন দুপুরে হত্যা করল। এই হত্যার কোনো ক্ষমা নেই। বিমল সিংহ ছিলেন সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে এক অগ্রবর্তী সৈনিক। এই শহিদ সৈনিকের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

বিমল সিংহকে দেখেছিলাম ৭০-এর দশকে। দেখলাম একটি তরতাজা যুবক, চোখে স্বপ্ন, প্রশস্ত বুক ও কাঁধ, মুখে হাসি, মনে-প্রাণে সমাজ পরিবর্তনে নিবেদিত প্রাণ এক যুবক। পরণে প্যান্ট ও হাফহাতা শার্ট, ওপরের দু'টি বোতাম খোলা, পাযে হাওয়াই চপ্পল। একটু বেপরোয়া, দুঃসাহসী। জানতে চাইলেন, কী লিখবো, কাদেব কথা লিখবো, কিভাবে লিখবো? বললাম, যাদের কথা ভাবেন, যাদের সঙ্গে আছেন, যাদের সুখ-দুঃখের বঞ্চিত জীবনের আপনি অংশীদার, তাদের কথা, তাদের মুখের সহজ সরল ভাষায় লিখুন। খুব খুশী হলেন তিনি।

এরপর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরুতে লাগল। অনেকগুলি গল্প সংকলন বেরুল, প্রকাশিত হল উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের দিনলিপি নিয়ে উপন্যাস 'লংতরাই'। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন ক্ষেত্র গুপ্ত, সস্ত্রীক। ক্ষেত্র গুপ্তের হাতে তুলে দিলাম 'লংতরাই', 'আলোর ঠিকানা', 'মনাইহাম'। এগুলো পড়ে তিনি তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন, "অপূর্ব, এককথায় অনন্য।" বিশেষ করে 'মনাইহাম' গল্প সংকলনের 'মনাইহাম' গল্পটি আলোচনা করে বললেন, "গল্পটি বিশ্বমানের। এমন লেখক এই প্রত্যন্ত ত্রিপুরায় নীরবে লিখে চলেছেন, আমি তা ভাবতেই পারি না। আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই সব রচনার প্রচার ও প্রসার দরকার।"

বুঝলাম, এ যুগের বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক খ্যাতনামা পুরুষ যা বলছেন, তার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। লেখকও সামনে উপস্থিত নেই। অতএব অযাচিত প্রশংসারও কোনো অবসর নেই। এই মন্তব্য আন্তরিক।

বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাসটিকে মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যেতে পারে। তাঁর 'আলোর ঠিকানা' এবং 'মনাইহাম'-এর অনেক গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন জীবন সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে একই সঙ্গে স্থাপন করা যায়। অনগ্রসর শ্রেণীর ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকার এখানে স্পষ্ট ভাষায় রূপ পেয়েছে।

'লংতরাই' উপন্যাসে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনা, এবং এ থেকে উত্তরণের একটি বিশেষ স্তরকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এরা আদিম সাম্যবাদী জনগোষ্ঠী। ত্রিপুরার পাহাড়ে সমতলের মতো চাষবাস হয় না। চৈত্রের শেষে টিলার গাছপালা পুড়িয়ে জুম ক্ষেত তৈরী করতে

হয়। চাষ চলে যৌথ শ্রমের বিনিময় প্রথায়। এরা জুমিয়া। বৃষ্টি শুরু হলে সেই টিলার উপর বিভিন্ন শস্য ও ফলের বীজ বাঁশ দিয়ে খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়। একটার পর একটা ফসল ওঠে। কিন্তু তা দিয়ে সারা বছরের অন্ন সংস্থান হয় না। বছরের বেশীরভাগ সময়ই তাদের অর্ধাহারে, অনাহারে থাকতে হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের বাঁচতে হয়। তবুও তাদের জীবনে ফুটে ওঠে প্রেমের কুসুম। বয়স্করা সন্তান-সন্ততিদের রূপ কথার গল্প বলে। সে গল্পে আছে রাজতন্ত্রের শাসন-শোষণের কথা। সেইসব গল্পে ফুটে ওঠে আদিম জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদের ভাষা। সে ভাষা প্রত্যক্ষ নয়, অপ্রত্যক্ষ, তির্যক তার ভঙ্গি।

এখানে যে নায়ক-নায়িকার কথা বলা হয়েছে তারা হল জরকামুনি এবং সাজেরুঙ। কিন্তু এরা তাদের আদিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। আসলে এই জনগোষ্ঠীর সকলেই নায়ক, সকলেই নায়িকা। তাদের আলাদা কোনো পরিচয় নেই। এরা তাদের সংস্কার, কৃষিভিত্তিক উৎসব এবং নানা অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে ওঠে, যখন জুমের ফসল ঘরে ওঠে। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, স্বাস্থ্যরক্ষার রোগ, শোক, দুঃখ এবং মহামারী নিয়ে ঘর করে। পাহাড়ে যখন ওয়াং পাখি ডাকে তখন তারা প্রমাদ গোণে। তারা ভাবে মড়ক আসছে। তারা তখন তাদের প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী লাউ-তাউ দেবতার পূজা করে মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য। কিন্তু মৃত্যু আসে এক ভয়ংকর বেশে। মৃত্যু দূতের বিরুদ্ধে লড়াই করেও উপজাতি জনগণ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তারা মৃত্যুর বার্তাবাহী ঢোলক বাজিয়ে এই মহামারীর বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে অনাহার এবং চিকিৎসাব অভাবে এইসব আদিবাসী জীবনের পাতাগুলি অকালে ঝরে যায়।

কিন্তু তাদের সমাজে পরিবর্তন আসে। গড়ে উঠে নতুন সমাজ, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। পার্বত্য এলাকায় নতুন জেলা পরিষদ গড়ে ওঠে। জুমিয়াদের একটু অন্ন, একটু শিক্ষা, একটু চিকিৎসা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা চালু হয়। গড়ে ওঠে ন্যায্যমূল্যের সরকারী দোকান। গড়ে ওঠে আরো কত ব্যবস্থা যা তাদের বাঁচাতে পারে, বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

এই পরিবর্তনের জন্য যে নতুন সরকার উদ্যোগী হয়েছিল, এই উপন্যাসে তাদের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি। লেখক এদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগকে ফলাও করে, বড়াই করে বলার একবারও চেষ্টা করেননি। একবারও বলেননি উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। বরং লেখক বলতে চেয়েছেন তাদের সংগ্রাম শেষ হয়নি; তাদের সংগ্রাম সবে শুরু হয়েছে। একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে অধিকার আছে, সেই অধিকার সম্বন্ধে চেতনা এনে দেওয়াই এই উপন্যাসের মূল লক্ষ্য।

বিমল সিংহের 'লংতরাই' আধুনিক যুগের এক মহাকাব্য। এযুগে কবিতার মাধ্যমে মহাকাব্য তো লেখা হয় না! গদ্যই এ যুগের মহাকাব্যের বাহন। লেখক এখানে আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন নিয়ে, তাদের জীবন থেকে নেওয়া উপাদান নিয়ে যে উপন্যাস রচনা করলেন, তার সার্থকতা এখানেই।

'আলোর ঠিকানা' গল্প গ্রন্থের ''রাইমা উপত্যকার উপকথা'' গল্পটি ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকার উপজাতি জুম চাষীদের শোষণ-বঞ্চনা এবং তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কথা ধ্বনিত হয়েছে। আদিবাসীদের ওপর সরকারী অফিসারদের পীড়ন ও অত্যাচার এবং স্থানীয় মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের কথা এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে অরণ্যের উপর উপজাতি আদিবাসীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সরকারি অফিসাররা এসে ঘরবাড়িসহ সমগ্র বাসস্থান

থেকে তাদের উৎখাত করে দিয়ে বলে যে, এই জায়গা সরকারের, কোনো উপজাতির নয়। উপজাতিরা সংকল্প করে —"আমরা শহরের অফিস, আদালত অবরোধ করে এর প্রতিবাদ জানাবো। আবার আমরা একদিন এই গাঁয়ে ফিরবো; জ্বলে যাক সব কিছু, তবু আমরা নতুন করে বাঁচবো, আবার টংঘর নতুন করে বাঁধবো, সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবোই।" কিন্তু এই দুর্বল উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষগুলি শেষ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই গল্পটি ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনের সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করতে পেরেছে। গল্পের শেষে লেখক এই অধিকার বিচ্যুত আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জয়ী করে তোলেননি। তিনি এদের পরাজয়ের ট্রাজেডিকেই তুলে ধরেছেন। গল্পটি তাই সার্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর "জাবেদ আলীর আজান" গল্পে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানুষের মর্মন্তুদ জীবনের হাহাকার ফুটে উঠেছে। তাঁর 'মনাইহাম' গল্প গ্রন্থের "মনাইহাম" গল্পটির মধ্যেও উপজাতিদের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এখানে একটি পাখির খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ দু'টি ময়না পাখীর স্বাধীনতার আকাঙ্খার কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা হলেও, এখানে রূপকের আড়ালে উপজাতি জনজীবনের শোষণ মুক্তির কথাই বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে বনের পাখি, খাঁচার পাখি নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানটি ভেসে ওঠে। এর কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যেও তুলে ধরেছেন। সেখানে বনের পাখি স্বাধীনতার প্রতীক। আর খাঁচার পাখি এক বন্দী জীবনের করুণ ও অসহায়ত্বের ছবি হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিমল সিংহের এই গল্পে খাঁচার পাখির সাংকেতিকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, তা এক কথায় তুলনারহিত।

১৯৯৭-এর জুলাই মাসে কমলপুর কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি বিমল সিংহের সহযাত্রী হয়েছিলাম। যেতে যেতে তাঁর মুখ থেকে ত্রিপুরার আদিম জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনছিলাম। শুনতে শুনতে চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল এই আদিম জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা এইভাবে ক'জন ভাবতে পারে। মনে হচ্ছিল একমাত্র মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কিভাবে 'লংতরাই' উপন্যাস নিয়ে ফিল্ম করলেন। এর চিত্রনাট্য রচনা, নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য পাত্র পাত্রীদের কিভাবে নির্বাচন করলেন, কিভাবে ছবিটি তুললেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এই জনগোষ্ঠী যেভাবে কথা বলে, যে ভাষায় তাদের রাগ, ক্ষোভ, বঞ্চনা ও অনুরাগের কথা বলে ঠিক সেইভাবে চিত্রনাট্য রচনা করেছি। বাইরে থেকে কোনো নায়ক-নায়িকা আনিনি। এরা তাদেরই কথা, তাদেরই ভাষায় বলেছে। শুধু ক্যামেরার দিকে কিভাবে তাকাতে হয়, কিভাবে ডায়ালগ ছোট ছোট করে, ভাগ ভাগ করে বলতে হয় সেটুকুই শিখিয়েছি। আর কিছু নয়। এই ছবিটি ত্রিপুরার আদিম জনগোষ্ঠীর একটি ডকুমেনটারী জীবন কাহিনীর মতো বাস্তবতা লাভ করেছে। পুনরায় বিমল সিংহকে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

— স্মরণিকা, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি,
২৪তম কমলপুর বিভাগীয় ৭ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ৭ জুন, ১৯৯৮

" ...... সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"

ডঃ বিভাস কান্তি কিলিকদার

মনের স্মৃতি কোঠায় অনেক স্মৃতিই কালের গতির সঙ্গে হারিয়ে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা ইচ্ছে করলেও ভোলা যায় না। অম্লান হয়ে থাকে স্মৃতির মণিকোঠায়। দেখতে দেখতে প্রায় চল্লিশটি বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু বিমল সিংহের সান্নিধ্যে কাটানো প্রায় ত্রিশটি বছর আজও মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা।

সময়টা ১৯৬৭ সাল। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমরা। সহপাঠী আমরা অনেক। সঠিক সংখ্যা আজ আর মনে নেই। অনেকেরই নাম, চেহারা হারিয়ে গেছে। পরিচিতি থাকলেও সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়না। কিন্তু কিছু কিছু মুখ আজও স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। জীবন স্মৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে ঐ মুখগুলি। কিছুতেই ভোলা যাবে না। এখনও ওরা এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। সাহস যোগায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে।

কলেজের প্রথম দিন, প্রথম ক্লাশ। কোন বিষয়ের ক্লাশ ছিল মনে নেই। লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে গড়ন। চেহারার মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই। তবুও সে ছিল অনেকের থেকেই আলাদা। সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ কে ছেলেটির নাম বিমল সিংহ। কমলপুরের রূপসপুর গ্রামে তার বাড়ি। বিমল ও আমি দু'জনেই সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। ধীরে ধীরে দু'জনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম জীবনে সে কী হতে চায়। নির্দিধায় সে জানালো — চাকরি-বাকরি ওর পছন্দ নয়। সে জীবনে একজন বিখ্যাত Parliamentarian হতে যায়। ওর কথাগুলিই তুলে ধরি — "আমি যখন আমার বক্তব্য রাখব, তখন সমস্ত Parliament কাঁপবে।" আক্ষরিক অর্থেই সে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। ধীরে ধীরে সে কলেজে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠল। ত্রিপুরার প্রথম বেসরকারি কলেজ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। আমরা যখন ছাত্র, তখন কলেজের অনেক সমস্যা। বাঁশের ঘর। ধুলা বালির মধ্যে আমরা ক্লাশ করতাম। প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শিক্ষক ছিলেন না। কলেজ লাইব্রেরীতে তেমন একটা প্রয়োজনীয় বই ছিল না। এছাড়াও নানাহ সমস্যা। তবু আমাদের খুব ভাল লাগত কলেজের ঐ দিনগুলিতে। কলেজের সমস্যা দূর করতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শুরু হল ছাত্র আন্দোলন। এই ছাত্র আন্দোলনের হাত ধরেই বেড়ে চললো বিমল সিংহের জনপ্রিয়তা।

১৯৬৯ সাল। কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের মত না হলেও একটা বিশাল যজ্ঞ। পোস্টার, ফেস্টুনে সমস্ত শহর ছয়লাপ। মিটিং, মিছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার। এলাহি কাণ্ড। একটা প্যানেলের সাধারণ সম্পাদকের পদপ্রার্থী বিমল সিংহ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিমলের মত প্রভাব ও পরিচিতি আমার ছিল না। আমার অনিচ্ছা সত্বেও ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতির পদে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল বিমল। আমি যতটা না তার চেয়ে বেশি আমার হয়ে প্রচার করল সে। বিমলের ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমাদের পুরো প্যানেলটাই বিপুল ভোটে জয়লাভ করল।

ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সেই বিজয় মিছিলের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। মিছিলের সামনে সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। গলায় ফুলের মালা। ব্যান্ড বাজছে। পেছনে

ট্রাকের উপর ছাত্ররা বিজয়োল্লাস করছে। বিজয় মিছিল যে রাস্তা দিয়েই যাচ্ছে, আশেপাশের বাড়ির লোকজন বাইরে এসে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমার একটু লজ্জাই লাগছিল। আমার এই আড়ষ্ট ভাব দেখে আমার পাশেই বিমল আমায় চিমটি কেটে আমার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল, " তাকিয়ে দেখ্ , সবাই আমাদের দেখছে"। ওর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও শিশুসুলভ সরলতা ছিল ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের ছাত্র-সংসদের প্রথম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হল কলেজের অব্যবস্থা দূর করার জন্য কলেজের ব্যবস্থাপনা সরকার নিজের হাতে নিক্। এই দাবিতে শুরু হল ছাত্র ধর্মঘট। কৈলাসহর মহকুমা শাসকের অফিসের গাড়ি বারান্দায় আমরা ছাত্ররা অনশনে বসলাম। ত্রিপুরার প্রথম লেঃ গভর্নর এ. এল. ডায়াস সরকারি সফরে কৈলাসহরে আসছেন। ডায়াসের সঙ্গে আমাদের দেখা করার অনুমতি মিলল। সময় দেয়া হল রাত নয়টা। অনশন থেকেই আমি ও বিমল কালিদীঘির পাড়ের সেই পুরানো ডাক বাংলোয় দেখা করতে গেলাম লেঃ গভর্নর ডায়াসের সঙ্গে — আমাদের দাবি আদায়ের জন্য। লেঃ গভর্নর আমাদের বক্তব্য শুনলেন এবং বললেন আমাদের দাবি বিবেচনা করবেন। কিন্তু বিমল লেঃ গভর্নরের মুখের উপর জানিয়ে দিল — দাবি পূরণের লিখিত আশ্বাস না দিয়ে কৈলাসহর ছেড়ে যাওয়া যাবে না। বিমলের কথাতেই বলি— " যদি যেতে হয়, আমাদের বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আপনাকে যেতে হবে"। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রেপ্তার করা হল। বিদ্যুতের গতিতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। ভোর না হতেই স্কুল কলেজের শত শত ছাত্র কালো পতাকা নিয়ে আছড়ে পড়ল। মুখে একটাই স্লোগান — 'Go back Dias'। আমাদের আটকে রাখা গেল না। আমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল প্রশাসন।

যা বলতে চাইছিলাম — বিমলের দুর্জয় সাহসের কথা যা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমার জানামত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু সাহসিকতাই নয় — জাতি, উপজাতি, দল, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকেই বিমল অন্ধভাবে বিশ্বাস করত। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় — এই চরম সাহসিকতা আব মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাসের জন্যই হয়ত বিমলকে অকালে প্রাণ দিতে হল। চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল বিমল সিংহ আমাদের কাছ থেকে।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন কয়েকটি ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দিয়েছে। সর্বত্রই যখন শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালিত হচ্ছে, তখন জানা গেল কৈলাসহর মহকুমার ফটিকরায়ে (যেখানে আমার বাড়ি) কিছু লোক মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধে বাধা সৃষ্টি করছে। বিমল সিদ্ধান্ত নিল ফটিকরায় গিয়ে বাধা সৃষ্টিকারী ঐসব লোকদের বোঝাতে হবে যাতে তারা বন্ধের সহযোগিতা করে। যেই সিদ্ধান্ত, সেই কাজ। বিমলের নেতৃত্বে বেশকিছু ছাত্রসহ আমরা ঐ দিন সন্ধ্যায় ফটিকরায়ে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু কিছু লোক আমাদেব দেখে কোন প্রকার আলোচনায় না গিয়েই মারমুখী হয়ে উঠল। সংঘর্ষ বেঁধে গেল। এমন অবস্থা—পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আমাদের ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালালো। কিছু লোক হন্যে হয়ে আমাকে ও বিমলকে খুঁজতে লাগল। যেখানেই পাবে শেষ করে দেবে। এদিকে বিমল ও আমি নদীর পাড় ধরে কোনরকমে পালিয়ে এলাম। হঠাৎ খবর পেলাম, আমাদেরই এক বন্ধু অধীর চক্রবর্তী, দেখতে অনেকটা বিমলেরই মত। ছুরিকাহত হয়েছে। অন্ধকারে বিমল ভেবে কেউ তাকে ছুরি দিয়ে ঘা দিয়েছে। বিমল সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গেল অধীরকে উদ্ধার করার জন্য। বিমলকে তো আর একা ছাড়া

যায় না, সঙ্গী হলাম। অধীরকে আমরা ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলাম। তিন/চারটে সেলাই লেগেছিল অধীরের। অধীরকে নিয়ে ঐ রাত্রেই আমরা কৈলাসহর ফিরে এলাম। ঐ ঘটনায় ছাত্ররা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল। এরপর ফটিকরায় থেকে যেই কৈলাসহর আসে তাদের মারধোর করা শুরু হল। আমার বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কী এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ মধ্যস্ততায় এগিয়ে এলেন। অবশেষে অনেক আলোচনার পর মীমাংসা হল। বিমল ও আমাকে ফটিকরায়ে আমন্ত্রণ জানানো হল। অন্যান্য ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে আমরা ফটিকরায় গেলাম। আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানানো হল। বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ ফিরে পেলাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সত্তরের দশকের প্রথম দিকে রাজ্যজুড়ে চা-বাগানের শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। দৈনিক ১৬৫ পয়সা মজুরি পেতেন শ্রমিকরা। বিমল সিংহের নেতৃত্বে ছাত্ররা সেই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানা ১৭ দিন ধর্মঘট করলেন চা-শ্রমিকরা। ততদিনে বিমল সিংহ এই চেতনায় সমৃদ্ধ হল—শোষণ নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যই লড়তে হবে। সামাজিক রূপান্তর না ঘটলে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সফল হবে না। সেজন্য ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক সবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব সময়ও বিমলের সান্নিধ্যে অনেকদিন কাটিয়েছি। কলকাতায় পড়ার সময়ই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য চর্চা নিয়েই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। বিমল সিংহ এমন এক গুণের অধিকারী ছিল যা খুব কম মানুষের মধ্যে থাকে। সাধারণ, গরিব, নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলতে পারত। তাদের দুঃখ-বেদনা নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারত। এক্ষেত্রে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। বিমল রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা জানত। তাদের জীবনধারা, সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করত আন্তরিকভাবে। সেজন্যই তাঁর প্রতিটি লেখায় মানুষের জন্য অকৃত্রিম দরদ ফুটে উঠেছে। বিমল প্রথম যখন দিল্লী গেল, সেখান থেকে আমাকে চিঠি লিখল, "দিল্লী দেখলাম, সমস্ত ভারতবর্ষের রক্ত এখানে এসে জমা

১৯৬৯ সালে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে বাঁ দিক থেকে আশুতোষ দে, বিমল সিংহ, বিভাস কান্তি কিলিকদার, গুরুদাস চৌধুরী।

হয়েছে।" জানিনা কেন তাঁর এই উপলব্ধি। হয়ত ত্রিপুরাকে পাশে রেখেই দিল্লীকে সে দেখেছে। দিল্লীর তুলনায় ত্রিপুরা কত পিছিয়ে আছে। উন্নয়নের এই বিস্তর ফারাক তাঁর মনকে হয়ত ব্যথিত করেছিল। এই কথাগুলি হয়ত তাঁর এই উপলব্ধির অভিব্যক্তি।

১৯৭৭ সাল। বিমল প্রথমবারের মত কমলপুর থেকে ত্রিপুরার বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। আমি তখন কমলপুরে শিক্ষকতা করি। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই বিমল আমার কোয়ার্টারে চলে আসত। দেশের রাজ্যের নানা সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। ইংরেজদের মত ইংরেজি বলতে সে ভালবাসত। আমি তাঁকে সঙ্গ দিতাম। মাঝে মাঝে দেশের সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে ইংরেজিতে বিতর্ক হত। কিছু কিছু টেপ রেকর্ডারে টেপ করে রেখেছিলাম। ক্যাসেটগুলো আজও আমার কাছে আছে। কিন্তু অনেক পুরানো হয়ে গেছে। এখন আর বাজবে কিনা জানিনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্ত করে পুনরায় কমলপুরে ফিরে এসেছি। বিমল আমাকে উৎসাহিত করল ত্রিপুরার উপজাতিদের নিয়ে গবেষণা করার জন্য। বিশেষ করে ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রথাগত আইন, আচার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার বিভিন্ন নির্দেশিকা তাঁর কাছ থেকে পেলাম। বেশ কয়েক বছর এই নিয়ে গবেষণা করার পর কাজটি শেষ হল। ঐ সময়ে নানাভাবে বিমল আমাকে সহায়তা করেছে। একদিন পুরো থিসিস্টা বিমলকে দেখালাম। খুব খুশি হল সে। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের উপর কাজ করার জন্য বিমল এবার আমায় অনুরোধ জানালো। সমস্ত তথ্য সেই আমায সরবরাহ করবে। তাঁকে কথা দিয়েছিলাম কাজটা আমি করব। কিন্তু কথা রাখতে পারিনি। তথ্য সরবরাহ করার আগেই ঘাতকরা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ অবদান রেখে গেছে বিমল সিংহ। তাঁর লেখা অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'আলোব ঠিকানা', 'মনাইহাম', 'লংতরাই', 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা' ইত্যাদি পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মাটির মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী নিয়ে লেখা তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ। 'লংতরাই' নিয়ে যে চলচ্চিত্র হয়েছে তা দর্শকদের অভিভূত করেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী সম্প্রদায়ের ভাষার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছে বিমল সিংহ। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় তার সম্পাদিত 'পৌরেই' এবং 'ববেইর য়ারী' (লোককথা) বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিমল নিজে গান করতে পারত না, অন্তত আমি কোনদিন শুনিনি। তবে গান শুনতে সে ভীষণ ভালবাসত। মনে পড়ে কোলকাতা পড়ার সময় 'ত্রিপুরা ছাত্রাবাস'-এ শুধু গান শুনে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিত। ঐ সময়ে ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে আর একটি ছেলে থাকত। তার নাম মনে নেই। ভারী সুন্দর আধুনিক গান করত। একদিন ছুটির দিনে আমিও ছিলাম বিমলের সঙ্গে ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে। ঐ ছেলেটিকে ডেকে গান শুনতে বসল বিমল। ছেলেটি মনের আনন্দে গান গেয়ে চলেছে। একটার পর একটা। বিমল তন্ময় হয়ে শুনছে সে গান। দিন গড়িয়ে কখন রাত হয়ে গেছে কারো খেয়াল নেই।

বিমল সিংহ এ রাজ্যের এক কৃতী সন্তান। বেঁচে থাকলে দেশের জন্য, মানুষের জন্য আরও বহুদিন কাজ করতে পারত। ছাত্রনেতা, রাজনীতিবিদ এবং প্রশাসক হিসাবে তাঁকে দেখেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের ছাপ রেখে গেছে। তাঁর অবদান কোনদিন ভোলা যাবে না। নরঘাতকরা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে । কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর স্মৃতিকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। যা সবার মনে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। বিমল সিংহ আজ আর শুধু একটি ব্যক্তি নয়। সে একটি আদর্শ। সে একটি প্রতিষ্ঠান। যে আদর্শের জন্য বিমল সিংহ আজীবন সংগ্রাম করে গেছে— তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়বদ্ধতা আমাদের সবার, বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের।

আমার স্মৃতিতে বিমল

ড. বেণীমাধব মজুমদার

আমার মনে পড়ছে, আমার গবেষণাকর্মের সুপারভাইজার এ দেশের সমকালের বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান এবং পরবর্তীকালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ (অবসরপ্রাপ্ত) ডঃ অমল কুমার মুখোপাধ্যায় বেশ কিছুকাল পূর্বে কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে গোটা শিক্ষকতাজীবনে যদি অন্তত ১০ জন ছাত্রের মত ছাত্র পাই তবে আমার শিক্ষক জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমি হিসেব করে দেখেছি, এ পর্যন্ত ঐ সংখ্যক 'ছাত্রের মত ছাত্র' আমি পাইনি। যে ক'জন পেয়েছি তার মধ্যে যে দু'তিনজনের কথা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে তার মধ্যে বিমল সিংহ অবশ্যই অন্যতম প্রধান।

বিমলকে আমি প্রথম দেখি ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে (কৈলাসহর) ছাত্রনিবাসে। তার সপ্তাহ খানেক আগে ঐ কলেজে অধ্যাপনার চাকুরীর 'অফার' পেয়ে আমি ঐ কলেজের তৎকালীন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী অজিত ভট্টাচার্যের (তখনকার এ ডি এম) সঙ্গে দেখা করে ওঁকে আমার পারিবারিক কিছু অসুবিধের কথা বলে 'জয়েন' করার ক্ষেত্রে আরও মাসখানেক সময় দিতে অনুরোধ জানাই। তখন তিনি আমাকে জিগ্যেস করেন বিমল সিংহকে চিনি কিনা। আমি ইতিবাচক উত্তর দিতেই উনি বলেন, "কতটুকু চেনেন ওকে?" উত্তরে .... আমি বলি, "কৈলাসহর কলেজের ছাত্রসংসদের সম্পাদক ও ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতা হিসেবে ওর কথা শুনেছি।" শুনে উনি বললেন, "আপনার সবটা জানা হয়নি ওর সম্বন্ধে। আমার কাছে শুনুন। গত সপ্তাহে আমার চেম্বারে এসে আমাকে স্পষ্টভাবে বলে গেছে যে যদি এক সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কলেজে 'জয়েন' না করেন তাহলে ও কলেজে তালা ঝুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।" এরপর শ্রী ভট্টাচার্য আমাকে বললেন, "তাই বলছি, আপনি যদি তাড়াতাড়ি গিয়ে জয়েন না করেন, তাহলে ও ঠিকঠিকই কলেজে তালা ঝুলিয়ে দেবে; কারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ওর রয়েছে প্রায় একচ্ছত্র প্রভাব। কাজেই আমি চাই, ২/৪ দিনের মধ্যেই আপনি কলেজে জয়েন করুন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ঐ কলেজে তখন প্রি-ইউনিভার্সিটি, বি এ পাস ও অনার্স কোর্স চালু থাকা সত্ত্বেও তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন মাত্র একজন — শ্রীসুচিন্ত্য ভট্টাচার্য (বর্তমানে এম বি বি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রীডার)।

কলেজে আমার প্রথম ক্লাশটি ছিল ২য় বর্ষের অনার্সের ক্লাশ। মনে আছে, রোলকলের পরবর্তী ক্লাশের পুরো সময়টা বিমল আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করেছে, আর আমি উত্তর দিয়ে গেছি। প্রশ্নগুলো ছিল সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, এদেশে তার প্রাসঙ্গিকতা এবং তার রণনীতি ও রণকৌশল প্রসঙ্গে। ক্লাশ শেষ হবার কিছুক্ষণ পর টীচার্স কমন রুমে গিয়ে ও আমাকে বললো, "স্যার, আমার সব প্রশ্নের উত্তরই আমি পেয়েছি। তবে আর একটু খোলাখুলি আলোচনা আশা করেছিলাম।" উত্তরে ওকে বলেছিলাম, "দ্যাখো বিমল, ক্লাশরুমে এ সব প্রশ্নের এর চেয়ে খোলামেলা উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তুমি আরও বিস্তারিত আলোচনা চাইলে পরে আমার মেসে যেও।" এরপর থেকে ও মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নানা সামাজিক,

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে যেতো। আমিও সাধ্যমত ওর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতাম। কোন উত্তরে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে যাওয়ার সময় বলে যেতো ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য আবার আসবে এবং আসতোও।

১৯৭০ সালে কৈলাসহরের চা-বাগানে শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। বিমলের নেতৃত্বে বেশ কিছু ছাত্র ঐ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে যায়। তাই শ্রমিক নেতাদের সাথে তাদেরও অ্যারেস্ট করে জেলে পোরা হয়। এর ফলে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের টীচার্স কাউন্সিলের এক জরুরী সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী মহেশচন্দ্র পালের (প্রয়াত) নেতৃত্বে তৎকালীন মহকুমা শাসক শ্রী আর এস চক্রবর্তীর কাছে ডেপুটেশন দিই এবং কলেজের ছাত্র অসন্তোষের কথা বলে বিমল ও অন্যান্য ছাত্রনেতাদের মুক্ত করে দেবার জন্য ওঁকে অনুরোধ করি। উনি আমাদের প্রশ্ন করেন, "কলেজের জি এস এবং ছাত্র ইউনিয়নের অন্যান্য কর্মকর্তাদের তো কলেজের পড়াশোনা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাদি নিয়ে কাজ করার কথা; ওরা চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে যোগ দিতে গেল কেন?" আমাদের পক্ষ থেকে ওঁকে বলা হলো ছাত্ররাই তো দেশের ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই তারা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে সংহতি জানালে অন্যায়টা কোথায়?" আমরা আরও বলি "আমাদের ধারণা, ওরা নিশ্চয়ই কোন আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করেনি।" মহকুমা শাসক আমাদের যুক্তি মেনে নেন এবং বিমলদের মুক্ত করে দেন।

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যখন জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে ঘাঁটি করে 'খান সেনা' ও রাজাকার'দের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা, সেইসময় সিলেট সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের নামী নেতা রাজাসাহেবকে নিয়ে বিমল আমার বাসায় কয়েকবার আসে এবং মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, সাফল্য ও ব্যর্থতার দিক নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ঐ সময় কৈলাসহরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে বিমলের উদ্যোগে গঠিত ছাত্রযুবকদের কমিটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। একদিন সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মুখে ও ছলছল চোখে বিমল আমায় বাড়ী এসে বলে, "স্যার, রাজাসাহেব আর নেই। সিলেট ফ্রন্টে খানসেনাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই চালাতে গিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।" শুনে আমি শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ি। বিমলকে সান্ত্বনা দেই সাধ্যমত, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম যে রাজাসাহেব ওর মনের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন এরই মধ্যে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিমল ঢাকা চলে যায় ওখানকার বিজয়োৎসব চাক্ষুষ দেখার জন্য। ওখান থেকে ফিরে এসে ও আমার সঙ্গে দেখা করে এবং বলে যে ঢাকার অভিজাত হোটেল 'হোটেল শাহবান' ও 'হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল'-এ এ দেশের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে (অধিকাংশই মাড়োয়ারী) সে দেখে এসেছে হাজার হাজার টাকা খরচ করে 'ঘাপটি' মেরে বসে থাকতে। ও আশঙ্কা প্রকাশ করে যে ওদের উদ্দেশ্য সদাস্বাধীন বাংলাদেশের বাজার দখল করে ও দেশকে কলোনীতে পরিণত করা। ও আমাকে আরও বলে যে, "স্যার এর প্রতিকার করতে না পারলে শুরুতেই দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেবে।" সেদিন ওর দূরদৃষ্টি আমি প্রশংসা না করে পারিনি এবং ওকে বলেছি, বিভিন্ন লেভেলে তার ঐ আশঙ্কার কথা জানিয়ে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে। অল্প সময়ের মধ্যেই অবশ্য ঐসব অতিলোভী ব্যবসায়ীদের তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে বিমলের কিছু ইতিবাচক ভূমিকা ছিল।

খুব সম্ভব ১৯৭২ সালে বিমল এল এল বি পড়তে কলকাতা যায়। ল পাশ করে যখন ও কমলপুর বার এ ওকালতি করছে সে সময়ই একদিন কৈলাসহর আসে এবং আমার সাথে দেখা করে। ওকে হেসে জিগ্যেস করি, "বিমল, ওকালতিতে তোমার কেমন রোজগার হচ্ছে।" ও উত্তরে বলে, "স্যার গরীব মানুষের কাছ থেকে তো কিছু নেই না—সে রকম শিক্ষাই তো আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। যারা দিতে পারে তাদের কাছ থেকে পাঁচ-দশ টাকা করে যা পাই তাতে হাজারখানেক হয়ে যায় মাসে। আর আপনার আশীর্বাদে ডাল ভাতের তো সমস্যা নেই বাড়ীতে।" পরদিন ও ফিরে যায়। এর দিন দশেক পর পত্রিকায় দেখি, বিমলকে অ্যারেস্ট করে জেলে আটক রাখা হয়েছে। কারণ হলো—ওখানকার জনৈক বর্গাদার তার লোকজন নিয়ে যখন জমি থেকে পাকা ফসল তুলতে যায়, তখন ঐ জমির জোতদার তাদের বাধা দেয়। এ খবর পেয়ে বিমল কয়েকজন যুবকর্মী নিয়ে ওখানে গিয়ে বর্গাদারের পক্ষ নিয়ে ধান কাটায় অংশ নেয়। জোতদার আগে ভাগেই থানায় খবর দিয়ে রেখেছিল। পুলিস ঘটনাস্থলে গিয়ে বর্গাদারকে এবং বিমল ও তার সঙ্গীদের অ্যারেস্ট করে। এ নিয়ে পরে মামলা হয় এবং বর্গাদার, বিমল ও তার সঙ্গীরা মুক্তি পায়। জোতদার ও বর্গাদারের বিরোধেরও নিষ্পত্তি হয়। পববর্তীকালে বিমল আমাদের সঙ্গে দেখা কবলে আমি ওব ভূমিকার জন্য ওকে প্রশংসা করি এবং ওকে অভিনন্দন জানাই এজন্যে যে কর্মজীবনে উন্নতিলাভ করলেও ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আগের মতই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিমল কৈলাসহর কলেজ ছেড়ে যাবার পরও দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে আমি ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেছি। যে যে পূজোর ও গ্রীষ্মের ছুটিতে কৈলাসহর থেকে যেতাম সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ পেয়ে কৈলাসহরে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বহুবার গিয়েছি। বাঙালী, উপজাতি, মুসলমান, মণিপুবী অধ্যুষিত অঞ্চল নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রায়শঃই যে ধরনের প্রশ্ন পেয়েছি তা হলো "স্যার, বিমল সিংহ কৈলাসহর এলে এবং আপনার সাথে দেখা হলে ওকে আমাদের কথা বলবেন. আমাদের কাছে আসতে বলবেন। কতদিন ধরে ওকে দেখি না।" ওঁরা আরও বলেছেন, "স্যার, খরা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যেমন ওকে ও ওর সঙ্গীদের পাশে পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি অন্যান্য বিপদে আপদে। এর চেয়েও বড় কথা, আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও রক্ষার সংগ্রামেও তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে সবসময় আমাদের পাশে থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাত এবং সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে অংশ নিত।"

১৯৭৭ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়যুক্ত হয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাশীল হওয়ার কিছুকাল পর বিমল বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে আমার গবেষণার কাজের জন্য বিধানসভার পূর্ববর্তী ধারাবিবরণী (প্রসিডিংস্) এবং অন্যান্য 'ডকুমেন্ট' ও কিছু 'রেফারেন্স' বই-এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিধায়ক বা বিধানসভার অফিসার ও কর্মচারীরা ছাড়া অন্য কারো কাছে ওসব পুস্তকাদি 'ইস্যু' করার নিয়ম নেই। সেই সময় বিমল ও আমার অপর পরম স্নেহভাজন ছাত্র তপন (শ্রী তপন চক্রবর্তী

— তখন বিধাযক, বর্তমানে ত্রিপুবা বাজ্য যোজনা পর্ষদেব ডেপুটি চেযাবম্যান) বিধানসভা থেকে ঐসব প্রযোজনীয দলিল পুস্তকাদি নিজেদেব নামে ইস্যু কবে আমাব পাওযাব ব্যবস্থা কবে দিযে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছে। পববর্তী কালে আমাব পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভেব পব গবেষণাপত্রটি যখন পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয তখন ঐ পুস্তকেব 'মুখবন্ধে' ওদেব দু'জনেব কাছে আমি আমাব গভীব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবেছি।

১৯৮৩ সালেব নিবাচনে জযলাভ কবে বামফ্রন্ট দ্বিতীযবাবেব মত ক্ষমতা লাভ কবাব পব বিমল আবাব বাজ্য বিধানসভাব উপাধ্যক্ষ নিবাচিত হয। এব কিছুকাল পবে কৈলাসহব কলেজেব এক নবীন ববণ অনুষ্ঠানে ওকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয। অনুষ্ঠান শুরুব অল্প কিছুক্ষণ আগে ও আগবতলা থেকে এসে পৌছায। নির্দিষ্ট সমযে অনুষ্ঠান শুরু হযে যায। আমাব যেতে পাঁচ মিনিটেব মত দেবী হযে যায। আমি হলে ঢুকে দেখি মঞ্চে তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রী প্রসন্ন কুমাব সিংহ (নব্বুই এব দশকেব প্রথমার্ধে এক ভযাবহ মোটব দুর্ঘটনায যাঁব মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে) সভা পতিব আসনে এবং বিমল প্রধান অতিথিব আসনে উপবিষ্ট। আমি হলে ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গে বিমল চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়িযে আমাকে কবজোড়ে প্রণাম জানায এবং আমি অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদেব জন্য নির্দিষ্ট আসনে গিযে না বসা পর্যন্ত দাঁড়িযে থাকে। আমি বসাব পবই ও আসন গ্রহণ কবে। এই বিবল ঘটনা আমাকে তখন অতীত ভাবতেব ছাত্রদেব শিক্ষকেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেব সুমহান অতীত ঐতিহ্যেব কথাই স্মবণ কবিযে দেয।

১৯৮৭ সালে মে মাসে আমি আগবতলাব বামঠাকুব কলেজে বদলী হযে আসাব পব থেকে ওব সাথে আমাব যোগাযোগেব সুযোগ আবাব এসে যায। পববর্তী সমযে বিধানসভা নির্বাচনেব পব বাজ্যে কংগ্রেস (আই) টি ইউ জে এস-এব জোট সবকাব ক্ষমতাশীল হয। এব কিছুকাল পব 'ত্রিপুবা সিভিল লিবার্টিজ অ্যাসোসিযেশন' গড়ে তোলা হয এবং আমাব ওপব ঐ সমিতিব সাধাবণ সম্পাদকেব দাযিত্ব দেযা হয। তখন থেকে ওব সাথে আমাব সম্পর্ক আবও ঘনিষ্ঠতব হয়। মাঝে মধ্যেই ও এসে সমিতিব কাজেব ধবন, অগ্রগতি, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিযে আমাব সঙ্গে আলোচনা কবতো এবং বিভিন্ন বিষযে ওব সুচিন্তিত মন্তব্য বাখতো। ওব ঐ আগ্রহ ও পবামর্শ আমাকে খুবই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত কবেছিল।

১৯৯৩ সালে বামফ্রন্ট তৃতীযবাব ক্ষমতাশীল হওযাব পব বিমল বিধানসভাব স্পিকাব নির্বাচিত হয। ঐ সমযও আমাদেব দু'জনেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায ছিল। আমি যেমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে (কখনোই ব্যক্তিগত নয) ওব কাছে গেছি, তেমনি ও বিভিন্ন সমযে আমার কাছে এসেছে। ওখানকাব একটি অভিজ্ঞতাব বিষয উল্লেখ কবছি। সেদিন ও আমাকে ওব অফিসে যেতে অনুবোধ জানিযে ফোন কবে। তদনুযাযী আমাব কলেজেব ক্লাশ শেষ হওযাব পব আমি ওব চেম্বাবেব সামনে গিযে দেখি, ও বিধানসভাব ক'জন অফিসাবকে নিযে মিটিং কবছে। আমাকে দেখেই ও দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে বললো, "স্যাব আসুন"। আমি বসে ওকে বললাম, "তোমাব মিটিং আগে শেষ কবো। আমি পবে আসবো।" সঙ্গে সঙ্গে ওব উত্তব, "সে কি কথা স্যাব। মিটিং পবে হবে। আপনাব সাথে কথা শেষ হোক।" এবপব ও অফিসাবদেব আমাব সাথে পবিচয় কবিয়ে দিযে ওঁদেব বললো যে মিটিং এক ঘণ্টা পবে হবে। ঘটনাটি খুবই ছোট্ট কিন্তু শিক্ষকেব প্রতি আমাব ছাত্রেব এই 'পক্ষপাতিত্ব' আমাকে গভীবভাবে পুলকিত ও তৃপ্ত কবেছিল।

পরবর্তীকালে ওকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয় এবং অতীতে ডেপুটি স্পিকার ও স্পিকার হিসেবে যেমন সুনাম ও যোগ্যতার সাথে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে, মন্ত্রী হিসেবেও তেমনি যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে তার কর্তব্য পালন করতে থাকে। এই পর্যায়ের দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করেই বিমল সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ শেষ করবো। প্রথম ঘটনা গত বছরের মাঝামাঝি সময়ের। একদিন আমার পাড়ার এক ভদ্রলোক ও ওঁর স্ত্রী আমার বাড়ী এসে আমাকে অনুরোধ করেন ওঁদের সাথে বিমলের অফিসে গিয়ে ওঁর ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য সরকারি তরফ থেকে অর্থ সাহায্যের জন্য ওদের হয়ে বিমলকে অনুরোধ জানাতে। আমি ওর ক্রনিক হার্ট প্রব্লেমের বিষয় জানতাম, আর এও জানতাম যে ওঁকে ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য বিড়লা হার্ট ইনস্টিটিউটে রেফার করা হয়েছে। তাই ওঁদের বললাম যে ওরা নিজেরা গেলেই হবে, আমি বরং ওকে ফোন করে দেবো। কিন্তু ওঁরা কিছুতেই আমাকে ছাড়তে রাজি না হওয়ায় আমাকে যেতে হলো। অনেক দর্শনার্থী ছিল সেদিন, কিন্তু আমার নামের 'শ্লিপ' পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ও আমাদের ভেতরে নিয়ে যেতে বললো। গোটা বিষয়টি ওকে জানানোর পর ও' বললো, "স্যার, এই সামান্য বিষয় নিয়ে কি আপনাকে আসতে হয়? ফোন করে দিলেই তো পারতেন?" আমি তখন ওকে বলি যে ওঁদের পীড়াপীড়ির জন্যই আমার আসতে হয়েছে। বিমল তখন ভদ্রলোককে দরখাস্ত ও 'ইনকাম সার্টিফিকেট' দিতে বললে উনি ওগুলো ওর সামনে রাখলেন এবং বিমল দরখাস্তের গায়েই নির্দেশ দিলোঃ ভদ্রলোক ও ওঁর স্ত্রীর কলকাতা আসা-যাওয়ার প্লেনের টিকিটের টাকা, হাতখরচ বাবদ তিন হাজার টাকা দিয়ে দিতে এবং বিড়লা হার্ট ইন্স্টিটিউটকে এই মর্মে চিঠি দিতে ঐ রোগীর ওপেন হার্ট সার্জারি এবং অপারেশন পরবর্তী চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে। এরপর ও তার গাড়ীর ড্রাইভারকে ডাকিয়ে নির্দেশ দেয় আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিতে। এর দিন তিনেক পর আমার বাড়ী এসে ও আমার কাছে জানতে চায়, ঐ ভদ্রলোক কলকাতা চলে গিয়েছেন কিনা। উনি তখন আমার ভেতরের ঘরে বসা। ওঁকে ডাকতেই উনি এসে জানান যে, টিকিট না পাওয়ার জন্য যেতে পারছেন না। বিমল তখন ওকে বললো, "টিকিট না পেলে আপনি স্যারকে বা আমাকে বলতে পারতেন। আর দেরি করবেন না। ২/১ দিনের মধ্যে রওনা হয়ে যান।" উনি চলে যাওয়ার পর বিমল আমাকে বললো সে স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে আলোচনা করে জানতে পেরেছে যে, 'কেস'টি সিরিয়াস ধরনের। তাই অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা দরকার। একজন সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ব্যাপারে ওর ঐ ঐকান্তিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেদিন ওর পায়ে ছিল হাওয়াই চপ্পল। ও চলে যাওয়ার পর আমার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, "তোমার ছাত্র ঠিক আগের মতই সাদাসিধে রয়েছে।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি মাস দুয়েক পরের। আগের দিন অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ করে রাত দুটোয় ঘুমুতে যাই। ফলে সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠি। একটু পরেই আমাদের পাড়ার ডেন্টাল সার্জন ডাঃ দত্তচৌধুরী আমার বাড়ী আসেন এবং আমাকে বলেন যে তাঁকে উত্তর ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল ছামনুতে বদলী করা হয়েছে। ডাক্তারবাবু আমাকে আরো বলেন, "স্যার, আমার পরিবারের সব কিছুই তো জানেন। বছর দেড়েক হলো বাবা মারা গেছেন। মাও খুব অসুস্থ। আমারও বছর খানেক আগে গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের পর ৩/৪ মাস পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয়। আমার বিনীত অনুরোধ, আমার জন্য দয়া করে কিছু করুন।

নইলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবো।" তখনই বিমলকে ফোন করি। সব শুনে ও বললো যে তার আগের দিনই ও অর্ডারে সই করেছে। আমি আগে বললে কিছু করতে পারতো। ঐ stage-এতো করার কিছু নেই।

ডাক্তারবাবু সব শুনে আমাকে বললেন, "স্যার, বিশালগড়ের (সদরের পার্শ্ববর্তী মহকুমা হেডকোয়ার্টার) হাসপাতালে একটি ভেকেন্সি আছে। স্যারকে এ বিষয়ে অনুরোধ করে দেখুন দয়া করে।" তখন বিমলকে এ বিষয়টি জানাতেই ও বললো যে, যদি তা হয় তাহলে সে অবশ্যই দেখবে। সেদিন সন্ধ্যে ছ'টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফিরে সবে জুতো খুলেছি, এমন সময় বিমলের ফোন এলো। ও বললো, "স্যার, ডাঃ দত্তচৌধুরীকে বিশালগড় হাসপাতালেই দিলাম।" শুনে আমি বললাম, "বিমল, তুমি আজ যা করলে তার জন্য এ পরিবারটি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। আর আমি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।" উত্তরে ও বললো, "স্যার, বুঝলাম যে ডাক্তারবাবুর পরিবার আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারেন। কিন্তু আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কেন?" আমি তখন বলেছিলাম, "তুমি এমন একটা ভাল কাজ করলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো না?" উত্তরে ও বললো, "স্যার, আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি তার ঋণ যে কোনদিন আমি শোধ করতে পারব না এ সত্য আমার চাইতে আর বেশী কে জানে বলুন?" শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি এবং বলি, "বিমল, আজ তুমি আমাকে যে গুরুদক্ষিণা দিলে তা আমি আজীবন মনে রাখব। আশীর্বাদ করি, তুমি আরও বড় হও।'

এর পরবর্তী ঘটনাবলী হৃদয়বিদারক। ২৮ মার্চ, ১৯৯৮। সেদিন সকালে বিমল আমার কাছে ফোন করে জানতে চায়, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে তা আমি জানি কিনা। আমি নেতিবাচক উত্তর দিয়ে জানতে চাই," কেমন আছ বিমল?" উত্তরে ও বলেছিলো, "স্যার, আমি আর আমার মধ্যে নেই। ভাইটিকে আজও মুক্ত করে আনতে পারলাম না।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ঐ ভাই যে ওর বাবা-মায়ের পালিত পুত্র একথা ও আমাকে কোনদিন বলেনি। এত বড় মহৎ মনের অধিকারী ছিল ও। আমি ওকে তখন বলেছিলাম, "বিমল, এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করো না। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে বেশি বলার দরকার নেই। যেভাবে রঞ্জিতবাবু (ঘোষ) কে [কমলপুর বিভাগের সি পি আই (এম)-এর সম্পাদক] সংগঠিতভাবে নিরাপত্তাবাহিনী নিয়ে মুক্ত করে এনেছিলে সেভাবেই এগোতে হবে।" ও তখন আমাকে বললো, "হ্যা স্যার, সেভাবেই এগোবো।" কিন্তু তা আর হলো না। সিংহের মত সাহসী, মানুষের প্রতি বিশ্বাসে অবিচল, যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী আমার বিমল আবেগ - যুক্তির ওপর স্থান দিতে গিয়ে কতিপয় ঘৃণ্য নরপশুর চক্রান্তের বলি হলো। ৩১ মার্চ বেলা ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরদিন অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে (যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনায় অংশগ্রহণের কথা ছিল) কমিটির কনভেনর হিসেবে মিটিং পরিচালনা করছি, ঠিক সেই সময় ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সম্পাদক অর্জুন দেবনাথ ছুটে এসে আমাকে হিংস্র আততায়ীর হাতে বিমল ও বিক্রম (বিমলের ছোট ভাই)-এর মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদ জানাল। এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনেই টেবিলের ওপর মাথা রেখে আমি অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তক্ষুনি জমায়েত করে শোকসভার ব্যবস্থা করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মহাদেব চক্রবর্তী (ইতিহাস বিভাগ) এবং প্রফেসর সিরাজুদ্দীন আমেদ (বাংলা বিভাগ)। ঐ সময় আমার জনৈক সহকর্মী আমার ঘরে

এসে আমাকে বলে যে ছাত্র-ছাত্রীরা চায় আমি কিছু বলি। ওদের অনুরোধে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে মিনিট পাঁচেক সময় ওর স্মৃতিচারণ করি। এরপর বের হয় ছাত্র-ছাত্রীদের ধিক্কার মিছিল। ঐ মিছিলে আমরা ক'জন শিক্ষক-শিক্ষিকাও সামিল হই।

বিমলের এই মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যু আমাকে মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল যে পরবর্তী কয়েকটি দিন আমাকে গভীর শারীরিক ও মানসিক অবসাদের মধ্যে কাটাতে হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমার আত্মীয়স্বজন ও শুভার্থীরা আমাকে ফোন করে যেভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন অন্য কেউ তা শুনলে মনে করতো যে আমার বুঝি ভ্রাতৃবিয়োগ ঘটেছে। সত্যিই তো তাই। আজ থেকে ছ'বছর আগে আমার ছোটভাই রবি এক আকস্মিক ও মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় নেয়। বিমলের মৃত্যুর পর আমি দ্বিতীয়বারের মত ভ্রাতৃহারা হলাম। কিছুদিন আগে কমলপুর কলেজের পার্মানেন্ট অ্যাফিলিয়েশন-এর জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পরিদর্শক কমিটি পাঠানো হয় তার অন্যতম সদস্য হিসেবে ওখানে গিয়ে জানতে পারি যে কলেজের জন্য ৩৬ একর জমির দখল নিতে গিয়ে বিমলকে আইনজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এছাড়া আমরা জানতে পারি যে এতদিন ধরে শিক্ষা দপ্তর থেকে অর্থানুকূল্য না পেলেও বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বেসরকারী উৎস থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কলেজের নিজস্ব বিল্ডিং গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ওর বিশেষ ভূমিকা ছিল। কমলপুরের সরকারী হাসপাতালের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ওর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথাও শহরের বিশিষ্ট নাগবিকগণ আমাদের জানান। সেদিন সন্ধ্যার কিছুপর আমি বিমলের বাড়ী যাই। কিছুক্ষণ পর ওর স্ত্রী, বর্তমান বিধায়িকা বিজয়লক্ষ্মী সিংহ বাড়ী পৌঁছে এবং আমাকে প্রণাম করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওকে পাশে বসিয়ে বলি, "তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। ওর এই অকাল ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমিও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।" কিছুক্ষণ পর ও শান্ত হয়। তখন শুরু হয় অন্যান্য কথাবার্তা। সেখানে কিছুসংখ্যক ছাত্র ও অন্যান্য এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে ও একসময় বলে, "আপনারা তো সবাই ছাত্র। কিন্তু স্যারের ছাত্র যে স্যারের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতো তা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি।" এ বিষয়টি নিয়ে আমি পরবর্তীকালে অনেক ভেবেছি এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে শুরুতে আমাদের দু'জনের শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা পর্যবসিত হয়েছিল 'Learning from each other' অর্থাৎ 'পরস্পর থেকে শেখা'র সম্পর্কে এবং খুব সম্ভব আমার প্রতি ওর এতটা শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মূল কারণ নিহিত ছিল এর মধ্যেই। যতই দিন গেছে ততই আমাদের দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

মার্কস, লেলিন, চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রোর, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিমল সিংহ চলে গেছে, কিন্তু ত্রিপুরাসহ গোটা ভারতের ছাত্র-যুবসম্প্রদায় ও শ্রমজীবী মানুষের সামনে সে রেখে গেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবতাবাদ এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর ও ধারাবাহিক সংগ্রামের আদর্শকে। আর এর মধ্য দিয়েই যারা দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে তাদের মধ্যে সে বেঁচে থাকবে— চিরজীবী হয়ে থাকবে।

—বিমল সিংহ স্মৃতি তর্পণ ১, ১৯৯৯, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ

বিমল সিংহ — এ নেভার ফেইলিং ফ্রেন্ড

গুরুদাস চৌধুরী

শিরোনামে যে কথাগুলো ব্যবহার করছি — তা ছিল বিমলের সব চিঠির ইতির বর্ণমালা। এ আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতি। রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিমল সিংহ ছিল এ পাহাড়ি রাজ্যের বনফুল। বর্ণে গন্ধে আপন মহিমায় যার জুড়ি মেলা ভার। একেবারে সাদাসিধে মাটির মানুষ তা নিয়েই এ লেখা। অধ্যাপক গুরুদাস চৌধুরী নয়, বন্ধুপ্রতিম গুরুদাসের বিনম্র প্রয়াস। স্রেফ আলাপচারিতার ঢং-এ। সাদা-কালো স্কেচ। যাতে ধরা পড়েছে ধলাই পাড়ের বিমল।

উন্নত শির এক আপোষহীন যোদ্ধা। এক নির্মম চক্রান্ত সেদিন আমাদের কাঙাল করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সৃজনশীল মানুষটিকে। নিছক রাজনৈতিক নিরীখে এ লেখার অবতারণা নয়। তবে হ্যাঁ, বিমল সিংহের বিষাদময় মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন দশকের ত্রিপুরার রাজনৈতিক জগতের উত্থান পতনে বিমল সিংহের নিরলস ও বলিষ্ঠ পদচারণা সর্বজন স্বীকৃত। ষাটের দশকের শেষ লগ্নে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় বিমল সিংহের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহপাঠী ও সহযোদ্ধা হিসেবে তাকে ঐ দিনগুলিতে যেমন দেখেছি, জেনেছি — সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির দিনলিপির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস এই রচনা। ১৯৬৭ সালে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে বি এ ক্লাসের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলাম। মহাবিদ্যালয়ের তখন দীন পরিবেশ। এম বি বি কলেজে পাকা বাড়ী, কিন্তু আমাদের ক্লাস করতে হতো বাঁশের বেড়া, ছনের চালের ছাউনীর তলদেশে। পাশের ক্লাসের অধ্যাপকদের উচ্চস্বরে বক্তৃতা আমাদের কর্ণগোচরে প্রবেশ করে মনযোগে বিভ্রম ঘটাতো। প্রথম বর্ষেই বিমল অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। তার বাচনভঙ্গি, ক্লাসে আলোচনায় অংশগ্রহণ, অধ্যাপকের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ে মত বিনিময়, ইংরেজী বলার কায়দা, উচ্চারণ সবকিছুই ছিল দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

কলেজ জীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তার শৈশব ও স্কুল জীবনের দু'চার কথা পাঠকের নজরে আনয়ন করা প্রয়োজনীয়। বিমল সিংহের পিতার নাম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ ও ঠাকুরদার নাম ঘন সিংহ। ঘন সিংহ একবার কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে ত্রিপুরার টেরিটোরিয়্যাল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিমল সিংহের চরিত্রের অনেক গুণাবলী — অসীম সাহস, দৃঢ়তা ও অন্তরঙ্গ স্বহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গি তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত। পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ কিছুদিন বিমানবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর ঠিকেদারী ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। বিমল সিংহ তার জীবনব্যাপী অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও যে কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানিয়ে চল[illegible] মতা অর্জন করেছিল। এসকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার শৈশব ও যৌবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। শৈশব ও কৈশোর অবস্থায় বিমল সিংহের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। কৈশোর অবস্থায় সঙ্গী-সাথীসহ নিকটবর্তী পাহাড়ে অনেক সময় কাষ্ঠ সংগ্রহে অভিযান করতো। পাহাড়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় এভাবেই ঘটে। পরবর্তী জীবনে ও তার সাহিত্য রচনায় সবুজ পাহাড় বনানীর বর্ণনা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। বিমল সিংহের কৈশোরের স্কুল জীবনের সহপাঠীদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বিমল স্কুল

জীবনে তথা ছাত্রাবস্থায় সহপাঠীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় অভ্যস্ত ছিল এবং গুরুজনদের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শনে কার্পণ্য করতো না। বিমল যখন কমলপুর হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন নাকি মাঝে মধ্যে একটি টেপ রেকর্ডার নিয়ে খোলা মাঠে চলে যেত এবং সেখানে উচ্চস্বরে বক্তৃতা দিয়ে টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করে নিয়ে আসতো। সে সময় মাঠে তার সঙ্গী পার্শ্ববর্তী বাড়ীর শশীকান্ত সিংহকে উদ্দেশ্য করে বলাবলি করতো 'এরকম না বললে মানুষের সম্মুখে বক্তব্য কিভাবে উপস্থাপন করব।' কমলপুরে স্কুল জীবন বিমলের এভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল। বিমল সিংহের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষা লাভ এবং ছাত্র আন্দোলনে দীক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে। নেপোলিয়ন-এর মতে 'উপযুক্ত সময় ও সুযোগ ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রতিভা বা যোগ্যতা অর্থহীন, তুচ্ছ বিবেচিত হয়ে থাকে।' বিগত শতাব্দীর ষাটেব দশক ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ত্রিপুরার এক অতি ক্ষুদ্র জনপদ কৈলাসহর মহকুমায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেব স্বেচ্ছাচাবী, ছাত্র শিক্ষক বিরোধী কার্যকলাপ এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৮ সালে কলেজে এক নতুন পবিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আমরা বি এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ঐ বছর গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ দু'জন অধ্যাপককে এবং একজন ডেমোনস্ট্রেটবকে গভর্নিং বডির অনুমোদন নিয়ে বরখাস্ত করেন। ভাল ভাল অধ্যাপকদের গ্রীষ্মেব ছুটিব অবকাশে এভাবে বরখাস্ত কবে তাদের বাড়ীতে ছাঁটাই নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আমরা একদল ছাত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম। প্রতিবাদী ছাত্রদের প্রথম সারিতে বিমল স্থান কবে নিল। এভাবে ১৯৬৮ সালের অধ্যাপক ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলো প্রতিবাদী বিমলের। মহাবিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র তখন এক নতুন পথের দিশারী। তাদের তখন যৌবনেব বাঁধ ভাঙ্গা আবেগ। যৌবনের মৃত্যু মানে জীবনের মৃত্যু। ষাটের দশকে যৌবন বর্তমান সময়ের সমান্তবাল স্রোতে ভেসে আসেনি। যা হোক ১৯৬৮ সালের ৩০শে জুলাই আমবা তৎকালীন অধ্যক্ষকে ঘেরাও করলাম অধ্যাপকদের পুনর্বহালেব দাবীতে।

বিমল সিংহের স্মৃতি বিজড়িত কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের শোক শ্রদ্ধা
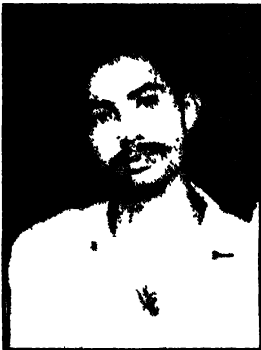
বিমল সিংহের কলেজ জীবনের বহু স্মৃতি বিজড়িত রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে গত ২ এপ্রিল ১৯৯৮ শহীদ বিমল সিংহ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যক্ষ অজিত ভট্টাচার্য ছিলেন সভাপতি। সভায় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কামিনী কুমার নাথ, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ গুরুদাস চৌধুরী, ছাত্র সংসদের ডি.পি আবুল মান্নান, এ.জি.এস প্রভাকর সিনহা ও সুবি দেববর্মা প্রমুখ ভাষণ দেন। সভায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, অশিক্ষক কর্মচারী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে পর পর দু'বছর এই কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বিমল সিংহ।

বিমল ঘেরাও আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে স্থান করে নিয়েছিল। অতঃপর অধ্যক্ষের অপসারণের দাবীতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল যখন ১৯৬৮ সালের ২৭শে আগষ্ট দুপুর ১২টা থেকে কলেজের ছাত্ররা আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিল দু'জন অধ্যাপকের পুনর্বহাল ও অধ্যক্ষের অপসারণের দাবীতে। বিমল অনশন ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। ১৪৪ ঘণ্টা অনশনের পর অনশন ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটে। ছাত্ররা জয়লাভ করেছিল। গভর্নিং বডি কর্তৃক অধ্যক্ষ অপসারিত হয়েছিলেন। অনশন ধর্মঘটে যোগদান করে বিমল জীবনপণ লড়াই করেছিল। এভাবে বিমল ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে এসেছিল। ঐ সময় থেকেই আমরা ও বিমল সিংহ কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদারের সংস্পর্শে আসতে শুরু করেছিলাম। ১৯৬৯ সালে কৈলাসহরে ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমরেড রসরঞ্জন বণিকের উদ্যোগে এই কমিটি গঠিত হয়। এবং পরবর্তী সময়ে ঐ বছরই বিমল সিংহ ও আমরা অন্যান্য কয়েকজন ঐ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। ঐ বছরেই আমার নিজস্ব ডায়েরী থেকে জ্ঞাত হলাম ১৯৬৯ সালের ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত কোন এক আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী বিমল পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার বরণ করে। ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে কলেজের ছাত্রদের এল আই জি স্টাইপেন্ড আদায়ের দাবীতে কৈলাসহর মহকুমা শাসকের নিকট এক গণডেপুটেশন সংগঠিত করা হয় এবং বিমল সিংহ ও গৌরমোহন সিংহ এই গণডেপুটেশনের নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। ১৯৬৯-৭০ শিক্ষাবর্ষে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থী হিসেবে বিমল সিংহ সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছিল। ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষেও বিমল সিংহ সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৬৯-৭০ শিক্ষাবর্ষ থেকেই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্তরের ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। দাবী ছিল রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করতে হবে। কৈলাসহর মহকুমা শাসক অফিসের বারান্দায় ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ণাতে বসে। কলেজ সরকারীকরণের দাবীতে। এই ধর্ণা থেকেই বিমল সিংহের নেতৃত্বে তৎকালীন ছাত্র নেতৃত্ব ত্রিপুরার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এ. এল. ডায়াসকে কালো পতাকা প্রদর্শন করেছিল।

এদিকে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মসূচি ও সংগঠন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পুরোদমে এগিয়ে চলে এবং এই প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রদ্ধেয় কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে ও পরবর্তী সময়ে আমরা অনেকেই সাম্যবাদী ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলাম। সেই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা ঃ আগরতলা পলিটেকনিক কলেজে একটি ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে সারা ত্রিপুরায় বন্ধ পালিত হয়। ফটিকরায় অঞ্চলে সেই বনধের বিরোধীতা করে বাজার হাট খোলা রাখার চেষ্টা হয়। তখন কৈলাসহর থেকে ট্রাকে চড়ে বিমল সিংহের নেতৃত্বে একদল ছাত্র ফটিকরায় অভিমুখে রওয়ানা হয়। ফটিকরায় বাজারে পৌছুলে হঠাৎ করে পেছন দিক থেকে ছাত্রদের উপর এক ঝটিকা আক্রমণ নেমে আসে এবং কৈলাসহর শ্রীরামপুর অঞ্চলের ছাত্র ফেডারেশন কর্মী বিশাল দেহধারী কমরেড অধীর চক্রবর্তীর পেছনে ছুরিকাঘাত করা হয়। অধীর চক্রবর্তী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অধীর চক্রবর্তীর নিজ বক্তব্যে জানা গেল সেদিন ঐ আক্রমণ তার উপর নেমে আসে তাকে বিমল সিংহ ভেবে। আক্রমণকারীরা তার পৃষ্ঠদেশে বল্লম দিয়ে সজোরে আঘাত করেছিল। অধীর চক্রবর্তীকে তৎক্ষণাৎ ফটিকরায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং পরবর্তী

দিন ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন ছাত্রনেতা কমরেড মানিক সরকার ফটিকরায় এসে অধীরকে দেখতে হাসপাতালে যান।

১৯৭০-সালের আগস্ট মাসে কৈলাসহর তথা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক চা-শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে ত্রিপুরার ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা এই প্রথম শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের ময়দানে সমবেত হয়েছিল। কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদার ও কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কৈলাসহরের শ্রমিক ছাত্র ও কৃষকদের এক জোটবদ্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বিমল সিংহ ও অন্যান্য ছাত্র, লেখক নিজে, গৌরমোহন সিংহ, সুব্রত চক্রবর্তী, আরও অনেকে দিন রাত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহস ও সহমর্মিতা প্রদান করেছিল। শ্রমিকদের সঙ্গে বিমল একান্ত আপনজনের মতো একাত্মতাবোধ অনুভব করতো। বিমল সিংহ প্রধানত কৈলাসহরের গোলকপুর চা-বাগানে উপস্থিত থেকে এই ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটে শ্রমিকদের উৎসাহ দিয়ে তাদের গৃহে অবস্থান করেছিল। হালাইছড়া চা বাগানের তৎকালীন শ্রমিক নেতা নন্দলাল, হীরাছড়া চা-বাগানের গকুল ও সুকোমল এবং মূর্তিছড়া চা-বাগানের শ্রমিক নেতা পবন চাষা — এরা ছিল বিমলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। এদের স্মৃতিতে বিমল আজও চির জাগ্রত। ১৯৭০ এর আগস্টের এই ধর্মঘটের পরবর্তীকালেও বিভিন্ন ঘটনায় প্রায়ই বিমল সিংহের ডাক আসতো। চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকের পাশে দাঁড়াবার জন্য। বিমল প্রতিটি আহ্বানেই সাড়া দিত এবং ঝাঁপিয়ে পড়তো।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ কেরালার ত্রিবান্দ্রমের টেগুর হলে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই সম্মেলন থেকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (S.F.I.) জন্মলাভ করেছিল। কৈলাসহর থেকে আমরা পাঁচজন প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম এবং বিমল সিংহ ওদের একজন। সমগ্র ত্রিপুরা থেকে মোট ৩৯ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। টেগুর হলের সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে বিমল সিংহ উদাত্ত কণ্ঠে ইংরেজীতে ভাষণ রেখেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম তখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে ও সাফল্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত। কৈলাসহরের রাজপথে তখন 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম'— এই স্লোগান বিমল সিংহ ও তার সহযোদ্ধাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। সুতরাং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এহেন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই বিমল সিংহের প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় বিমল সিংহের হাতে থাকতো চেগুয়েভারার বলিভিয়ার ডায়েরী, দুনিয়া কাঁপানো দশদিন, চীনের আকাশে লাল তারা-র মতো কতগুলি বই।

বিমল সিংহ ছিল অসীম সাহসী ও অন্যের বিপদে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা সম্পন্ন এক নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। এ পরিচয় তখন থেকেই আমরা পেয়েছিলাম। ত্রিবান্দ্রমে যাওয়ার পথে আসামের রঙ্গিয়া রেলস্টেশনের গাড়ি বদলের সময় আমার একটি বেডিং ট্রেনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বিমল চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠে মাঝ রাতে বেডিং কাঁধে রেল লাইন বরাবর হেঁটে ফিরে আসে। অন্যের বিপদকে নিজের বিপদ বলে গণ্য করার মনোবৃত্তি বিমলের আমৃত্যু ছিল। অন্যের বিপদে কখনো নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখিনি।

১৯৭১ সালে বিমল কৈলাসহরে বেশ কয়েকবার পুলিসের তাড়া খেয়েছিল এবং গ্রেপ্তারও হয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের সময় পুলিস মাঝরাতে আমাদের গ্রেপ্তার করার জন্য বাড়ী বাড়ী তল্লাশি চালায় ওয়ারেন্ট হাতে নিয়ে। আমি কোন মতে পুলিসকে ঠকিয়ে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলাম। পুলিস বাড়ী ত্যাগ করার পর গভীর রাতে দেখা গেল বিমল আরো কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আমার বাড়ীর উঠানে উপস্থিত। বন্ধুকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। যা হোক পরবর্তী সময়ে আমাদের ১৪ দিন হাজত বাস হয়। বিমল আমাদের সবাইকে জেলের ভেতর সাহস যোগাতো এবং সরস গল্প বলে আনন্দে মাতিয়ে রাখতো। বিমলের একটি সহজাত গুণ ছিল সে খুব ফুর্তিবাজ ও জীবন রসিক। জীবন তার কাছে কোন সময়ই বোঝা স্বরূপ ছিল না। ১৯৭০-৭১ সালে কৈলাসহর কলেজ থেকে বি এ পাশ করে আমরা ক'জন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়তে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু ১৯৭২ সালে আসামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার বীভৎস রূপ আমাদের সবাইকে হতাশ করে ফিরিয়ে দিল। আমরা সদলবলে গৌহাটি ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলাম। বিমল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে এম এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল এবং তখন থেকে কলকাতার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছিল। সেখানে বিমলের আরেক জীবন। বিমল আস্তানা নিল শিয়ালদার জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো-এর ভগ্ন বাড়ী ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে। সন্ধ্যার পর তার ঘরে দারুণ আড্ডা জমতো। তার সহপাঠী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারসহ ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরের ছাত্র যুবক এই আড্ডায় অংশগ্রহণ করতো। ছোট বড় ভেদাভেদ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও আইন এই দুটো বিভাগে বিমল ভর্তি হয়েছিল। সে কোনকালেই সিলেবাসের বিধিবদ্ধ পড়াশুনায় বেশী আগ্রহী বা মনোযোগী ছিল না। সিলেবাস বহির্ভূত বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের উপর পড়াশুনাতে তার অসীম আগ্রহ ছিল। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে সে পড়াশুনা করতো। ঐ সময়েই তার লেখার অভ্যাসে হাতেখড়ি। বিমল লেখতে আরম্ভ করলো। আমাদের জোর করে তার লেখা পড়ে শুনাতো। না শুনলে অভিমান করতো। অনেক সময়ই আমরা তার লেখা শুনতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতাম না। যা হোক পরবর্তী জীবনে সে একজন সার্থক সাহিত্যিক হবে তা ভাবতেও পারিনি।

১৯৭৪-৭৫ সালে কলকাতার রাজনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ অবস্থায় শিয়ালদার ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে অবস্থান করা বিমলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। অনেকটা নিজেকে আত্মগোপন করে ওকে থাকতে হতো। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে সে প্রায়ই আড্ডা দিতে যেত। কিন্তু ওখানে কোনদিনই রাত্রি যাপনে অভ্যস্ত ছিল না। বিভিন্ন ঝামেলা তার উপর সমস্যা বিস্তার করতো। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরা থেকে বিমলের নামে ওয়ারেন্ট পাঠানো হয়েছিল। এর ফলে গ্রেপ্তার এড়াতে তাকে কিছুদিনের জন্য ত্রিপুরা ছাত্রাবাসের চৌহদ্দি ছাড়তে হয়েছিল। সে তখন বালিগঞ্জের ট্রাই এঙ্গুলার পার্কের এক ডেরাতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং অনেকদিন কাটাতে হয়েছিল। আমি সেখানে গিয়ে প্রায়ই ওর সঙ্গে দেখা করতাম। বিমলের বন্ধু প্রীতির কাহিনী সর্বজন স্বীকৃত। ত্যাগ স্বীকারে বিমল ছিল অদ্বিতীয়। কলকাতায় ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে এবং আগরতলার এম এল এ হোস্টেলে সে প্রায়ই নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে বন্ধুদের শোবার জায়গা করে দিত।

৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে বিমল সিংহ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। একদিন

সীমান্ত অতিক্রম করে কৈলাসহরের বন্ধু মোহিত পালকে নিয়ে রওয়ানা দিল ঢাকা অভিমুখে। পৃথ্বীমপাশা রাজাসাহেবের বাড়ী হয়ে তারা প্রথমে ট্রেনে গিয়ে পৌছুলো ভৈরব ব্রীজের এপারে। তখন ভৈরবের ব্রীজ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, মেঘনা তখন স্টিমার দিয়ে পার হতে হতো। বিমল তখন স্টিমারে উঠে পড়লো। কিন্তু কাছেই একটি পালতোলা ছোট্র নৌকা দেখে তার সাধ জাগলো নৌকায় মেঘনা বক্ষে ভেসে বেড়াবে। বন্ধু মোহিত পালের তখন কথা বলার জো নেই, অনেকটা বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে নৌকায় মাঝির সঙ্গে গিয়ে বসলো। বিমল তখন বন্ধু মোহিত পালের নীল রং-এর শার্ট গায়ে দিয়ে বন্ধুকে কমান্ড করলো নৌকায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে। বিশাল বিস্তৃত মেঘনা বক্ষে তখন ঢেউ-এ দোলা খাচ্ছে সংকীর্ণ এক পালতোলা নৌকা, কখন কি হয়। এতেই ছিল বিমলের আনন্দ ও বীরত্ব। এইভাবে শঙ্কাযুক্ত অবস্থায় পালতোলা নৌকা-টানে তারা ভেসে চললো এবং দুলতে দুলতে গিয়ে পৌছুলো ওপাবে আশুগঞ্জ স্টেশনে। সেখান থেকে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত ঢাকা শহরেব কমলাপুর স্টেশন। ঢাকা শহরে পৌছে সে রাত্র ওদের কেটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিদোল্লা হলে। পরদিন বিভিন্ন গণসংগঠনেব নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এরপর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতি মধুর বেঁস্তোরায় বসে কিছুটা সময় কাটালো। তারপর সে তার প্রিয় আন্তর্জাতিক

কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ-১৯৬৯-৭০

বাঁ দিক থেকে বসে ঃ গৌরী চৌধুরী, মালবিকা দে, বিভাস কান্তি কিলিকদার (সহসভাপতি), মহেশ বঞ্জন পাল (সভাপতি), বিমল সিংহ (সাধারণ সম্পাদক), আশুতোষ দে (সহসাধারণ সম্পাদক)

বাঁ দিক থেকে মাঝের সারিতে দাঁড়িয়ে - মনিষ সাহা, কন্দর্প দে, বিজয় রায়, সুভাষ ভট্টাচার্য, আবদুল বাসিত, গুরুদাস চৌধুরী, মফিক মিএগ, অর্ধেন্দু রায় চৌধুরী, বনমালী সিংহ।

বাঁ দিক থেকে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে - অমূল্য দে, সুধীর দেবনাথ, বিদ্যুৎ দে, শক্তিপদ চক্রবর্তী, বিজয় দত্ত, নির্মলেন্দু ধর, প্রভাকর দেবনাথ, দামোদর রায়, পার্থসারথি দেব, দীপক কুমার চৌধুরী।

নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর দেশ কিউবার দূতাবাস খুঁজতে আরম্ভ করলো। আমেরিকান দূতাবাসে গিয়ে ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের খোঁজ খবর নিলো। ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলো সম্পর্কে তার বিশেষ আকর্ষণ এবং পড়াশোনা কলেজ জীবন থেকেই শুরু হয়েছিল।

এ জগতের বৃহৎ আঙিনায় সাধারণ মানুষের আনাগোনাই আমরা দেখতে পাই। বিমল সিংহের চরিত্রে বহুমুখী অসাধারণ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। "Agitators cannot be good administrators"- এই প্রবাদ বাক্যের ঠিক বিপরীতে ছিল বিমল সিংহের অবস্থান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন স্বল্প পরিসরে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্বল স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি বিধানে বিমল সিংহের নিরলস ও বিরামহীন প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ আজও ত্রিপুরাবাসীর স্মৃতিতে চির ভাস্বর। ঐ সময়ে হঠাৎ করে রাত ১২টায়ও ভি এম হাসপাতালের বারান্দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের উপস্থিতি খুব একটা দুর্লভ ছিল না। বিমল সিংহ চরিত্র যে শুধুমাত্র আন্দোলনমুখী বৈশিষ্ট্যে গঠিত তা অনেকটা সত্যি ছিল না। বিভিন্ন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া গিয়েছিল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই। প্রথম বামফ্রন্ট আমলে কমলপুর মহকুমায় গরীব মানুষদের নিয়ে কো-অপারেটিভ গঠন প্রক্রিয়ায় আত্মনিয়োগ করে। প্রাথমিকভাবে মানিক ভাণ্ডারের ধারাং টিলায় গরীব অংশের জনসমষ্টিকে নিয়ে একটি কো-অপারেটিভ গঠন করে। পরপর ৩টি কো-অপারেটিভ এভাবে গঠিত হয়। অপর দু'টি হলো আইচোক কো-অপারেটিভ টি গার্ডেন এবং মাইনটোচু কো-অপারেটিভ টি গার্ডেন। এই কো-অপারেটিভগুলো এখনো চালু আছে এবং এগুলোর উপর নির্ভর করে অনেক শ্রমিক তাদের জীবিকা অর্জন করে বেঁচে আছেন। বিমল সিংহ ছিল সৃষ্টিশীল, উদ্যোগী, আপন আত্মবিশ্বাস, আত্মপরিচয়ে ভরপুর ও বলিষ্ঠ। কোন কোন সময় নিজের অবস্থান থেকে সে এক চুলও নড়ত না। কিন্তু তাই বলে তার চরিত্রে অহংকারবোধ, ইগো অথবা নিজেকে জাহির করার অপচেষ্টা কখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

বিমল সিংহের গঠনমূলক কাজের অনেক নিদর্শন কমলপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জোট আমলে দুস্কৃতকারীরা কমলপুরের কমিউনিস্ট পার্টির অফিস পুড়িয়ে দেয়। বিমল সিংহ তখন স্থির ও দৃঢ় চিত্তে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পার্টি অনুগামী সবাইকে শ্রমদান করতে হবে নতুন অফিস বাড়ী তৈরি করার কাজে। কমলপুর বাজারের ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অংশের জনগণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সিমেন্ট, টিন, কাঠ ইত্যাদি সাহায্য আসে। অতপর শুরু হলো ঝড়ের গতিতে অফিস বাড়ী তৈরির কাজ। পার্টির প্রতি অনুগত রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি সবার কাছে বিমল সিংহের আহ্বান পৌঁছে যায়। বিমল সিংহ স্বয়ং সারারাত্রি জেগে শ্রমিকদের উৎসাহ দান করেছিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে অফিস ঘর তৈরি হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির অফিস গৃহ ধ্বংস করার পাল্টা জবাব বিমল সিংহ দিয়েছিল এভাবে। বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন কার্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিপক্ষের যুগপৎ ঈর্ষা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিল রূপসপুরের সন্তান বিমল সিংহ।

ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার কাহিনী সর্বজনবিদিত। উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা, তাদের লোকসংস্কৃতি, লোকগীতি ইত্যাদির প্রতি তার ছিল অসীম আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। ককবরক ভাষা ছিল তার সহজ আয়ত্তে। সেই সুবাদে তার অবাধ গতি ছিল পাহাড়ে। জম্পুই এর লুসাই পাহাড়ে অথবা লংতরাই-এর পাদদেশে তার

আনাগোনা ছিল অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত। কমলপুর মহকুমার জাংথুং, ছানাইয়া রিয়াং, সাইকার, বঙ্গবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে বিমল সিংহের প্রতিনিয়ত যাতায়াত ছিল। অপরদিকে নেপালটিলা, ধূমাছড়া, গঙ্গানগর প্রভৃতি জনপদে বসবাসকারী উপজাতি জনগণের সঙ্গে তার ছিল এক হৃদয় দেয়া নেয়ার সম্পর্ক।

বিমল সিংহের বন্ধু প্রীতির অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। সে সাধারণত যে সকল বন্ধু খুবই দুর্বল, অখ্যাত তাদের খোঁজ খবর নিতে এবং সাহায্য করতে আগ্রহী ছিল। ওর মৃত্যুর পর গিয়ে শুনেছি কমলপুরের এবং কৈলাসহরের অনেক দুর্বল অখ্যাত বন্ধুদের সে তালিকা তৈরি করত। এবং তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে সকলের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করতো। কৈলাসহরে এরকম দুই বন্ধু ছিল বিমল সিংহের, এরা খুবই অর্বাচীন শংকর পাল এবং পরলোকগত আশুতোষ দে। দু'জনেরই পারিবারিক জীবন এবং সমাজ জীবন বিধ্বস্ত কিন্তু বিমল সিংহের কাছে তারা ছিল সমাদৃত। সংকটকালে বিমল সিংহ বন্ধুর সাহায্যে দণ্ডায়মান এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ তার চরিত্রে পাওয়া যায়। মনে হয় এজন্যই বিমল যখন চিঠি লিখত তখন চিঠির শেষ বর্ণমালা ছিল Never Failing Friend। বিমলের বন্ধু প্রীতির আরও দু'একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ সালে একবার খোয়াই এ ছাত্র ফেডারেশনের কনফারেন্সে যাওযার পথে একটি হোটেলে সবাইকে খেতে হয়েছে। হোটেলে খেতে বসে বন্ধু সুখময় দেবনাথেব খাবারের থালা থেকে বিমল ওর ডিম লুকিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। সুখময় দেবনাথ ছিল তখন কৈলাসহরের একজন ছাত্র কর্মী ও নেতা। বিমল বিয়ে করার পর সুখময় দেবনাথের সঙ্গে ওর প্রথম দেখায় বিমল নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সুখময়ের পরিচয় করিয়ে দিল এইভাবে — 'আমার যেমন দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, একটি মাথা ইত্যাদি সুখময়েরও তাই আছে। পার্থক্য শুধু চেহারায়, সে আমার মতই একটি মানুষ।' কৈলাসহরে পদার্পণ করলেই সে আমাকে ফোন করে জানাতো বা কখনও কখনও স্বয়ং এসে বাড়ীতে উপস্থিত হত। ওর আরেকটি অভ্যাস ছিল যখনই আমাদের বাড়ীতে আসতো তখনই বাড়ীর পেছনদিকে আমার বাবার শোবার ঘরে চলে যেত এবং জিজ্ঞেস করে খবর নিত শরীর কেমন আছে। আমার ছোট ভাইকে সামনে পেলে ঠাট্টা করে বলতো 'কি ছোট চদ্রি, কেমন আছ?' এভাবেই তার জীবন সর্বদাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল।

১৯৯৬ সালে আগরতলা বইমেলায় গিয়েছিলাম। সেবার বিমলের সরকারী বাসভবনে উঠেছিলাম। বইপত্র কেনা শেষ করে যখন ওর কোয়ার্টারে ফিরলাম তখন দেখলাম ওর ওখানে অনেক অতিথি। কে কোথায় শুয়ে রাত কাটাবেন কিছুই ব্যবস্থা হয়নি। আমি এখানে ওখানে বসে বসে দেখলাম বেশ রাত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বিমলকে বললাম 'আমি কোথায় ঘুমাবো বুঝতে পারছি না। তোমার এখানে তো দেখছি ঘরশুদ্ধ লোক, মহিলাও আছেন কয়েকজন। আমাকে অন্যত্র যেতে দাও, আমার কোন অসুবিধা হবে না, রাত হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোথায় ঠাঁই হবে তা বুঝতে পারছি না।' বিমল কিছু বলছে না চুপ করে আছে। একবার শুধু বলল সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রাত দশটা নাগাদ দেখা গেল বিমলের স্ত্রী সামনের পট্রিকের একটি বিশাল বিছানা আমার শোবার জন্য তৈরি করে দিচ্ছেন। আমি বললাম তোমার বাড়ীতে এত লোক, আর আমি একটা বিশাল বিছানা একা দখল করে ঘুমাবো, এটা হতে পারে না। তখন ও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে রসিকতা করে বলল 'তুমি তো প্রফেসার, তোমার সঙ্গে আর কেউ ঘুমোতে রাজী হচ্ছে না। তুমি

ঘুমিয়ে পড়।' বাধ্য হয়ে বড় বিছানায় একা শুতে হল। আর দেখলাম ওর অন্য সব ঘরগুলোতে মাটিতে, মেঝেতে, বিছানা পেতে অনেক বয়স্ক মহিলারাও ঘুমিয়ে পড়েছেন।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জম্পুই পাহাড়ে কমলা উৎসবে উপস্থিত থেকে জম্পুই দেখার সাধ জাগলো মনে। কারণ জম্পুই আমার তখনও আনভিজিটেড। বিমলকে কৈলাসহর থেকে ফোন করে মনের বাসনা জানালাম। বিমল ততক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। শুধু বলল যাবার দিন বিকেল বেলা কুমারঘাট ডাকবাংলো চলে আসতে। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। কুমারঘাট পৌঁছে দেখলাম বিমলের দেখা নেই। ভাবলাম বোধহয় ভুলে আমাকে ফেলে চলে গেছে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহের কোন উপস্থিতি চোখে পড়লো না। মনে সন্দেহ হলো তাহলে কি বিমলের মনে আছে! না চলে গেল! এমন সময় কুমারঘাটে বিমল সিংহের পুরাতন পি বি জি কাঞ্চনবাড়ীর মণিময় রাজকুমার এসে উপস্থিত। সে আমার ছাত্র, মণিময় বলল 'বিমলদার সঙ্গে আমি দশ-বারো বছর ছিলাম। উনার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক উনি আপনাকে যখন বলেছেন তখন জম্পুই নিয়ে যাবেনই। বিমলদা যখন যাকে যা কথা দেন তা কখনও ভুলে যান না। উনার স্মৃতি শক্তি প্রখর।' মণিময়ের কথা সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল। দেখা গেল রাত ৭টার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ একটি মাত্র এমবেসেডর গাড়ীতে করে এসেছেন এবং গাড়ী থেকে একে একে ৮/৯ জন লোক নেমে পড়লেন। এদের মধ্যে বিমলের মেয়ে রুজালীন এবং কলকাতার চোখের ডাক্তার রতীশ পালের স্ত্রীও আছেন। কুমারঘাটে পৌঁছেই বিমল আমার খোঁজ করে আমাকে বের করে নিল। তবে সে রাত্রে আর জম্পুই যাওয়া হলো না। স্থির হলো ঐদিন রাত কুমারঘাট কাটিয়ে পরদিন ভোরে জম্পুই রওয়ানা হওয়া যাবে। এতজন লোক নিয়ে কুমারঘাট পি ডব্লিউ ডি ডাক বাংলোয় অবস্থান করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এছাড়া আরেকজন মন্ত্রীও ডাকবাংলোয় উঠেছেন। শেষ পর্যন্ত কুমারঘাট ব্লক অফিসের ডাক বাংলোতে সবাইকে যেতে হলো রাত্রিবেলা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে। সেখানে রাত্রিবেলাই অনেক পরিচিত ব্যক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। রাত্রিবেলা কুমারঘাট ব্লকের ডাক বাংলোতে ঘুমানোর সময় দেখা গেল ভি আই পি রুমে মন্ত্রী ঘুমোতে রাজী নয়। উনি এবং সালেমার এম এল এ প্রশান্ত দেববর্মা একটি অর্ডিনারী রুমে ঘুমালেন এবং ভি আই পি রুমে শেষ পর্যন্ত আমাকে রাত্রি কাটাতে হলো।

পরদিন সকালে আরেকটি জীপ ভাড়া করে সবাই মিলে জম্পুই অভিমুখে রওয়ানা হলাম। জম্পুই কমলা উৎসবে প্রধান অতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ। কিন্তু ঐদিন বা এর পরদিন ত্রিপুরার গভর্নরও আসছেন জম্পুই পাহাড় দর্শনে। সুতরাং ইডেনে থাকার সমস্যা দেখা দিল। এছাড়া অন্যান্য সাধারণ যাত্রীরাও আছেন। ভি আই পি স্যুট দুটো স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করা হলো। কিন্তু মন্ত্রীর সঙ্গে আছেন কমপক্ষে ১০ জন অতিথি। এত লোকের থাকার ব্যবস্থা কিভাবে হবে এই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। একটি স্যুট দেওয়া হল দু'জন মহিলার জন্য। আরেকটি স্যুটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ এবং অন্যরা সবাই মিলে ৮/৯ জন। দুটো বেডে এবং কয়েকজনকে ফ্লোরে ঘুমাতে হলো। লেখক স্বয়ং এবং মণিময় রাজকুমার চলে গেলাম একটি লুসাই বাড়িতে রাত্রি কাটানোর জন্য। এভাবেই বিমল সিংহের সঙ্গে সেই জম্পুই পাহাড়ে কমলা উৎসবের স্মৃতি আজও মনে পড়ে। বিমল সবাইকে নিয়ে কষ্ট করে একসঙ্গে থাকতে ভালবাসতো এবং সেজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতো। যে কোন পরিস্থিতিতে সে মানিয়ে নিতে পারতো এবং সেক্রিফাইজ করে সে আনন্দ পেত।

এই অভ্যাস তার কলেজ জীবন থেকেই লক্ষ্য করেছি। সেক্রিফাইজ করতে যারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল তাদের সে স্বার্থপর আখ্যা দিত।

বিমল সিংহের উঁচু বক্ষ, সুবিন্যস্ত কাঁধ, সুদীর্ঘ হস্তদ্বয়, বলিষ্ঠ দেহ ও দন্ত বিকশিত হাসির মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিমল ছিল চির উন্নত শির, অকুতোভয় এবং অহংকার বোধশূন্য এক অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তি। সমাজের যে কোন অংশের মানুষের সঙ্গে নিমেষে মিশে যাওয়ার এক অসাধারণ ক্ষমতা তার চরিত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। শিক্ষকদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। কৈলাসহর কলেজে তার স্মরণসভায় অধ্যাপক শিক্ষক রাধাগোবিন্দ মজুমদার তার চরিত্রের এই গুণ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাশ্য রাজপথে শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার অনেক উদাহরণ সহজেই চোখে পড়ে। বিমলের অন্য একটি গুণ বা দোষ ছিল যে, সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারতো না। যে কোন পরিবেশে, যে কোন মানুষের সঙ্গে অতি সহজেই মিশে যাওয়ার এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তার সহজাত। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের সঙ্গে অতি সহজেই একাত্মতা অনুভব করতো। ওদেরকে বিশ্বাসও করতো অকৃপণভাবে। অন্তরে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রেই বিমল সিংহের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৃহৎ ও উদার। সে আশা করতো সকলেই বাঁচুক, সবাইকে বড় হতে হবে। বৃদ্ধির সুযোগ সবাইকে দিতে হবে। আসলে যার যত চেতনা, তার তত বেদনা। বিমল সিংহের চেতনার স্তর ছিল অনেক গভীর। তাই অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিপন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির উদ্ধার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কারণ তার হৃদয়ে ছিল দুর্বল প্রতিবেশীদের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা এবং সমস্যাপীড়িত দুর্বল অংশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। তার হৃদয় ছিল বিশাল ও অফুরন্ত ভালবাসায় ভরপুর। তার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিষ্ঠুর ঘাতকরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। অবশ্য ভুল সে করেছিল এবং সেই অকল্পনীয় ভুলের মাশুল সে দিয়ে গিয়েছিল নিজের অমূল্য জীবনের করুণ পরিসমাপ্তির বিনিময়ে। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে অর্থ সর্বস্ব, ভোগবাদী এক বিপন্ন সময়কে চিনতে সে হিমালয় সদৃশ ভুল করেছিল। শূন্য গর্ভ কথা, কর্ম বিমুখতা আর আর্থিক দুর্নীতির অক্টোপাসে যখন আমরা তথাকথিত অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা আপাদমস্তক আবদ্ধ তখন ভালবাসা, সাহস ও দায়বদ্ধতার জন্য বিমল সিংহের ত্যাগ ও তার কর্মবহুল জীবন এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইলো। বাইবেলের ভাষায় 'মহান হতে পারেন তিনি যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন তার সুহৃদবর্গের জন্য'। যে ভ্রাতার মুক্তি লাভের জন্য বিমল সিংহের এই আত্মবলিদান সে কিন্তু তার মাতার গর্ভজাত সন্তান নয়। সে ছিল বিমলের পিতার পালিত সন্তান। পালিত ভ্রাতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা আজকের বিভ্রান্ত যুবসমাজের কাছে এক মহান আদর্শের দ্যোতক। এই আদর্শ প্রচার সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজন। আমরা দেশ বিদেশের অনেক লেখক ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ করে থাকি, কিন্তু ত্রিপুরার লালমাটি, ধলাইয়ের তীর থেকে উদ্ভূত বিমল সিংহের জীবনের ও তার সৃষ্ট সাহিত্যের আরো গভীর চর্চা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন মনে হয় শেষ হয়ে যায়নি। তার নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ের মানুষ, ধলাই নদী ও লংতরাই পাহাড়। তার সাহিত্য রচনার প্রতিটি স্তরে জাতি-উপজাতি মিলনের সুর উচ্চারিত। তার রচিত 'বসনের ঠাকুরমা' এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিমল সিংহ ছিলেন প্রকৃতই জননেতা

রণজিৎ ঘোষ

গবীব মানুষেব বিরুদ্ধে যাবা প্রতিনিযত ষডযন্ত্র কবছে তাবাই জনগণেব প্রিয় নেতা কমবেড বিমল সিংহকে হত্যা কবেছে। কমবেড বিমল সিংহ ছিলেন সত্যিই জনগণেব নেতা বা প্রকৃত বিপ্লবী। একজন বিপ্লবী বা কমিউনিস্টেব যা যা গুণ থাকা দবকাব বিমল সিংহেব মধ্যে আমবা তা দেখতে পেযেছি। গত তিন দশক ধবে তাঁব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ কবতে গিযে দেখেছি তাব হৃদযটি ছিল বিশাল। মনেব দিক দিযে, জ্ঞানেব দিক দিযে তিনি ছিলেন একজন বড মাপেব মানুষ। তিনি সবসমযই গবীব, পিছিযে পডা, আদিবাসী, কৃষকসহ শ্রমজীবী মানুষেব জন্য কাজ কবতেন। তিনি ছিলেন শ্রমিক-কৃষকেব প্রকৃত বন্ধু। সম্প্রীতি বিবোধী, গণতন্ত্র বিবোধী, বামফ্রন্ট বিবোধীবা ইতিহাসেব সব চাইতে ঘৃণ্য অপবাধটি ঘটিযেছে। এবা বাজ্যেব, দেশেব জনগণেব শত্রু। মানুষেব হৃদযে বা মনে এই ঘৃণ্য ষডযন্ত্রকাবীদেব কোন স্থান নেই। সব ধবনেব ঘৃণ্য চক্রান্তকে প্রতিহত কবে জনগণেব সংগ্রামকে এগিযে নিযে যাওযাব মধ্য দিযেই কমবেড বিমল সিংহেব প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে। ব্যক্তিগত জীবনে কমবেড বিমল ছিলেন আমাব ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং সহযোদ্ধা। তাঁব মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে দেশেব কমিউনিস্ট আন্দোলন। তবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হযেছি আমবা, কমলপুবেব জনগণ। একদিকে তাব আদব স্নেহ ভালোবাসা থেকে যেমন কমলপুবেব মানুষ বঞ্চিত হযেছে তেমনি এই বিভাগেব মতাদর্শগত সংগ্রামও কিছুটা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাব অপূর্ণ কাজকে আমবা সকলে মিলে পূবণ কবাব চেষ্টা কববো। বিমল সিংহদেব মৃত্যু নেই। তাবা সংগ্রামী জনগণেব হৃদযে চিবকাল অমব হযে থাকেন। (৩১শে মার্চ ২০০০, কমলপুরেব রূপসপুবে শহীদ বিমল সিংহ স্মৃতি স্তম্ভেব কাছে তাঁব তৃতীয় শহীদান দিবস উদযাপন উপলক্ষে আযোজিত সমাবেশে ভাষণেব একাংশ) *—ডেইলি দেশেব কথা, ১লা এপ্রিল, ২০০০*
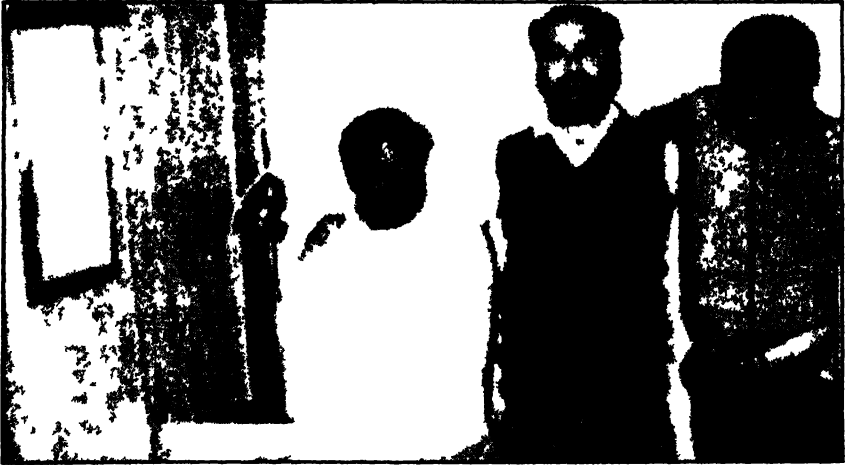
দক্ষিণ আফ্রিকাব স্পীকাবদেব সাথে বিমল সিংহ।

বিমল সিংহ, দূরদৃষ্টি এবং গানের পাখি

সিতাংশুশেখর দাস

মৃতুর পরে কেউ কেউ দূরদর্শী হন। অর্থাৎ দূরদর্শী বলে গণ্য হন। মৃত্যুর পরে ফুলের মালা কিংবা পতাকা ছাড়া অন্যকোনো ভূষণে ভূষিতকরণের অর্থ নেই। মানুষটিতো আর জেনে গেলেন না তার সম্পর্কে অন্যদের অভিজ্ঞতা। বিমল সিংহ সম্পর্কিত নানা অনুষ্ঠানের সংবাদ পড়তে পড়তে মরণোত্তরের বিষয়টি মনকে পীড়িত করে। তার জীবনকালে যদি তাকে বলা হত — 'আপনি দূরদর্শী', মনে হত চাটুকারিতা করা হচ্ছে। কিন্তু এখন যদি না বলা হয়, বিষয়টি দুঃখের উৎস হয়ে থাকবে।

কথাটি প্রথম মনে হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী, প্যালেস কম্পাউন্ডের স্টেট হোমিওপ্যাথিক ইনস্টিটিউটের উঠোনে সামিয়ানা খাটানো বড়সড় একটি প্যান্ডেলে বসে। সেখানে দুপুরবেলা স্টেট হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার্স এসোসিয়েশনের ষষ্ঠ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছিল। ঐ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ভানুলাল সাহা, শ্রীমতী নিরুপমা দত্ত, সম্মেলনের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ। আমি ছিলাম বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি। বসে বসে আমার মন ঐ সমিতির জন্ম ইতিহাসের পৃষ্ঠা একে একে উল্টে যাচ্ছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে ত্রিপুরায় আঠারোজন সরকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তাদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তিম স্তরে নিয়ন্ত্রণ করতেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য সচিব। পেশায় তারা ছিলেন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক। সরকারী স্তরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তখন নতুন সংযোজন। তাদের গ্রেড, স্কেল ইত্যাদি সম্পর্কে বৈষম্যজনিত কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছিল। ঐ দ্বন্দ্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের বিচ্ছিন্ন অবস্থান তাদের বঞ্চিত হবার সুযোগ করে দিচ্ছিল। তখন নানা সমস্যা নিয়ে ডাঃ ইন্দুভূষণ সরকার আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। আমি সমিতি গঠনে তাদের সাহায্য করেছিলাম। এক্ষেত্রে পেশাগত বিরোধ সৃষ্টি হতে পারেনি বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। এই ঘটনার আগে, প্রায় সমসাময়িক কালে, সরকারী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে আই. এম.এ. এবং নন-আই.এম.এ. মেডিকেল অফিসারদের মধ্যে আত্মক্ষয়ী বিরোধের ফলে পেশাগত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। আই, এম, এ চিকিৎসকদের সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু প্রতিপত্তি বেশী। জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিপত্তি ছিল না, কিন্তু সংখ্যায় তিনশতাধিক। স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্যসচিব- এরা ছিলেন আই.এম.এ ভুক্ত। জুনিয়রদের উপর সিলেক্‌টিভ ভিক্‌টিমাইজেশন এবং অবদমনের ঘটনা প্রায়শই ঘটত। এ.সি.আর. নামক ছাপানো ফরম পূরণ করা স্বীকার করা হত না। চাকুরির স্বার্থের মুখোশে শাস্তিমূলক বদলি-এই সব ছিল "প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ"। জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষুব্ধ করে এক অসংগঠিত আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল কিছু অদৃশ্য হাত। তা ঠেকাবার উপায় ছিল না। এই সময়ে জুনিয়র মেডিকেল অফিসার ডাঃ কেশব দেবনাথের এ. সি. আর.-এর বিরূপ মন্তব্যের কেসটি প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল জুনিয়র মেডিকেল অফিসারদের মধ্যে । তারা দল বেঁধে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কেসটি আমি বিবাদীর পক্ষে পরিচালনা করেছিলাম। তার আগে একটিও প্রতিরোধের ঘটনার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছিল না।

চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত কাহিনী শুনে মনে হয়েছিল —তাদের আশু প্রয়োজন একটি সংগঠন। ডাঃ শ্যামল বণিক প্রচন্ড পরিশ্রম করলেন, তাকে সাহায্য করলেন ডাঃ কেশব দেবনাথ এবং আরো অনেকে। অতি অল্পদিনে গড়ে উঠল — অল ত্রিপুরা জুনিয়র ডক্টরস্ এসোসিয়েশন বা এ. টি. জে. ডি. এ.। সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে একটি শর্ত হল-সমাজসেবা। এ বিষয়ে ডাঃ বণিকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দীর্ঘ সংবিধানটি আমি তৈরী করতে গিয়ে, সত্যি বলতে কি, অনেকদিন পরে এক প্রচন্ড উৎসাহ বোধ করেছিলাম। রাষ্ট্রীয় পরিষেবায় চিকিৎসকদের জোগান দেয় যে পারিবারিক পরিস্থিতি — তা এই কঠিন আদর্শের সর্বাত্মক সহায়ক নয়। কিন্তু এ. টি. জে. ডি. এ.-র এটি এক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য যে তারা একে এখনও স্বীকার করেন। তাদের সংবিধানে তা বহাল রেখেছেন। নন প্র্যাক্টিসিং ভাতাকে মহার্ঘভাতার আওতা থেকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্তটি প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল সরকারী চিকিৎসকদের । কিন্তু তারা সরকারকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলেন না তাদের দাবির স্বপক্ষে আইনের স্বীকৃতি। কিছু জ্ঞানপাপী ফাইলের ভেতরে কারুকার্য করে সরকারকে এই দাবির বিরোধিতায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এ. টি. জে. ডি. এ. গঠন হবার পরে ব্যাপারটি অনেক সহজ হয়ে গেল। স্মারকলিপির ভিত্তিতে সংগঠনগত ভাবে তাই করতে সক্ষম হলেন। একটি অসংগঠিত ধর্মঘট হতে হতেও হল না।

ত্রিপুরার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারী দুরদর্শিতার এটি প্রথম দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় দূরদর্শিতার কথা বলেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ সালের সম্মেলনে। ঐ দিনের অভিনব গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন—সরকারী হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালেব চিকিৎসা পদ্ধতিকে অতিদ্রুত আধুনিক স্তরে উন্নীত করবার লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে, এক্সরে মেসিন, আল্টা-সোনোগ্রাফী মেশিন। বিভিন্ন ধরণের প্যাথোলজিকেল পরীক্ষাব যন্ত্রপাতি এবং এই সব ব্যবহারের জন্য ট্রেনিং। তিনি বললেন—লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করার পুরনো হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি পৃথিবীর বহু দেশে অনেকাংশে উঠে গেছে। তার বদলে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগ নির্ণয় কব্বার পদ্ধতি চালু হয়েছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার কবার জন্যে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ সবের জন্য সরকারের টাকার অভাব হবে না।

কান খাড়া হয়ে গিয়েছিল। "সীমিত ক্ষমতা" শুনে শুনে সীমিত হয়ে গিয়েছিল। আজ একজন শোনালো — টাকার অভাব নেই। শোনাতে পারল তো ? শ্রোতারা তো ট্রেজারিতে টাকার হিসেব দেখতে যায় না, তারা শুনেই খুশি হয় ! আর, কিছু দেখতে পেলেতো কথাই নেই। মানুষের কাছে তিনগুণ গল্প করে বেড়ায়। বিরোধী পক্ষ ? কোনদিন ভাল কিছু বলে কি ? তাদের কথা ভেবে সীমিত হয়ে যাওয়ার মানে মানুষের আকাঙ্খার ডানা কেটে ফেলা। বিমল সিংহের ঐ কথা শুনে মনে পড়েছিল হরিয়ানা বাসিনী এক জাঠকন্যার কথা। নাম টি.কে. আর্যবীরা, আই. পি. এস। ত্রিপুরার ডাকবিভাগের ডিরেক্টর হয়ে এসেছিলেন। পোড়া ডাকঘরের যতবড় অফিসার হয়, তত বেশী করে বলে - সরকারের টাকা নেই। কাজের বেলা কম টাকায় ছোট ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে কর্মচারীদের গোরু-ছাগলের মত পুরে দিয়ে বলে - অরুন্ধতীনগর ডাকঘর, ধলেশ্বর ডাকঘর, বিধানসভা ডাকঘর। ঐ মহিলা তার অধস্তন অফিসারদের ডেকে বললেন - অমুক ডাকঘরের জন্য ভাল বাড়ী দেখো। মালিক যা চায় তাই দেব। পি. ডাবলিউ. রেট নয়। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের টাকার অভাব নেই। কথাটি শুনে মনে হয়েছিল মহিলার তেজকুমারী নামটিতে ভেজাল নেই ;

খাঁটি নাম। বিমল সিংহেব মুখে টাকাব অভাব নেই শুনে ঐ মহিলাকে মনে পড়েছিল। বুক এবং অনুভবেব এমন বিশিষ্টতা খুব কম চোখে পড়ে। দূবদর্শিতা থেকে এটি সম্ভব। ত্রিপুবাব চিকিৎসা ব্যবস্থায় তিনি উন্নত এবং আধুনিক প্রযুক্তিব সংযোজন কবেছেন। যেমন সি. টি স্ক্যান. আলট্রা-সোনোগ্রাফী, কোবাল্ট প্লাস্ট, পেস মেকাব বসানোব পবিকাঠামো, দন্ত চিকিৎসাব সমস্ত বকমের আধুনিক যন্ত্রপাতি। সমস্ত অপাবেশন থিয়েটাবে উন্নত আলোকব্যবস্থা ইত্যাদি। তাছাড়া, থ্যালাসেমিয়া সোসাইটি গঠনে সহাযতা কবা এবং থ্যালাসেমিয়া বোগীদেব বিনামূল্যে বক্ত দেওযাব ব্যবস্থা চালু কবা, গবীব বোগীদেব ক্ষেত্রে বি পি এল বেশন কার্ডেব ফটোকপিব ভিত্তিতে বিনামূল্যে আল্ট্রা সোনোগ্রাফী ইত্যাদি পবীক্ষাব ব্যবস্থা কবে পদ্ধতিব সহজীকবণ তাব দূবদর্শিতাব নিদর্শন। ডাক্তাবদেব সঙ্গে আলোচনা কবে মনে হযেছে তাবা তাব সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং উচ্চধাবণা পোষণ কবেন। ইতিমধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব জন্য এক্স-বে মেশিন এসে গেছে।

তাব লেখক জীবনেব কথা না বললে বিমল সিংহ সম্পর্কে আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি অনেকগুলি গল্প উপন্যাস লিখেছেন স্বল্পপবিসব জীবনে। আলোব ঠিকানা, কবাচি থেকে লংতবাই, সত্যেব আলোকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুবী (সম্পাদিত), মনাইহাম, তখাপাড়াব ইতিকথা, লংতবাই, তিতাস থেকে ত্রিপুবা, ববেইব যাবী ইত্যাদি অন্যতম। সবগুলো বইযেব ভিত্তিতে তাব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু 'কবাচী থেকে লংতবাই' গল্পটি সম্পর্কে দুটি কথা বলব। আসাম আগবতলা সড়কটি সবে চালু হযেছে। বাস্তা কাঁচা, পুল কাঁচা। একদিন, ঝড়ে লংতবাই পাহাড়েব নীচে ধাগবাছড়াব পুলটি জলেব তোড়ে উড়ে গেছে। ঐখানে যাত্রীবোঝাই বাস্ নিযে পৌঁছে ধর্মনগবেব ড্রাইভাব অনন্ত ভট্টাচার্য খুব সমস্যায় পড়ে যায়। ছড়া পাব হবাব উপায় নেই। উড়ে যাওযা পুলেব পাশে বাস্তাব কাজকবা ঠিকেদাবেব লোকজন ছিল। অনন্ত ড্রাইভাব গাড়ীকে টুকবো টুকবো কবে খুলে ঠিকেদাবেব লোকজনেব সাহায্য নিযে ছড়াব অপব পাবে নিযে গেল।

ব্যাকুল শোকে মুহ্যমান প্রযাত বিমল সিংহব পিসীমা সুমতি সিংহ।

আবার সব জুড়ে যাত্রীদের উঠিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর লেখক বলছেন-"মানুষের এগিয়ে চলার পথ কোনদিন রুদ্ধ হয় না"- এখন মনে হয়, যারা তাকে হত্যা করেছে তাদের তিনি আগেই মুখের মত জবাব দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ড্রাইভার অনন্ত ভট্টাচার্য এই সহজ কথাটাকে অমোঘ করে তুলল দুর্ধর্ষ অভিযানের মাধ্যমে। লংতরাই হয়ে রইল ত্রিপুরার মোটর শ্রমিকদের অপরাজেয় অভিযান কাহিনীর স্বর্ণখনি হয়ে। কেউ যদি কোনদিন খুঁড়তে খুঁড়তে পায় এমন কিছু কাহিনীর হাড়গোড়, তবে অবাক হয়ে ভাববে ত্রিপুরায় কি এপম্যান ছিল ১৯৫০-এর দশকে? কঠিন সময়ে মানুষের বুকে সাহস জোগাবে এই কথা-"মানুষের এগিয়ে চলার পথ কোনদিন রুদ্ধ হয় না ", শক্তি জোগাবে ড্রাইভার অনন্ত ভট্টাচার্য।

গল্পের দ্বিতীয় ঘটনা, লংতরাই পাহাড়ের যেখানে করাচির বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়েছিল, সেখান থেকে তাল তাল আগুনে পোড়া সোনা কুড়িয়ে পেয়েও কার্তিক ত্রিপুরা তার অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারল না। তাকে ঠকিয়ে সব সোনা নিয়ে গেল ধুরন্ধর ব্যবসায়ী, ধূর্ত পুলিশ অফিসার, বাটপাড় দালাল ইত্যাদি "অগ্রসরতম মানুষ"। শেষে নিঃস্ব হয়ে কার্তিক পাহাড়ে পাহাড়ে ভিক্ষে করতে থাকে। তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন লেখক বলছেন — "সোনার পাহাড় মাথায় এলেও শতাব্দী ধরে যে মানুষ ঘুমের ঘোরে পড়ে আছে, সে ঘুম ভাঙুক, তারা জেগে উঠুক, অগ্রসরতম মানুষেরা যদি - তা না চায়, হাজার কার্তিক যুগে যুগে পথে পথে এমন করেই ঘুরবে।" ত্রিপুরার এই প্রজ্ঞার বাণী বিংশ শতকের মধ্য পূর্বকালে উচ্চারিত হয়েছিল তরুণ কিছু বিজ্ঞ মানুষের কণ্ঠে যাদের শেষ কয়েকজন এখন বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে। এই সত্যকে লেখক কার্তিক ত্রিপুরার মধ্যে জীবন্ত করে রেখেছেন তার দূরদৃষ্টি দিয়ে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে অন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে। তারা যত " তাল তাল সোনা" লুটছে, গরীব উপজাতিগণ তত গরীব হচ্ছে পাহাড়ের গভীরে যেখানে কাজ, খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার পথ রুদ্ধ করে আছে উগ্রপন্থা।

তার কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টির অতলান্ত গভীরতাকে আততায়ীরা এখন বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গানের এক হৃদয় বিদারক পাখি করে দিয়েছে, যে দেশে দেশে উড়ে উড়ে গায় — আমি সুদেষ্ণা ! তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা আন্দোলনের একজন সংগঠক ছিলেন। ঐ আন্দোলনের শহীদ হন কাছাড় কালীগঞ্জের সুদেষ্ণা সিংহ ১৯৯৬ সালের ২রা জুলাই। ঘটনাটি তাকে ব্যথিত করেছিল। তিনি একটি গান লিখেছেন যাতে তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন - আমার মৃত্যুর পরে আমি পাখি হয়ে গাছের শাখা কিংবা ঘরের চালে এসে বসব; চিনতে না পারলে আমায় সুদেষ্ণা বলে ডেকো। গানটি প্রথম শুনলাম ৩০শে এপ্রিল ১৯৯৮ সালে, আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে, ক্যাসেটে। গানটি নাকি তার দিদি গেয়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার সঙ্গে শৈশবে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের মত এক করুণ মাধুর্য ঐ গানে প্রত্যক্ষ করলাম যা আমাকে ঘিরে ধরেছিল বাট বছর পরে। বাইরে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে হয়েছিল আমগাছে কোন পাখি এসে বসেছে কিনা। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে হাস্যকর। কিন্তু, কবিতা যে চিরকাল কিছু মানুষের কাছে হাস্যকর। তাতে কবিতার কিছু যায় আসে না। সে মানুষকে হাসায় এবং কাঁদায়ও।

মাতৃভাষা আন্দোলনে সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে 'সুদুরের পিয়াসী' এই গানটি তুষার কণা ঝরাবে এক অনাগত সময়ে। শোনাবে মহাজীবনের আহ্বান।

— স্মরণিকা - ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি, ২৪তম কমলপুর বিভাগীয় ৭ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ৭ জুন, ১৯৯৮

বিমল সিংহ ঃ একটি সম্ভাবনাময় জীবনের অকাল অবসান

ডঃ ব্রজগোপাল রায়

কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময় কলেজের কিছু কিছু অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিমল সিংহ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সে আন্দোলন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে থেকে ছাত্র আন্দোলনের নেতা বিমল সিংহ পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন। এমনিতে ধীর স্থির বিনয়-নম্র ছিল তার আচরণ। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। আমরা তখন কলেজ ছেড়ে চলে এসেছি তাই তার সাথে পরিচয় ঘটেনি। সাহিত্য, রাজনীতি, ভ্রমণ এবং জাতি উপজাতির মানুষের সঙ্গে মেশার নেশা ছিল তার। সে নেশাই তাঁকে শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারাদের কাছে টেনে নিয়েছে। তাদের জীবনের দুঃখ বেদনা দূর করবার অভিপ্রায়েই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি লেখালেখির কাজে হাত দিয়েছিলেন।

বিমল সিংহ মণিপুরী পরিবারের ছেলে। মণিপুরীদের আচার আচরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মণিপুরী সমাজের রীতিনীতি, চালচলন, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জানবার এবং বুঝবার চেষ্টায় তার ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু তিনি ছোটবেলা থেকেই কেবল নিজের ঘর সংসার এবং সমাজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাকে পছন্দ করতেন না। যে সমাজ পরিবেশে তার জন্ম সে পরিবেশের নদী, পাহাড়, সমতল, গাছ-পালা, তৃণগুল্ম থেকে শুরু করে পাখপাখালি, জন্তু জানোয়ারদের জানবার প্রচেষ্টাও ছিল তার। কৈশোর থেকেই তিনি একটু ভবঘুরে এবং ডানপিটে ধরনের ছিলেন। তার সাহস এবং মনোবল ছিল অদম্য। তিনি জাতি-উপজাতি, হিন্দু মুসলমান থেকে আরম্ভ করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টা করতেন, জানতে আগ্রহী ছিলেন তাদের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থানের গতি প্রকৃতিকে। বিমল সিংহের সাহিত্যকর্মের মধ্যে এসবই প্রতিফলিত।

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হিসেবে আমি প্রথম যখন কমলপুর যাই তখন বিমল সিংহের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। এর আগেও বিভিন্ন আন্দোলনে তাকে দেখেছি কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়নি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মান করেছেন। খোঁজ নিয়েছেন আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। মানুষকে আপন করে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার। তখনই দেখেছিলাম কমলপুরের যুব সমাজের উপর তার প্রভাব ছিল খুব বেশি।

একজন বিধায়ক হিসাবে বিমল সিংহকে দেখেছি। বিধানসভায় তার বক্তব্য আমার ভাল লাগত। অবাস্তব কথা না বলে এলাকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে তিনি সুন্দর ভাবে তুলে ধরতেন বিধানসভায়। বক্তব্যের সমর্থনে নানা নজির তিনি উপস্থাপিত করতেন। পাহাড় এবং সমতলের নিপীড়িত জনগণের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে তার বক্তব্যগুলো শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে বিশেষ রেখাপাত করত। মাঝে চুটকি পরিবেশন করে সভার মেজাজটাকে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করতেন। তার অনেক বক্তৃতায় উত্তেজনার উত্তাপও পাওয়া যেত। শোষণ, বঞ্চনা, দুর্নীতি ইত্যাদির বিষয় বলতে গেলে দেখেছি এগুলোর বিরুদ্ধে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে ঘৃণা জাগিয়ে দেবার

পটুত্বও উনি অর্জন করেছিলেন। এমনিতে সভায় চুপচাপ বসে থাকতেন।

১৯৯৬ সালে স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী হিসাবে তাকে দেখেছি। তিনি যখন স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব নেন তখন চারদিক থেকে সংবাদপত্রে স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হত। তার সুযোগ্য পরিচালনায় ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বিভাগের কাজকর্ম বুঝে নিয়ে তিনি ঝুঁকি বহুল অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মানুষের সহানুভূতিকে নিজের অনুকূলে টেনে নিতে পেরেছিলেন।

১৯৯৬ সালে বিধানসভায় মশকের উপদ্রব নিয়ে খুব হৈচৈ হতে থাকে। ১৯৯৬ এর মার্চ মাসে বিধানসভায় একটি Calling attention-এর জবাব দিতে গিয়ে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে তার বিচক্ষণতা, সততা, কর্মতৎপরতা এবং সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টার বিষয়টি সবাইকে তুষ্ট করেছিল। তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই উপদ্রুত অঞ্চলে গরীব অংশের মানুষের জন্য ইমপ্র্যাগন্যাটেড মসকুইটো নেট বিতরণের ব্যবস্থা করেন। মশক উপদ্রুত অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করে কতগুলো বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গ্রাম-শহরে রক্তের নমুনা পরীক্ষা এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর দেন।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে জি বি হাসপাতালে ইনফেকশনের জন্য চোখের ছানি কাটার কাজ ব্যাহত হওয়ায় বিমল সিংহ তাৎক্ষণিক যে সিদ্ধান্ত নেন তাতে যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন হাসপাতালে ৩৫ জন রোগী চোখের ছানি কাটাবার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছানি কাটার পর ৯ জনের চোখে সংক্রমণ দেখা দেয়। বিমল সিংহ সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। তার গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে ভর্তি হওয়া রোগীদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। ইমার্জেন্সি অপারেশন ছাড়া সব রকম রুটিন অপারেশন বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানকার সব জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির সোয়াব নিয়ে সেগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। অপারেশন থিয়েটারকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অপারেশন থিয়েটারে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র বসানো হয়, সংক্রমণ হয়েছিল এমন রোগীদের সরকারি খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে কি কারণে এ সংক্রমণ ঘটল তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য একজন বেকটোরিওলজিস্টকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যক একটি কমিশন গঠন করেন। তদন্তের পর কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়।

একবার বিধানসভায় আগরতলা শিশু উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদস্যদের তরফ থেকে কিছু প্রশ্ন উঠে। বিমল সিংহ তখন নগরোন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বেও ছিলেন। বিধানসভায় তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে স্বামীজীর প্রতি তার শ্রদ্ধা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মূর্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটিও বিবৃত হয়েছে। তিনি সাহস করে বলেছিলেন, ১৯৭৬ সালে শিশু উদ্যানের একটি অংশে স্বামী বিবেকানন্দের যে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়নি। স্বামীজীর উন্নত শির ছিল অবনত। তাই এই মূর্তির পরিবর্তে পরবর্তী সময়ে স্বামীজীর ৯ ফুট ৬ ইঞ্চি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি কমিটির মাধ্যমে।

আগরতলা শিশু উদ্যানের সামনে যে বাস স্ট্যান্ডটি ছিল সেটিকে রাধানগরে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনাও ছিল তার। শিশু উদ্যানকে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল অংশের মানুষের ব্যবহারের জন্য একটি সুদৃশ্য পার্কে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন ছিল তার।

একবার থ্যালাসেমিয়া রোগীদের অভাব অভিযোগ নিয়ে তাকে কিছু কথা বলেছিলাম। বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন থেলাসেমিয়া রোগীরা রক্তের জন্য ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে এক বোতল ফ্রি ব্লাড পায়। দুঃখের বিষয় তাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আমরা বেশি দিন পাইনি। বোধন হবার আগেই রাক্ষসরা এসে মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে দিয়ে গেল। ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে তিনি চিরশয্যায় শায়িত হলেন। তাকে যতটা বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে কোন কাজকে করণীয় বলে মনে হলে তিনি তা না করে নিরস্ত্র হতেন না।

মন্ত্রী বিমল সিংহ স্বল্পপরিসর জীবনে যে কাজের সূচনা করেছিলেন তা ছিল যথার্থই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট। কমলপুর হাসপাতালটিকে তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

বিমল সিংহের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে দু'চার কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন. তাঁর প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসগুলো বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবার মত। তাঁর 'ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে', 'বসনের ঠাকুরমা', 'লংতরাই', 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা' প্রভৃতি লেখাগুলো সহজ সুন্দর ভাষায় নানা তথ্যের সন্ধান দেয়। তাঁর 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা' লেখাটিতে ফুটে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানেব বিশেষ করে তিতাস পারের জনজীবনের চিত্ররূপ। সেখানকার দাস, নমঃশূদ্র থেকে আরম্ভ করে সমাজে অবহেলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, কর্মব্যস্ত মানুষগুলো দু'মুঠো অন্নেব জন্যে যে কঠোব পবিশ্রম কবে তাব বিশ্বস্ত চিত্ররূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পে। সে সব অঞ্চলেব নিজস্ব সংস্কৃতি এবং তার ভাল মন্দ দিকগুলোকে তিনি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। যে সব অঞ্চলেব বর্ণনা তিনি করেছেন—এক সময়ে সে সব অঞ্চল ছিল আমারও বিচরণ ক্ষেত্র। সুখে দুঃখে জীবন চাবণ কবে করে মাটিব প্রতি মানুষের যে মমত্ববোধ গড়ে উঠেছিল—মাখনের দেশত্যাগী হবাব দৃশ্যে তা সুন্দব ভাবে দেখানো হয়েছে। দেশ বিভাজনজনিত কারণে মানুষের মনে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তা এলাকার প্রতিটি মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। মাখন স্থির

বিধানসভাব অধিবেশন শুরুব প্রাক্ মুহূর্তে

করেছিল যা কিছুই ঘটুক এ মাটি ছেড়ে সে কিছুতেই যাবেনা। কোথায় পাবে সে মানুষের এমন ভালবাসা, সহমর্মিতা, মুসলমান প্রতিবেশীরা তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল — আমরা তোমাদের রক্ষা করব। তোমরা যেওনা। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই ছুটছে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে। শেষটায় উপায়ান্তর বিহীন মাখনেরও ডাক এল। এক বন্ধু পত্র দিয়েছে— তোমার মাস্টারি পাকা চলে এস। একদিন বৃদ্ধা মায়ের হাত ধরে মাখন নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়ল। যাত্রাকালে ছেড়ে যাওয়া ভিটেমাটি, চেনা জানা পরিবেশ যেন তাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। তবুও বাঁধন ছিড়তে হল। প্রকম্পিত বক্ষে এক টিপরা ময়ালে গিযে সে পৌছল। সেখানেই তাকে থাকতে হবে। সেখানকার উপজাতি মানুষগুলো তাকে পেয়ে খুব উৎসাহিত। আশা তাদের ছেলে মেয়েরা এই মাস্টারের কাছে মানুষ হবে। তারা আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে, বাঁচবার আরও উপাদান দিয়ে মাখনের অভাব দূর করতে সচেষ্ট হল। এদের সম্বন্ধে যেসব রটনা সেগুলো মাখনের কাছে অলীক মনে হল। পারস্পরিক ভালবাসার টানে একদিন এই ত্রিপুরাই হয়ে উঠল মাখনের দ্বিতীয় মাতৃভূমি। প্রেম প্রীতি ভালবাসার অজস্র বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল মাখন। সেখানে মাখনকে কেন্দ্র করে নতুন আন্দোলনও গড়ে উঠল। উপজাতিদের মধ্যে তখন ছিল পুরোহিততন্ত্রের শোষণ। এরা প্রচলিত রীতি নীতি ভেঙ্গে মাখনকেই পুরোহিতের পদে বরণ করে নিয়ে চালাতে শুরু করল তাদের পূজা আর্চা। তিতাস পারে মাখনের মনে দোলা দিয়েছিল এক যুবতীর ভালবাসা। যুবতীটি প্রতিক্ষায় ছিল মাখন যদি একবারটি তাকে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু কোন উপায় ছিল না মাখনের। এখানে এসেও প্রেমমালার প্রেমে থরো থরো কেঁপে উঠেছিল মাখন। গল্পের লেখক কি চমৎকার ভাবে গল্পের উপসংহারে এসে বললেন, "মনে হয় তিতাস পাড়ের বহু বছর আগে হারানো মানিক নতুন পাছড়া পড়ে তারই পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।"

বিমল সিংহের 'বসনের ঠাকুরমা' গল্পটি বর্ণনার সৌকর্যে অত্যন্ত চমৎকার হয়ে উঠেছে। বসন রূপিনী পরিবারের শিশু। মা বাবা সবাই যখন জুমের কাজে চলে যায় তখন শিশু বসন বা বাঁশীরামকে রেখে যায় দুধ দোহানী বুড়ির কাছে। এই বুড়ি মেঘনা পারের লোক। সব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বড়মুড়ার কোলে। এই জাতি উপজাতির দুটি পরিবারের এত মেলামেশা, এত ঘনিষ্ঠতা যে শিশু বসন এই বুড়িকে নিজের ঠাকুরমা বলেই জানে। আবার মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটিও হয় তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। এমনি একটা কাণ্ড ঘটেছিল একটা ছাগী নিয়ে। ললিত রিয়াংয়ের বাড়ির ছাগী সুরেন দাসের বাড়ির সিম গাছ খেয়ে গেল। তবুও বুড়ি বুঝিয়ে শুনিয়ে ছাগলটিকে বেঁধে রাখবার পরামর্শ দিল। ছাগল বাঁধাও হলো কিন্তু আবার দড়ি ছিঁড়ে ছাগল গিয়ে সুরেনের বাড়ির ফসল নষ্ট করল। আবার দুটি পরিবারের মধুর মিলনও ঘটল। এভাবেই তাদের দিন কাটছিল। বিমল সিংহের ভাষায়, "মংকুরুই টিলার এমনি ধারায় বহে পাহাড়ী-বাঙালীর আবাদ বিবাদ সুবাদের কলরোল।" হঠাৎ লাগল দাঙ্গা। বুড়ি বাঁশীকে বুকে চেপে বেরোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে। চারদিকে দুম দাম শব্দ, আগুনের লেলিহান শিখা। বুড়ি ছুটছে শহরের দিকে। শিশুটা তার বুকে লেপ্টে আছে। তিন দিন পর পুলিশ কুশবনের খালের ধারে আবিষ্কার করল দুটো মৃতদেহ। একটা বর্শায় এক সাথে গেঁথে রয়েছে দুটি মানুষ। অসাধারণ এক গল্প।

দুর্ভাগ্য এই বিরাট সম্ভাবনাময় একটি জীবনে ছেদ টেনে দিল ঘাতকের নিষ্ঠুর হাতের বুলেট। একটি সম্ভাবনাময় জীবনের এভাবেই ঘটল অকাল অবসান।

বিমল সিংহ যেমন দেখেছি

দীপক ভট্টাচার্য

মুষ্টিমেয় যে ক'জন গল্পকারের লেখায় ত্রিপুরার জনজীবন, পাহাড়, নদী জীবন্ত হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে বিমল সিংহ তাঁদের অন্যতম। আজ থেকে পনেরো বৎসর আগে তাঁর 'বসনের ঠাকুরমা' আমাকে আকৃষ্ট করে। 'বসনের ঠাকুরমা'র চিত্রনাট্য তৈরী করার অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন। চিত্রনাট্য তৈরী হলেও নানা কারণে সে কাহিনী নিয়ে ছবি করা আজও হয়নি। একই গল্প নিয়ে আরো একজন ছবি করতে চেয়েছিলেন.। ফিল্ম ডিভিশনের সম্মতি পেয়েও তিনি সে ছবি করতে পারেননি বলে বিমলবাবু দুঃখ পেয়েছিলেন। সে সময় তাঁকে দেখেছি আত্মমগ্ন হয়ে 'লংতরাই' সৃষ্টি করতে। লংতরাইর পাদদেশ থেকে নিয়ে এসেছেন অচাই তলবাংহাকে। তাঁর থেকে জেনে নিচ্ছেন- কোন প্রহবে পাখীর ডাকের কি অর্থ। লংতরাই ঘিরে যে জীবন সে জীবনের কথা এব আগে বাইবেব মানুষের গোচরে আসেনি। সততার সংগে চেষ্টা করেছেন নিস্তবঙ্গ, বর্ণহীন, একঘেয়ে রিয়াং জীবনের ব্যথা, আনন্দ, প্রেমকে তাঁর 'লংতরাই' উপাখ্যানে ধরে রাখতে। লংতরাই লেখার প্রক্রিয়াটাতে ধীরে ধীরে জড়িয়ে গিয়েই 'লংতরাই'কে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণেব ভাবনা জেগে ওঠে। 'লংতবাই' চিত্রনাট্য তৈবী হয়েছে তখন পাণ্ডুলিপি থেকেই।

সাধাবণতঃ চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে কাহিনীকাবের কোন যোগাযোগ থাকে না। 'লংতবাই' ছবিব সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিজে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। প্রথমভাগের শুটিং-এ তিনি প্রতিদিন উপস্থিত ছিলেন। গ্রামবাসীবা শুটিং দেখতে এলে তিনি তাদের সংযত রাখতেন। হাসি তামাশা করে মাতিয়ে রাখতেন। ককবরক বলতেন মাতৃভাষার মতই। শুটিংএর প্রয়োজনে তাঁকে রিফ্লেকটার ধবতে হয়েছে। তাঁর মধ্যে যে অহংকার ছিলনা এটা সবাই স্বীকার করেন। আমরাও সেটা উপলব্ধি করেছি। সিনেমা ইউনিটের একজন সদস্যই ছিলেন। ইউনিটের

ত্রিপুরার প্রথম চলচ্চিত্র, নিজের লেখা 'লংতরাই' ছবির নায়ক নায়িকা ও অন্যান্যদের সাথে বিমল সিংহ, অনিল সরকার, বাদল চৌধুরী ও ছবির পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য।

অন্যান্য সদস্যদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন। এতে করে কাজটা ভালো ভাবে করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ব্যবহার তাঁকে সবার হৃদয়ের কাছে টেনে নিয়েছিল। অনেক পরেও তিনি যেমন ঐ সমস্ত টেকনিসিয়ানদের খোঁজ খবর করতেন তেমনি ওরা জানতে চাইত তাঁদের বিমলদার খবর। এরাজ্যে পরিকাঠামো তো নেই-ই এমনকি চলচ্চিত্র যে একটা ভিন্ন মিডিয়া সে কথাটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়েছে সেখানে অপেশাদার অভিনেতা, প্রায় অপরিচিত ভাষায় সম্পূর্ণ আউটডোর শুটিং নির্ভর চলচিত্র নির্মাণ করার অর্থ হল ঝুঁকি নেয়া। সারাজীবন বিমলবাবু এমন ঝুঁকি নিয়ে গেছেন। সফলও হয়েছেন। আভাঙ্গার ঝুঁকিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ। বিমল সিংহ এগিয়ে না এলে ত্রিপুরার প্রথম কাহিনী চিত্র আজ থেকে বারো বৎসর পূর্বে নির্মিত হতো বলে মনে করিনা। আজ এত বৎসর পরও চলচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁর 'ইঙে ল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে' অবলম্বনে আরো একটি ছবির পরিকল্পনা হয়েছিল। আরো অনেক পরিকল্পনার মতো তা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। তাঁকে নিয়ে অভিনয় করানোর আকাঙ্খা ছিল। কথাও হয়েছে। তা আর সম্ভব নয়।

'লংতরাই' ঘিরে যে জনপদ সেখানে তিনি কত জনপ্রিয় তা আমি দেখেছি। সে সময় টি.এন.ভি.সক্রিয়। তখনও তিনি টার্গেট। শুটিং-এর ব্যস্ততাব মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত তাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি। তবে জীবন সংশয় বোধ করিনি শুধুমাত্র বিমলবাবু উপস্থিত ছিলেন বলে। নিজের হাতের তালুকে মানুষ যেমন চেনে তেমনি লংতরাইর প্রতিটি মানুষকে তিনি চিনতেন। ঐ অঞ্চলে থেকে ঘুরে দেখেছি জাতি উপজাতি সবার প্রিয় বিমলদাকে। প্রতিটি মানুষের দরজা তাঁর জন্য অবারিত। তাঁর প্রিয় লংতরাইর পাদদেশে চিরনিদ্রায় চলে গেলেন বিমলবাবু। তাঁব হত্যা সংবাদ সমগ্র ধলাই উপত্যকা জুড়ে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তা শুধু কল্পনা করতে পারি। তবে তাঁর আদরের কিচিং যেমন পিতৃহারা হয়েছে তেমনি তলবাংহা। ভগীরথ, হাসমাই, যতীন্দ্র, প্রকারাই, ফাই ফি রুউ রিয়াং ও তাদের মত বহু রুগ্ন দারিদ্রে জর্জরিত লংতরাইর মানুষেরা হারিয়েছে তাদের কিচিং।

— রাজধানী আগরতলা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৮

পরিচালকের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্ত।

বিমল সিংহ ঃ অমলিন স্মৃতিমালা

ব্রজেন্দ্র কুমার সিংহ

বিমলের স্মৃতিচারণ আমাকে করতে হবে একথা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

বিমলের মৃত্যুসংবাদ আমি বিশ্বাস করতে চাইনি। ভেবেছি পরের বুলেটিনেই বলা হবে বিমলের মৃত্যুসংবাদ ভুল। বিমল বেঁচে আছে। ভাবতেই পারিনি এরকম একটা বিশাল মাপের মানুষের মৃত্যু ঘাতকের হাতে হতে পারে। প্রতিটি দরিদ্র, হতভাগ্য দুর্বল, অনাহারী, রোগক্লিষ্ট মানুষের জন্য যে মানুষ সারাদিন চিন্তা করে, শুধু নিজের ভাষা সংস্কৃতিই নয়, প্রতিটি দুর্বল ভাষা সাহিত্যের সেবায় নিবেদিত প্রাণ যে ব্যক্তি, তাঁকে কেউ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে পারে একথা কে ভেবেছিল। তাই তার মৃত্যুসংবাদে প্রতিটি মানুষ বিমূঢ় এবং শোকস্তব্ধ হয়ে ভেবেছে একি হলো। কে এই উন্মাদ রক্তপিপাসু।

এশিয়ান এজ পত্রিকায় একটা ছবি বেরিয়েছিলো। ছবিটা এই রকম- বিমলের একটা বিশাল পোস্টারের নীচে দাঁড়িয়ে একজন শাড়ি পরা হতদরিদ্র মহিলা নমস্কার জানাচ্ছে। সকল সম্প্রদায়ের সকল দুঃখী মানুষের বন্ধু ছিল বিমল। সকলের সুখদুঃখের আশ্রয় বিমল সিংহ। বিমল কোন বিশেষ সম্প্রদাযেব নেতা নয, সকলের নেতা। প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোক মনে করতো বিমল আমাদেবই লোক। আমাদের কথাই বেশি করে চিন্তা করে।

বহুদিন আমি তাঁর সম্পর্কে লিখতে পারিনি। এত কথা আছে বলার। প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনাও উজ্জ্বল হয়ে আছে স্মৃতিতে। তা ছাড়া বিমলের মতো একজন জায়েন্টের ছবি আমাদের মতো পিগমি কলমে আসবেও না।

বিমল তখন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ। আসামের নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারে এসেছে। আমি তাকে আমার বাড়িতে একদিন খেতে ডেকেছি। অনেক বাত করে এলো। কোন রকম আড়ম্বর করি এটা তার পছন্দ নয়। খুব সহজ তার ব্যবহার। কতদিনের আপন লোক, যেন পরিবারেরই একজন। সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো বিমল। সে বক্তা, আর আমি বিস্মিত শ্রোতা।

প্রয়াত বিমল সিংহ'র মৃতদেহেব পাশে মেযে কজালীন, ছেলে বিচার্ড সহ আত্মীয পরিজন।

একজন পূর্ণ সময়ের রাজনীতিবিদের পক্ষে সাহিত্যের এত খুঁটিনাটি খবর রাখা, এত পড়াশোনা প্রায় অবিশ্বাস্য। ভারতীয় সাহিত্য তার নখদর্পণে। আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনছি আর সরমে মরে যাচ্ছি। আমি তার তুলনায় প্রায় কিছুই জানি না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য সম্মেলন, বইমেলা এবং সাহিত্য একাডেমির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যতবারই ত্রিপুরা গেছি তাঁর অতিথি আমি। আমার থাকার কথা ছিলো অন্যত্র, কিন্তু বিমল জোর করে ধরে নিয়ে গেছে বাড়িতে। সকাল থেকে দলে দলে লোক আসছে নানা সমস্যা নিয়ে। সকলের সঙ্গে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলেছে আর সমস্যা সমাধান করে দিয়েছে। তাদের কথা মন দিয়ে শুনেছে, সকলকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেউ রাগ করলেও হাসিমুখে উত্তর দিচ্ছে। হ্যাঁ, বিমলের কাছে এসে রাগ দেখানো সম্ভব। কারণ বিমল ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী, বা সি পি এমে গুরুত্বপূর্ণ নেতা নয়। বিমল যে তাদের মানুষ। সকলের কাছে যারা অবহেলিত, বিমলের কাছে তারা মর্যাদা পেত। পাহাড়ের মানুষগুলিকে বিমল যত গভীরভাবে জানতো ততটা বোধহয় অন্যরা জানতে পারেনি। তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে বই লিখেছে, চলচ্চিত্র তুলেছে। তাদের গানের ক্যাসেট প্রকাশ করেছে।

জনজীবন সংক্রান্ত যা কিছু, লোকজীবন, লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতির প্রতি তার আগ্রহ ছিলো সারাজীবন। সেগুলো সংগ্রহ এবং চর্চাই ছিলো তার সাধনা। এই বিষয়ে তার কয়েকটি গ্রন্থও আছে। সেগুলো বিশেষজ্ঞের আলোচনা। তার সঙ্গে যৌথভাবে একটি প্রবাদের গ্রন্থও সম্পাদনা করেছি।

প্রবাদ গ্রন্থটির ভূমিকা লেখার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। বিমল আমাকে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতে বললো ভূমিকাটি। সেই দৃষ্টিকোণ আমাকে দিয়েছে এক নতুন আলোক। তাই সেই ভূমিকা শুধু আমার নয় আমার এবং বিমলের যৌথপ্রবন্ধ।

বিমলের সাহিত্যরুচি ছিল অসাধারণ। তাই যে কোনো কবি তাঁর কাছে বই উপহার দিতো। প্রতিটি বই পড়ে মতামত জানাতো বিমল। একদিন রাত প্রায় দেড়টা বিমলের ফোন এসেছে, আমার গিন্নিকে বলছে তাকে জাগিয়ে দিন। আমি জেগে থাকবো সে ঘুমোবে তা হতে পারে না। ফোনে আমার একটা বইয়ের প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি লাইন নিয়ে মন্তব্য করেছিলো সেদিন। আমি ধন্য।

আমি একটা গল্পের প্লট ভেবেছি। একজন কুকি যুবতী এবং যুবকের নাম দরকার। তারাই গল্পের অনুপস্থিত নায়ক-নায়িকা। একদিন বিমলকে জিজ্ঞেস করতেই দুটো মিষ্টি নাম আমাকে বলে দিলো।

বিমল ছিলো সুবক্তা তবে ডেমাগগ (Demagogue) নয়। তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতো হাজার হাজার মানুষ। আমি তাঁকে যখন তার বক্তৃতা নিয়ে ঠাট্টা করতাম সে প্রাণ খুলে হাসতো। তাঁর হাস্যরস বুদ্ধির দীপ্তিতে শাণিত তরবারির মতো ঝকমকে। গল্পের ভাণ্ডার ছিল বিরাট। যে কোনো ঘটনার জন্যই তাঁর ছিল একটা গল্প। রাজনীতি এবং মন্ত্রীত্ব তার হাস্যরস কেড়ে নেয়নি। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম যে লোকটা রাজ্যের হাজারো সমস্যা নিয়ে জর্জরিত সেই লোকটাই রাত জেগে পড়তো ভাষাতত্ত্বের মতো কঠিন বিষয়। খুব ভোরে উঠেই লোকজনের সঙ্গে দেখা করতো। সারাদিনের ব্যস্ততার পরে রাতে তার পড়াশোনা। এত পরিশ্রমের পরও তাঁর হাস্যরস জীবন থেকে উঠে যায়নি। হয়তো বা এই হাস্যরসই ছিলো তাঁর জীবনীশক্তি।

একবার কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে আগরতলা যাচ্ছি। ধর্মনগরে সেই রাতে বিমল এসেছে। আমি পথে নেমে পড়লাম। পরদিন তাঁর সঙ্গে একই গাড়িতে আগরতলা যাচ্ছি। পথে পথে তাঁর যাত্রা বিরতি। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতিটি জনবসতিতে গিয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধা

দেখছে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে। সমস্যাগুলো শুনছে। বিমলকে দেখে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। এতবড় বন্ধু সমমর্মী আর পাবে কোথায় তাঁরা। আগরতলা পৌঁছুতে রাত হয়ে গেলো।

অজস্র দেশ ভ্রমণ করেছে বিমল। সেইসব ভ্রমণ কাহিনী তার মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছে বলে গর্ব করি। এত সুন্দর করে নিজের অভিজ্ঞতা বলতে পারবে না আর কেউ।

আমি বাংলাদেশে গেছি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটা বক্তৃতা দিতে। সেখানেও অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে বিমলের কথা। শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করেছে তাঁর নাম। বাংলাদেশের মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তা দেখে আমিতো অবাক।

এখানেও যিনিই তার সম্পর্কে এসেছেন তিনিই তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, সম্মান করেছেন। দলমত বিরোধীরাও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের সম্মান করতেন। তাঁর সরসতায় ছিলেন মুগ্ধ।

একজন মানুষ সকল মানুষের জন্য ভাবতো বলেই সকল মানুষের হয়ে উঠেছিলো। জন্মসূত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী হয়েও বিমল ভেবেছে সকলেরই কথা। বিশেষ করে দুর্বল খেটে খাওয়া মজুর কৃষকের কথা। গরীব বিধবা, হতভাগ্য অনাথদের জন্য তার বিশাল বুকে বিশেষ স্থান ছিল। বিমল তার প্রশস্ত বুকে আগলে রাখতে চাইতো সকলকেই। তাই তার শেষকৃত্যের সময় হাজার হাজার লোক, সকল সম্প্রদায়ের লোক, জমায়েত হয়েছে, ফেলেছে চোখের জল। বিমলের মৃত্যুকে একজন নেতার মৃত্যু হিসেবে দেখেনি। দেখেছে তাঁদেরই পরিবারের একজনের মৃত্যু হিসেবে। বিমল যেমন সারাজীবন ভেবেছে তাদের কথা, তেমনি তাঁরাও তাঁকে নিজেরই লোক বলে ধরে নিয়েছে। প্রথমবার নির্বাচনের পর বিধানসভায় বিমল উত্থাপন করেছিল — ইটভাটার শ্রমিকদের সমস্যা এবং দুর্দশার কথা। শুধু ইটভাটা নয়, সকল শ্রমিকের সমস্যাই ছিলো বিমলের নিজের সমস্যা। এঁদের কথাই তার কথা।

তাঁর মৃত্যু মানুষকে নির্বাক স্তব্ধ অসহায় এবং হতচকিত করেছে। বিমলকে কেউ হত্যা করতে পারে একথা ভাবতেই পারেনি। উগ্রপন্থা জর্জরিত এই রাজ্যের কোনো মানুষকেই বিমল অবিশ্বাস করতো না। পাহাড়ি গ্রামে ওর সঙ্গে গেছি। সঙ্গে দেহরক্ষী নেই, আমি ভয়ে কাঁপছি, বিমল নিশ্চিন্ত মনে মোড়ায় বসে তাদের সঙ্গে গল্প করছে। তার সরকারি বাসভবনে যে কোন শ্রেণীর মানুষ আসতে পেরেছে। দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে চলাফেরা করতো না বিমল। বলতো সাধারণ মানুষই আমার দেহরক্ষী। আমি মানুষের ক্ষতি করিনি। কেউ আমাকে কিছু করবে না। আমি তাদেরই লোক। মানুষের উপর এতটা বিশ্বাস ছিলো তার। আমার এক আত্মীয় ত্রিপুরায় একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বিমলের নাম করে প্রাণে বেঁচেছিলো। বিমলের আত্মীয় বলে তাকে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হলো। হঠাৎ এ কী হলো। ঘাতকের নির্মম বন্দুকের নল বিমলের বিশাল প্রাণকে শেষ করে দিলো এক মুহূর্তে। তাঁর শোকসভায় এসেছে সকল দলের মানুষ। সকলেরই মুখে একটাই প্রশ্ন বিমলকে কে হত্যা করলো। কেন ? সেই কেনর উত্তর আমরা জানি না। বারুদের ধোঁয়ায় আমাদেব চোখ মুখ বক্ষ এবং হৃদয় আচ্ছন্ন।

আমি তাঁর শোকসভায় কান্নায় ভেঙে পড়ে কিছুই বলতে পারিনি। আজও এই কলোসাসের (Colossus) দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না। বিমল অনেক বড়, অনেক মহৎ, অনেক বিশাল। তার বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়। কিছুই বলা হলো না বিমল সিংহ সম্পর্কে।

--বিমল সিংহ স্মৃতি তর্পণ ১, ১৯৯৯, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ

উত্তর-পূর্বের জন্য নিবেদিত এক বিরল ব্যক্তিত্ব বিমল সিংহ

নীতিশ ভট্টাচার্য

১৯৭৮ সালের কথা। আসাম বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছে। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী হাওয়ায় কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আসর সরগরম হয়ে পড়ে। হাইলাকান্দিতেও নির্বাচনী উত্তাপ তুঙ্গে উঠে। দুই কংগ্রেস ছাড়াও কেন্দ্রের শাসক জনতাদল এবং তাদের সমর্থক সি পি এমের প্রার্থী নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ। সবদলের ভি আই পি নেতারা সভা করে যাচ্ছেন। জনতাদলের হয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আভা মাইতি, রেণুকাদেবী বড়কটকী, সাংসদ সমর গুহ, কংগ্রেস (ই) দলের হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, সি পি এমের পক্ষে জ্যোতি বসু প্রমুখ হাইলাকান্দিতে দলীয় প্রচারে সফর করে গেছেন। ত্রিপুরার একটি লোক সি পি এম প্রার্থী দীপক ভট্টাচার্যের পক্ষে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রতিটি লোককে কথায় মোহিত করে যাচ্ছে। কে এই লোকটি? দেখা হলো ওর সঙ্গে, আলাপ হলো দীর্ঘক্ষণ। প্রত্যয়ের সঙ্গে লোকটি জানালো দীপকবাবু জিতছেন। যেখানে গেছেন, সেখানেই সাড়া পেয়েছেন অভূতপূর্ব। বয়সে তরুণ এই সি পি এম কর্মী বিমল সিংহ যে পরবর্তীকালে বড় নেতৃত্বে পৌঁছবেন সেটা সেদিনই আঁচ করা গিয়েছিলো। প্রথমদিনের আলোচনায় এক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিমল সিংহের মধ্যে তখনই প্রখর ব্যক্তিত্বের লক্ষণ দেখা যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, জাতীয় রাজনীতি তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপট নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করতেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিতে এক জটিল পরিস্থিতির অশনি সংকেত তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠতো। কখনো বিষণ্ণ বোধ করতেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে না পারলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনার কথাও তিনি বারংবার উল্লেখ করতেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার বাইরেও মানুষটির বিচরণ — তা সহজে বোধগম্য হবে না। একান্ত আলাপচারিতায় দেখা গেলো বাংলা ও ককবরক সাহিত্যের ওপর তাঁর অগাধ দখল। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নখদর্পণে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের খোঁজ-খবর ভালই রাখতেন। নিজের মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যের অন্দরমহলের খবরও তাঁর কাছে ছিলো। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা স্বীকৃতি পাচ্ছে না বলে তিনি কখনো হতাশা বোধ করতেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ টেনে বলতেন— নিজের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। বিচলিত হলে চলবে না। বিমলবাবু কিন্তু পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্যে আপন অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠনের ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৯৭৮ সালেই ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে উপাধ্যক্ষের পদলাভ করেন। নৃপেন চক্রবর্তী তখন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি বরাক উপত্যকায় এসেছেন। তখনো তাঁর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমতার আসনে

অধিষ্ঠিত হলেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা তিনি ভুলতে পারেননি। বারবারই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি বৈষম্য এবং ফলশ্রুতিতে তরুণদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে এবং এর পরিণতি সুখকর হবে না বলে উল্লেখ কবতেন। ত্রিপুরা সবকারের মন্ত্রী হয়ে তিনি উত্তর-পূর্ব পরিষদ এবং দিল্লীতে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তাব উদ্বেগ ও অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত দেবগৌড়া সবকারের আগে কোন কেন্দ্রীয় সরকারই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আবেগের প্রতি মূল্য দেয়নি। বিমল সিংহ ১৯৭৮-৭৯ সালে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন, তার যথাসময়ে মূল্যায়ণ করে আবশ্যকীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি রাশ টেনে রাখা সম্ভব হতো।

ববাক উপত্যকায় বিমল সিংহ বহুবাব এসেছেন। দলীয় কাজে, সবকারি কাজে যখনই এসেছেন, তখনই সুযোগ পেলে প্রশাসনিক ও বাজনৈতিক দৃষ্টিব বাইবেও বিচরণ করতেন। কয়েকবাবই আমাব সঙ্গে যোগাযোগ ও কথাবার্তা হযেছে। আসামে বাঙালীদেব অবস্থা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। ববাক উপত্যকাব সমস্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সহ নানাবিধ চিন্তা তাঁব মধ্যে ছিল। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা কবতেন গভীবভাবে। ববীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ বারবার তুলে ধবতেন। ত্রিপুবার মানুষকে এবং তাঁকেও ববীন্দ্রনাথ আচ্ছন্ন করে বেখেছেন — সেটাও উল্লেখ কবতে ভুলতেন না। সি পি আই (এম) দলেব নিষ্ঠাবান কর্মী হযেও তিনি কিন্তু অন্যান্য দলেব কর্মীদেব প্রতিও শ্রদ্ধাব ভাবই পোষণ কবতেন। বলতেন — বাজনৈতিক লড়াই মযদানে, সামাজিক সম্পর্ক, পাবস্পবিক ভ্রাতৃত্ববোধ অবশ্যই বজায বাখতে হবে। মনে পড়ছে — একবাব জাতীয় প্রচাব কমিটিব (এন সি সি) সভায ত্রিপুবা থেকে তিনিও এসেছেন। ববাক উপত্যকা থেকে উক্ত কমিটিতে (উঃপূ) আমবা চাবজন ছিলাম। আমি, শিলচবেব অবিনাশ ভট্টাচার্য,

দুই পুত্রেব মৃতদেহেব পাশে পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ, মাতা পূর্ণিমা সিংহ ও কমবেড বঞ্জিত ঘোষ।

করিমগঞ্জের মতিলাল চক্রবর্তী এবং আরেকজন সম্ভবত বদরপুরের রেলশ্রমিক নেতা (নামটা মনে পড়ছে না)। সি পি আই (এম) আদর্শের অনুরাগী অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সেখানে উপস্থিত। আমি তার ব্যতিক্রম। অবশ্য বামপন্থী কোন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও আজ অবধি আমি বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। যাক্ ঐ সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি খোলামেলা বক্তব্য রাখেন । ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অনেকটা পেছনে রয়েছে, এর কারণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানেও দেখা গেছে—এই অঞ্চলের প্রতি গভীর মমত্ববোধ রয়েছে। উত্তরপূর্বের প্রতিটি রাজ্যের সমস্যাবলী, যুবকদের প্রত্যাশা এবং বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে — এর প্রতিকারের জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলতেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি অবহিত ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। আসামেও কৃষকসভার বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি এসেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে ভাবতেন। কৃষক আন্দোলন দুর্বল থাকায় কৃষকদের অনেক সমস্যারই সমাধান হয় না বলে আক্ষেপ করে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। কৃষক সমাবেশে অবশ্য আমার উপস্থিত থাকার কথা নয়। তবে সাংবাদিক হিসেবে কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব একবার জানার সুযোগ হয়েছিল। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলটির কৃষিজীবী মানুষের দুঃখ দুর্দশার জন্যও তিনি বেদনাবোধ করতেন। শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষকসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের স্বার্থেই তিনি রাজনীতির অঙ্গনে এসেছিলেন এবং সি পি আই (এম) দলের মাধ্যমে এই রাজনীতিকে ফলপ্রসু করার প্রচেষ্টা আমৃত্যু করে গেছেন।

ত্রিপুরার একজন সাধারণ মন্ত্রী হয়েও বিমল সিংহ বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তর-পূর্বের একজন প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় কিংবা দিল্লীতে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যখনই গেছেন, তখনই এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে। কখনো তিনি নতজানু হননি, কর্তব্যে থাকতেন অবিচল। এরকম একজন মানুষকে বিপথগামীরা নৃশংসভাবে খুন করবে — এ ভাবাই যায় না। কারণ এই মানুষটি বিপথগামীদের অন্তরের ব্যথাকেও যথেষ্ট সম্মান জানাতেন এবং ঐসব বিপথগামী যুবকদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমও করেছেন। তথাপি এই পরিপূর্ণ মানুষটির প্রাণ এই সন্ত্রাসবাদীরা অকালে ছিনিয়ে নিল। এরফলে ক্ষতি শুধু বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের নয়, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষিক গোষ্ঠী অবশ্যই তাঁদের একজন যোগ্য অভিভাবককে হারালো। অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম এই প্রবক্তার প্রয়াণে আমাদের এই অঞ্চলবাসীরই সামগ্রিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ বছর ৩১ মার্চ বিমল সিংহের মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হলো। ১৯৯৮ সালের ঐ দিনটিতেই সন্ত্রাসবাদীরা বিমলবাবুকে খুন করেছিলো। কিন্তু তাঁর আবেগ, অনুভূতি এবং আদর্শকে খুন করা সম্ভব হয়নি। নানা জাতি ভাষা ও ধর্মীয় গোষ্ঠী অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিমল সিংহের কর্মনিষ্ঠা ও চিন্তাধারার ব্যাপক প্রতিফলন ঘটালে যেমন সমগ্র অঞ্চলের মঙ্গল সাধিত হবে, তেমনি বিমল সিংহের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন হবে যথার্থ।

—বিমল সিংহ স্মৃতি তর্পণ -১, ১৯৯৯, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ

ত্রিপুরার ফিদেল কাস্ত্রো

সুনীল দেবনাথ

ভারতবর্ষের রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ আরো একটি কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। এক দৃঢ়চেতা-তেজদীপ্ত সংগ্রামী পুরুষের বুক ঝাঁঝরা করে দিলো গণতন্ত্রের শত্রুদের নিক্ষেপ করা এক ঝাঁক বুলেট। বীর শহীদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হলো আভাঙ্গায় ধলাই নদীর শুষ্ক বালুচর। আর লাল হলো তারই প্রিয় নদী ধলাই-এর জলরাশি। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীর বুকে দানবের আস্ফালন আর এ কে রাইফেল ও কার্বাইনের গর্জনে কেঁপে উঠল নদীর তপ্ত বালুরাশি। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরার বুক থেকে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল এক বীর ও তারই সহোদব ভাই। বলছিলাম ত্রিপুরার ফিদেল কাস্ত্রোর কথা । এ নামেই তিনি সর্বাধিক পবিচিত ছিলেন তার অন্তবঙ্গ মহলে। ত্রিপুরাব জাতি উপজাতিব মধ্যে মৈত্রীর সেতু বন্ধনকারী, বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনেব প্রথম সারির নেতৃত্ব, সাবল্য ও অসম সাহসের প্রতীক কমরেড শহীদ বিমল সিংহেব কথা। সি. আই টি ইউ'ব. সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি, বাজ্য কমিটিব অন্যতম সহ -সভাপতি, প্ল্যান্টেশন ওযার্কার্স ফেডাবেশনের সর্বভাবতীয় কমিটির অন্যতম নেতা, কমরেড বিমল সিংহ প্রযাত একথাটা যেন আজো অবিশ্বাস্য । এই সেই বিমল, যিনি ছিলেন চা শ্রমিক, বর্ডাব বোড শ্রমিক, বাগিচা শ্রমিকদেব বুকের হৃদপিন্ড। ষাটের দশকের শেষ ভাগে গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনেব মাধ্যমে যাব আত্মপ্রকাশ সেই কমরেডের ছিল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধাবণ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে মেলাব এক আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা। খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষেব বুকেব গভীরে ছিল তার স্থান।

কমলপুর বিধানসভা থেকে পবপর পাঁচবার নির্বাচিত কমরেড বিমল ছিলেন আমাব সহপাঠী, আমাব অত্যন্ত নিকট বন্ধুদেব মধ্যে অন্যতম। আজ মনে পড়ে ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলোর কথা । কমরেড বিমলকে দু'দুবাব কলেজেব সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত কবতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমাদেব । সেই শুরু। এরপর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি।
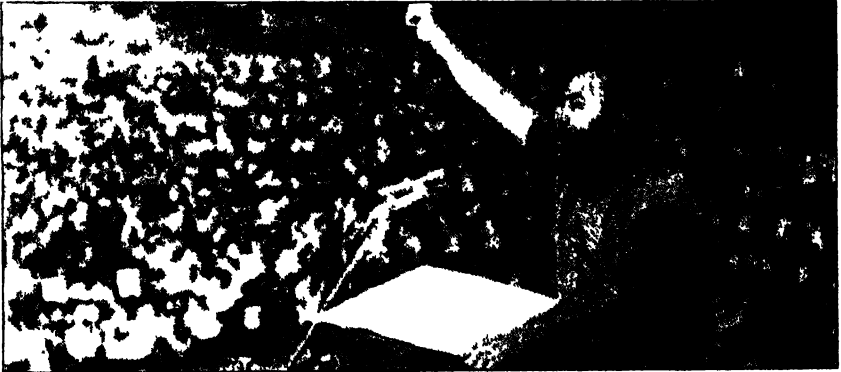
কমলপুর কালীবাড়ী মাঠে বিমান বসুর উপস্থিতিতে সভায় ভাষণরত বিমল সিংহ।

সেই বিমলকে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মিলনের রূপকার হিসাবে। বিশেষতঃ ধলাই জেলার সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণে তার বিশেষ ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। আজ মনে পড়ে ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসের কথা। কমলপুর মহকুমার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব তথা মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির বিভাগীয় সম্পাদক কমরেড রঞ্জিত ঘোষের অপহরণের কথা। রঞ্জিত ঘোষের মুক্তির দিন পর্যন্ত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কমরেড বিমলকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে দেখেছি। সেই সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে উগ্রপন্থী কবলিত অবস্থায় ঘোষের জীবনহানীর আশঙ্কা প্রকাশ করায়-কমরেড বিমল আমাকে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ও সরল ভাষায় বলেছিলেন "চিন্তাই করিও না। রঞ্জিতরে মারবার সাহস তারার নাই।" কি প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস আর কি প্রচন্ড সারল্যের অধিকারী হলে পরেই এ ভাবে বলা যায়। আজ ভাবছি আর বুকটা মোচর দিয়ে উঠছে। এই প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস আর সরলতাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেল।...... সাম্রাজ্যবাদীদের কুৎসিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করে বেঁচে আছে যে সমাজতান্ত্রিক কিউবা, সেই কিউবার প্রিয় জননেতা ফিদেল কাস্ত্রো যেমন লড়াই করেছেন কিউবাকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে, ঠিক তেমনি আমাদের ত্রিপুরার ফিদেল কাস্ত্রোও ছিলেন ভারতবর্ষের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অগ্রণী ভূমিকায়। তাই বোধহয় তাঁকে এভাবে অসময়ে সরিয়ে দিল তারা। কিন্তু তারা জানে না যে কমরেড বিমলের প্রতিটি রক্ত বিন্দুকে সাক্ষী রেখে আজ ত্রিপুরার প্রতিটি পাহাড়ে, জনপদে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক অনেক নতুন ফিদেলের। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে কমরেডের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্যে। সমাজ পরিবর্তনের আগামীদিনের কন্টকাচ্ছন্ন পথে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ নিতে হবে আমাদের। সংহতির সূর্য কমরেড বিমল সিংহের আত্মদান বিফল হতে পারেনা। বিমল সিংহ আজ ইতিহাস। তাঁর অনবদ্য আত্মত্যাগ, দেশ সেবা, সাহিত্যকর্ম আজকের দিনে সত্যিই বিরল।

কমরেড বিমল ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক। ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের আধুনিকীকরণে ও সর্বাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার প্রসারে তাঁর চিন্তা, চেতনা ও অগ্রণী ভূমিকা ত্রিপুরাবাসী মনে রাখবে চিরকাল। সৃজনশীল সাহিত্যকর্মেও ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। রাজ্যের প্রথম সারির সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার প্রসারে প্রকাশিত হয়েছে তার একাধিক গল্প। ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া আদিমজাতি রিয়াং সম্প্রদায়কে নিয়ে, তাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, আচার আচরণ নিয়ে তার লেখা উপন্যাস "লংতরাই" এক অমর সৃষ্টি। যা পরবর্তী সময়ে কাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়।.....

আজ ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি বিপন্ন। এই জাতীয় সংহতি ধ্বংসের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দরকার জোরদার গণ আন্দোলন। আর এই গণ আন্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়াত কমরেড বিমল সিংহের প্রদর্শিত পথ নিশ্চয়ই আমাদের আলো দেখাবে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কমরেডের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দৃঢ় শপথই হবে ওর প্রতি আমাদের ভালবাসার নির্দশন। কমরেড বিমল সিংহের আত্ম বলিদান বৃথা হতে পারে না। ত্রিপুরার জাতি উপজাতির একতা রক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব নতুন ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে সফল করা। শহীদের মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তই হোক আমাদের আগামীদিনের চলার পাথেয়।

— স্মরণিকা, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি,

২৪তম কমলপুর বিভাগীয় ৭ম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ৭ জুন, ১৯৯৮

বন্ধু বিমল ঃ যতদূর মনে পড়ে
কাঞ্চন কুমার সিংহচৌধুরী

যে বন্ধুর সান্নিধ্যে আমার জীবনের এতপথ, শৈশব থেকে আজ অবধি যার প্রভাবে জীবন গড়ার প্রেরণা পেয়েছি সে হল কমরেড বিমল সিংহ। বন্ধুবর বিমলের স্মৃতি জড়ানো নানা কথাগুলি আজও জীবন্ত আমার প্রাণে। মন যখন সারাদিনের পরিশ্রমে, সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন বন্ধুবর বিমলের ছোট ছোট ঘটনাগুলো মনের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে, ক্লান্তি কেটে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যোগায়। জীবনে অনেক বন্ধুর সাহচর্য পেলেও বন্ধু বিমলের স্থান ছিল শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। দীর্ঘ সময়ে তার সাথে চলায় নানা ঘটনার সাক্ষী আমি, সেসব ছোটছোট ঘটনাগুলোর জন্য সে আমার মনে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দখল করে নিয়েছে। বন্ধু হারানোর ব্যথা তাই আমাকে সবসময় পীড়িত করে।

বন্ধু বিমল ছিল জাতপাত, বর্ণবাদ বিরোধী। অ-সাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল সে। যেকোন মানুষের সাথে সহজে একাত্ম হয়ে যেতে পারত। সুফিয়া, রমজানের মার হেসেলঘরে ঢুকে খাওযা থেকে শুরু করে পরিবেশন করা পর্যন্ত। তাব সাথে সামসুল, নুনু মিঞাদের ঘরে কতো খেয়েছি, সময় কাটিযেছি তার ইয়ত্তা নেই। সাম্প্রদায়িকতার বাধা সে কোনদিন মানত না। তাঁর সাথে থেকেই নিমন্ত্রণ অ্যাপ্যায়নে প্রাণ খুলে খাওয়া দাওয়া করতে অভ্যস্ত হয়েছি। তার এই দূরদর্শী সচেতনতার কারণেই কমলপুরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে এসেছে বিরাট পরিবর্তন।

বিমলের সান্নিধ্যের লোভ আমরা সামলাতে পারতাম না। বিশেষ করে আমি আন্তরিক অপেক্ষায় থাকতাম কখন তাকে পাশে পাব বলে। পাশে পেলে সব ভুলে তার সাথে ভেসে যেতাম। তার দূরন্ত গতির সাথে তাল মিলিয়ে ছুটতাম। আমার মনের নানা অজানা কথা প্রশ্নের আকারে তুলে দিতাম। একেক করে জ্ঞানের অপরিসীম ভাণ্ডার থেকে উজাড় করে শ্রুতিমধুর ব্যাখ্যায়, উপমায় হৃদয়গ্রাহী করে বুঝিয়ে দিত। ভোর থেকে রাত্র—বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত জনসংযোগমূলক কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত আলোচনা। সাহসী, প্রত্যয়ী, দৃঢ়চেতা, সাধারণ গরীব মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু ছিল বিমল। জাতি-উপজাতি, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান-বৌদ্ধ সকল অংশের মানুষের হৃদয়ে "আমাদের বিমল" কথাটি বহু আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার বিনিময়ে জীবন্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, মণিপুরী, ককবরক — সকল ভাষায় সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। শুধু ভাষা নয়, সকল অংশের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আদি ইতিহাস নিয়ে সম্যক জ্ঞান ছিল। সাহিত্যেব আঙ্গিনায়ও ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে ঐসব অংশের মানুষের জীবনেব প্রতিছবি বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁর বন্ধুত্বের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল।

মনে পড়ে, ১৯৭১ সালে কৈলাসহর কলেজে পড়া চলাকালীন ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে বিমল। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনেও যুক্ত হয় যা পরবর্তীতে জীবন গঠনে ও মজবুত সংগঠন তৈরীতে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিমলের মামার বাড়ি কৈলাসহরে হওয়াय কলেজে ভর্তি হতে কৈলাসহর যাওয়ার সুবাদে বিমলের বাবা ঁলক্ষ্মীকান্ত সিংহ বন্ধু বৈদ্যনাথ মজুমদারকে একটি চিঠি লিখে বিমলের প্রতি নজর রাখার অনুরোধ করেন। জীবনারম্ভে বিমল এই সর্বত্যাগী আদর্শবাদীর সান্নিধ্যে পৌঁছার সুযোগ পেয়ে যায়। বিমলের মাঝেও তিনি সম্ভাবনার উর্বর বীজ

আছে বলে চিনে যান। গুরু যথাযথ পাওয়ার ফলে সুপ্ত সম্ভাবনা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়। কলেজের সহপাঠী ও সহযোদ্ধারা তাকে একান্তে কাছে টেনে নেয়। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র সংগ্রামের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। সমাজ পরিবর্তনের তীব্র বাসনা অঙ্কুরিত হয়। গুরুর সান্নিধ্যে থেকে চা-শ্রমিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ! চা-শ্রমিকদের মজুরীসহ বঞ্চনার অবসানে, জুলুমের প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল বারবার। বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তৎকালীন সময়ে লেভীর জুলুমের প্রতিবাদে কুমারঘাটে রবীন্দ্র মালাকারকে পুলিস গুলি করে হত্যার ঘটনায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে সংগ্রামী আন্দোলনের ডাক দেয়। বিপুল অংশের সাধারণ মানুষ তার এই ডাকে সাড়া দেয়। ১৯৭১-এর যুদ্ধের ফলে আগত শরণার্থী ও বিপন্ন মানুষের বন্ধু হিসাবেও বিমল সেদিন বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল।

বিমলের সাথে পায়ে হাঁটা পথে কত না প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছি। ক্ষণিকের জন্যও আমাদের মনে ক্লান্তি গ্রাস করেনি। একবার আমরা যাব ধনসিং রোয়াজা পাড়ায়। হরিণছড়া গাড়ি রেখে পায়ে হাঁটা পথে পথ ভুলে চলে গেছি ধৃষ্টরাম রোয়াজা পাড়া। তখন জোট আমল ত্রিপুরায়। ধৃষ্টরাম টি. এন. ভি-র দুর্গের মত, কাছে যেতেই বিমল বুঝে যায় ভুল জায়গা। বিমল কিন্তু ফিরে না গিয়ে ধৃষ্টরাম রোয়াজা পাড়ার চৌধুরীকে ডাক দেয়। বলে, তোমাকে না দেখে যাই কি করে। তোমার সাথে কথাবার্তা বলে ফাঁড়িপথে ধনসিং যাব। চৌধুরী বেজায় খুশী হয়। ককবরকে কথাবার্তা হয়। তখন এ ডি সি ভোট। মিটিং করে ভোটের প্রচারও সেরে নেয় বিমল। লাভ হল আমাদের পথ ভুলে। তারপর চৌধুরী পথ দেখানোর জন্য নিজের ছেলেসহ কয়েকজনকে সাথে দেয়, আমরা প্রায় সন্ধ্যায় পৌঁছাই ধনসিং রোয়াজা পাড়া। ওখানে পৌঁছে দেখি, সুরেন্দ্র রিয়াং মিটিং সেরে চলে আসছে। বিমল কিন্তু ফিরে যেতে চাইল না। সে ধনসিং এর মায়ের সাথে দেখা করবে বলল। চারিদিকে খবর পৌঁছে গেল বিমলদা আসছে। অনেক লোক জমায়েত হল। মিটিং হল। এদিকে ধনসিং-এর মা বিমলের অপেক্ষায়। উনার বিশ্বাস বিমল আসবেই। বিরাট জবার মালা গাঁথল বিমলকে পরাবে বলে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য — বিমলের গলায় মালা পরিয়ে বৃদ্ধা বিমলের সর্বঅঙ্গ হাতিয়ে আশীর্বাদ করছে বেঁচে থাক বাবা বলে। আর বিমলকে তখন, দাঁড়িভরা চেহারায় গৌরবর্ণের এক সুপুরুষ কাপালিকের মতো লাগছে। সেই ছবি ভাসে আজও আমার স্মৃতিপটে। একবার যাব গোবিন্দবাড়ি। রওনা দিলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাওয়া হল না। অনেক হেঁটে থালছড়া পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে আসতে হল। উপজাতি নেতৃত্ব নিরঞ্জয় ত্রিপুরার সাথে কথা বলে ফিরে এলাম। আরেকবার গণ্ডাছড়া যাবে সে আগরতলা থেকে খবর পাঠাল, "রেডি থাকবি, রাত্রে আসব, ভোরে গণ্ডাছড়া যাব।" আমি বললাম, "ঠিক আছে, আমি যেতে রাজি আছি, তুমি তোমার কাজ করবে, আমাকে কিন্তু জলাশয়ে নৌকা চড়াতে হবে।" বিমল রাজি হল। আমি, প্রশান্ত দেববর্মা, উপেন্দ্র দেববর্মাসহ সবাই বিমলের সাথে গণ্ডাছড়া গেলাম। কাজ সেরে, বিমল বনবিহারী সাহাকে বলল, 'মনাদা, আমার খুড়াকে (এ নামেই আমাকে সবসময় ডাকত) নৌকা চড়াতে হবে।" সাথে সাথে ব্যবস্থা হল। নারিকেলকুঞ্জ পর্যন্ত স্পীড বোটে — আমরা ও সিকিউরিটি গার্ড দুই নৌকায় রাইমা ছড়া ধরে সি আর পি এফ ক্যাম্পের পাশ দিয়ে নৌকায় উঠলাম। দারুণ উপভোগ্য ছিল তা। আমি কবির পংক্তিগুলো মুখে আওড়ালাম, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ ভ্রমণে, রাজেন্দ্র সংগমে।"একথা শুনে বিমল ক্ষেপে উঠল, বলল, "খুড়া তুমি এত দীন নও, আর

আমি তোমাব বন্ধুমাত্র।" ব্যাস, দু'জনেব মধ্যে বিতর্ক শুরু হযে গেল। আমবাসায পৌছে আমাকে কমলপুবে পাঠানোব ব্যবস্থা কবে সে আগবতলায চলে গেল, সে বাতেই। আব আমি প্রকৃতিব সৌন্দর্যেব তৃপ্ততায মুগ্ধ হযে বাড়ি ফিবে এলাম। বিমলেব সান্নিধ্যেব যে কত অভিজ্ঞতা তা লিখে শেষ নেই।

মোহনপুবে বাঁধ ভাঙ্গনে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষেব সাথে অক্লান্ত শ্রমেব কথা মনে পড়ে আজও। গ্রাম ও মানুষ বাঁচানোব সফলতাব হাসিঝবা মুখেব ছবি মানুষেব প্রাণে বেঁচে আছে আজো। কুবমায আটকে পড়া বিচ্ছিন্ন কযেকটি সংখ্যালঘু পবিবাবকে বাঁচাতে টিউবে দড়ি বেঁধে এপাব ওপাব কবে লোকগুলোকে বক্ষা কবা হয বিমলেব নেতৃত্বে যা আমাকে আজো প্রেবণা যোগায। মলযা গ্রামেব বন্যাবিধ্বস্ত চেহাবাকে প্রাণদান কবতে বিচলিত আর্ত মানুষেব পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন বেসবকাবি প্রতিষ্ঠান যেমন বামকৃষ্ণ মিশন, ভাবত সেবাশ্রম সংঘেব কাছে আবেদন, ওদেব পাশে থেকে অক্লান্ত শ্রমেব ছবি কখনো ভুলবাব নয। পাশাপাশি প্রশাসনিক উদ্যোগে বন্যাত্রাণেব ব্যবস্থা, বাঁধ সংস্কাব, বাড়িঘব পুনঃনির্মাণ ইত্যাদিব মধ্য দিযে বন্যার্ত মানুষদেব পাশে দাঁড়িযেছিল বিমল। মহাবীব চা-বাগান ও পার্শ্ববর্তী উপজাতি এলাকায একটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র কবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে পবিস্থিতিকে শান্ত ও সম্প্রীতিব বন্ধনে আবদ্ধ বাখতে গুরুত্ব দিযে উদ্যোগ নেয বিমল। সমস্যা সমাধানে তৎকালীন স্ববাষ্ট্রমন্ত্রী সমব চৌধুবীসহ বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে এনে বাগান শ্রমিক ও এলাকাবাসী উপজাতি মানুষেব শান্তি মিটিং এ বিশেষ ভূমিকা নিযেছিল, যা আমাব সর্বদা স্মবণীয।

বিমলেব উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসিকতা ছিল জন্মগত। স্বকীয ওই ভাবধাবণাতে মুগ্ধ হত সবাই। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি নানা ঘটনায ও সাবলীলভাবে বেঁচে যেত অবলীলায। ওব প্রখব বুদ্ধিব কাছে হাব মেনেছি বাববাব। একবাব সে সবেমাত্র কমলপুবে পৌছেছে। ঠিক এমনসময সীমান্তেব ওপাব থেকে গণ্ডগোলেব আওযাজ শুনতে পায। খবব নিযে জানতে পাবে, ভাবতবর্ষেব বাবৰি মসজিদ ধ্বংসেব প্রভাবে ওপাবেব মুসলিম মৌলবাদীবা এক হিন্দু মন্দিবেব উপব চড়াও

কমলপুবেব মলযা গ্রামে বন্যায ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেব সাথে বিমল সিংহ।

হয়েছে এবং হিন্দুদের প্রতি আক্রমণের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে। বিমল প্রমাদ গোণে। সে দ্রুত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছুটে যায়। ওপারে বুদ্ধিজীবী ও নেতৃত্বদের কাছে সর্বনাশা পরিণতির কথা সীমান্তের এপার থেকে ওপারে গলা চড়িয়ে চীৎকার করে বলতে থাকে। এতে দারুণ কাজ হয়। ওর কথায় আকৃষ্ট হয় সবাই। সে যাত্রায় ওপারের বাগান অঞ্চলের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের সংখ্যালঘু মণিপুরী হিন্দুরা রক্ষা পায়। বিমলের মৃত্যুর পর শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ওপারের হাজার হাজার মানুষ চোখের জল নিয়ে সীমান্তের কোন বাধা না মেনে হাজির হয়েছিল। বিমল বিশ্ব মানবতার প্রতীক হিসাবে আজও বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত।

বিমলের অবাধ বিচরণ ছিল কলকাতা, আসাম, মণিপুরসহ অনেক রাজ্যে। এছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও বিমলের পদচারণা ছিল অহরহ। হায়দ্রাবাদ সি আই টি ইউ সর্বভারতীয় সম্মেলনের 'বিমল সিংহ মঞ্চ' নামখানি অলংকৃত ছিল বিমল সিংহের মৃত্যুর পর। বিমল সি আই টি ইউ-এর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ছিল। অনেক রাজ্য প্রতিনিধির মুখে বিমলকে নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। বিমলের মৃত্যুর পর, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর সম্মেলনেও বিমলের প্রতিষ্ঠার ছবিটা হারিয়ে যায়নি। কমলপুরের ছোট গ্রাম মোহনপুরের ছোট ছেলেটি এত বিরাট ব্যক্তিত্বের আসন অলঙ্কৃত করবে তা কে জানত। বিমল তা পেরেছিল নীতি, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগে অবিচল থেকে। সহকর্মী, সহযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা ছিল তুলনাহীন। দেখেছি কত সাধারণ সহকর্মীর বিপদে, অসুস্থতায়, অভাব-অনটনে ব্যাকুল হতে। তাদের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টার অন্ত ছিল না। একবার এয়ারপোর্ট এলাকার এক গরীব পার্টিকর্মীর মুখের ভিতরে পচন ধরে। চেহারা বিকৃত রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন হাসপাতালে ডিসপেনসারিতে চিকিৎসার পর ডাক্তাররা 'ক্যান্সার' সন্দেহে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় আমার সাথে ওই পার্টি কর্মীটির দেখা হলে সমস্ত দুঃখের কথা সবিস্তারে বলে। আমি তাকে পরামর্শ দিই, দ্যাখো বিমল কাল আসবে। তুমি কষ্ট করে কাল একবার এসো, দেখি কি করা যায়। লোকটি এল, আমি বিমলকে বললাম, দেখালাম। বিমল আঁতকে উঠল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আমি কালই আগরতলায় ফিরে যাব। তুমিও যাবে আমার সাথে আগরতলায়। আমি চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করব। দেখি কতটুকু হয়। ভাগ্যচক্রে আমিও ওর সাথে আগরতলায় রওনা দিলাম। ঘাঁটির চৌমুহনী থেকে কর্মীটিকে নিয়ে আগরতলার পথে রওনা দিই। পৌঁছেই জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ডাক্তারদের ডেকে এনে অনুরোধের সুরে বিমল বলল, ওকে ভালো করতেই হবে। ওকে রেখে গেলাম, আমি প্রতিদিন এসে দেখে যাব। ওই পার্টি কর্মীটির নাম ভুলে গেছি, তাই নামোল্লেখ করতে পারলাম না। বিমলের উদ্যোগে ও আর্থিক সাহায্যে সে ক্রমশঃ ভালো হতে থাকল। ভালো হল। রোগী যত না খুশী, অনেক বেশি খুশি বিমল, ওকে বাঁচাতে পারল বলে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাকে নিজের গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিল। মাঝে মধ্যে তার সাথে দেখা হলে বলে, বিমলদা নেই। আর আমি বেঁচে আছি। এরকম অনেক ঘটনায় বিমলের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

রিক্সাচালক ইসমাইল অসুস্থ হলে ওকে আগরতলায় নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। প্রতি সন্ধ্যায় জি বি হাসপাতালে ওকে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে দেখেছি। লিভারের সমস্যা, ডাক্তাররা অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসমাইল ঘাবড়ে গিয়েছিল। বিমল ওকে বলত ভয় নেই, আমি আছি। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে আসে। আবার ওকে বুঝিয়ে-

সুঝিয়ে জিবিতে নিয়ে অপারেশন করায়, কিন্তু বিলম্বের কারণে অবস্থার জটিলতা দেখা দেয়। আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় বাঁচানোর জন্য, কিন্তু বাঁচেনি। মৃত্যুর সংবাদে হাউমাউ করে বিমলকে কাঁদতে দেখেছি। গঙ্গানগরের সংখ্যালঘু বিমলের সর্বসময়ের সঙ্গী ডুগল মিএগর হঠাৎ মৃত্যুতে বিমল চিৎকার করে কেঁদেছিল। আমাদের আরেক বাল্যবন্ধু, এককালে নামকরা ফুটবলার কংগ্রেস কর্মী রাজেন্দ্র ঘোষের পায়ে ক্যানসার হয়। অর্থাভাবে অর্ধচিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছে খবরে বিচলিত বিমল আমাকে ও বীরেন্দ্র কৈরীকে নিয়ে ছুটে যায়। বলে, বন্ধু, ঘাবড়াবে না আমি আছি। তোমার জন্য যা যা করার সব করব, তুমি তৈরি হও কলকাতা যাবার জন্য। সব ব্যবস্থা করে বিমল খবর পাঠায় আগরতলা যাবার জন্য। বিমানের টিকিট ও অর্থের সংস্থান করা হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি, সঠিক সময়ে যেতে পারেনি বলে মারা গেল। বিমল খুবই ব্যথা পেয়েছিল বাল্যবন্ধুর অকাল বিয়োগে।

আমি একবার ১লা মে কমলপুরের নতুন বাগানে প্রোগ্রামে জীপে যাবার পথে সহকর্মীসহ পাহাড়ী লুঙ্গার অনেক নীচে পড়ে যাই গাড়িসমেত। ওখান থেকে চা-শ্রমিক বন্ধুরা তুলে কমলপুর হাসপাতালে আনে। পরে আগরতলায় বিমল সাথে করে নিয়ে যায়। এক্সরে করে পায়ে ফাটল ধরা পড়ে। প্লাস্টার করা হয়। এক মাসের উপর এভাবে থেকে প্লাস্টার কাটা হয়। তারপর দেখা দেয় এক নতুন উপসর্গ — নার্ভের দুর্বলতা। আমার চেয়ে বেশি বিচলিত বিমল সমস্ত ব্যবস্থা কবে কলকাতা পাঠায় চিকিৎসার জন্য। বিমানে তুলে দিতে আসে নিজে, বলে, "যা, ভালোভাবে চিকিৎসা করাবি, আমি আছি, ঘাবড়াবি না খুড়া।" ঠিকই তাই। বিমল বোধহয় আমার সাথে সাথে ছিল। ত্রিপুরা ভবনে পৌছবার সাথে সাথে বিকাশ বিশ্বাস ত্রিপুরা ভবনের গাড়ি করে CMRI এ নিয়ে যায়। ফলে সাথে সাথে ভর্তি করা হয। MRI সহ সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কোন রোগ পায় না। স্নায়ু দুর্বলতার কারণ নির্ণয় হয় — ডায়াবেটিস। বারদিনের মতো ভর্তি ছিলাম সেখানে। প্রতিদিন ২/৩ বার বিমলের ফোন পেতাম। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমার চিকিৎসার খোঁজ খবর করত। মানিকভাণ্ডার পার্টি অফিসে হঠাৎ সন্ধ্যারাতে উগ্রপন্থী আক্রমণ করে। তৎকালীন পার্টি সেক্রেটারী রঞ্জিত ঘোষকে বন্দুকের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যাওয়ার পথে বিধায়ক সুধীর দাসের দেহরক্ষীকে গুলি করে হত্যা করে। এমতাবস্থায় কমলপুর থেকে গাড়ি করে পার্টি কর্মীরা মানিকভাণ্ডারে পৌছালে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। কমঃ বিমল বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল পরিস্থিতি শান্ত করতে। ঘটনাচক্রে আমি তখন কলকাতায় চিকিৎসারত। রাতে বিমল যখন ফোন করে সব আমাকে জানায় তখন অসহায়ের মতো কান্না জড়ানো গলায় বিমল ঘটনার পরিণতি কোন দিকে যেতে পারে জানায়। আমি আঁতকে উঠি। আমাকে ফিরে আসতে বলে। চিকিৎসার কাজ বন্ধ করে ফিরে আসতে মনস্থ করি। কিন্তু টিকিটের সমস্যায় বিলম্ব হচ্ছে জানালে বিমল ত্রিপুরা ভবনের মাধ্যমে টিকিটের ব্যবস্থা করে দেয়। আমি দ্রুত ফিরে আসি। এসে পথেই স্ত্রী পুত্রকে বাড়িতে পাঠিয়ে পার্টি অফিসে নেমে যাই। বিমল আমাকে পেয়ে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠে বলে, রঞ্জিতকে ওরা মেরে ফেলবে। চক্রান্ত অনেক গভীরে। অফিসের ভেতরে ঢুকে দেখি বাদল চৌধুরী চিন্তিত। ভারাক্রান্ত মনে অসহায়ের মতো বসা। পাশে দীপক সহ আরো অনেক নেতৃত্ব। এরপর সবে মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, অনেক ছোটাছুটির পর রঞ্জিত ছাড়া পায়। রঞ্জিত ছাড়া পাবার পর বিমলের চোখেমুখে ছিল

অসীম তৃপ্তির হাসি। রঞ্জিত-বিমলের কোলাকুলি করে আঁকড়ে ধরার হাসি-কান্নার ছবি আজও আমার চোখে ভাসে। বিমল-রঞ্জিত দু'জনেই ছিল ছাত্র-যুব আন্দোলনের নেতা, একসাথে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। বিমলের সাথে উপজাতি অংশের মানুষের ছিল নিবিড় ভালোবাসার বন্ধন। বিমল আসার আগাম খবর পেলে উপজাতি অংশের মানুষদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হত। বিমলও ওদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসি-রঙ-তামাশা করে সময় কাটাত। একবার কাঞ্চনপুর থেকে ফুলদংশাই এর কাছে এক অনুষ্ঠানে বিমলের সাথে যোগ দিতে চাই। অনুষ্ঠানটি ছিল সাবুয়ালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র শিলান্যাস করার। সেখানে YMA মিজো যুব সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে। এ উপলক্ষ্যে মিজো যুবকরা সুসজ্জিত পোষাকে বাজনাসহ হাজির হয়। সাথে এক বিরাট সোফা, বাঁশে বাধা। আমরা চমকে উঠি। চেয়ার কেন? মিজো যুবকরা বিমলকে সম্মান জানিয়ে ও চেয়ারে বসতে বলল। বিমল বলল, এ ঠিক নয়। আমি পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারব। এরকম চেয়ারে বসতে পারবো না। ওই যুবকরা তা মানতে চাইল না। ওরা বলল, এটা নাকি ওদের নিয়ম। শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তিকেই এভাবে নেওয়া রীতি। নাছোড়বান্দা যুবকরা বলল, তোমার স্থান আমাদের কাছে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন। তুমি এ সম্মান গ্রহণ করো। তখন আমিও বিমলকে বুঝিয়ে বসালাম চেয়ারে। যুবকরা কাঁধে তুলে নিল। YMA-র সাংস্কৃতিক হলে জড়ো বহু লুসাই নারী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতীর সমাবেশে ওদের ও বিমলের আলোচনা আমি প্রাণভরে উপভোগ করেছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর বিমলের বন্ধু সাইলোর মায়ের আপ্যায়নে ওর বাড়িতে যাই। দারুণ আতিথেয়তা পাই। সেখানেও খাওয়া-দাওয়া। তারপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পাহাড়চূড়াতে উঠি, ফুলদংশাই ডাকবাংলো থেকে জম্পুইয়ের মনোরম দৃশ্যের অবতারণা --- প্রতিটি মুহূর্তের ছবি জীবন্ত আমার কাছে। জম্পুইয়ের আরম্ভ থেকে চূড়া পর্যন্ত সর্বত্র বিমলের পরিচিতি দেখে মনে হয়েছিল বিমল বুঝি জম্পুইয়ের মাটিতেই জন্মেছে।

বিমলের মধ্যে আরেকটি দক্ষতাও ছিল যা বলার মত। যে কোন পোষাকেই ছিল সাবলীল। নানা পোষাক পরিধান করত। বিমলকে সকল পোষাকেই দারুণ মানাত। সদা প্রফুল্লতায় হাসিমুখে সব কথা শুনত, বলত। ত্রিপুরার উন্নয়নে আজও সর্বত্র বহু আলোচিত বিমল সিংহ। মন্ত্রীত্বের সার্থক যোগ্যতার ছবিগুলি আজো অম্লান। একদিন দু'জন সরকারি গাড়িতে আসছি কমলপুর শহরের পথে। হারেরখোলা ডাকবাংলোর কাছাকাছি এসেই পথে দেখা এক বাল্যবন্ধুর সাথে। সে হেঁটে আসছিল কমলপুরের দিকে। গাড়ি থামিয়ে বন্ধুকে তুলে নিল বিমল। গাড়িতে তোলার আগে আমি বাধা দিলাম। ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। বললাম, আমার নিষেধ না শুনে তুমি তুলে নিলে তোমার বন্ধুকে? আমি রাগে বললাম, আমি আর যাব না। ফুলছড়িতে আমার কাজ আছে। নামব। সে রাগত হয়ে বলল, 'এখন নামবি না। তোর সাথে কথা আছে। চল্!'

বিরক্তি দেখিয়ে বন্ধুকে পথে নামিয়ে কমলপুরে চলে এলাম। ও চলে যেতেই আমাদের দু'জনের মাঝে শুরু হল বিতর্ক। আমি বললাম, "যাকে আজ তুলে আনলি, সে প্রকাশ্যে তোর সম্বন্ধে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করেছে। আমার কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। আমি ওকে ঘৃণা করি। তোকে আমি একথা বলেছি, তুই শুনলি না কেন?" প্রত্যুত্তরে সে বলল, "তোর মত মানুষও যে এমন অজ্ঞের মতো কথা বলতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।" আমি স্তম্ভিত। বিমল বলল, "যে গাড়িটায় আমরা এলাম সে গাড়িটা ত্রিপুরা সরকারের দেওয়া। অর্থাৎ জনগণেরই

এই গাড়ি। আমি গাড়ি করে আসছি আর অসুস্থ এক বাল্যবন্ধু হেঁটে আসবে, আমি ওকে পথে ফেলে গাড়ি চড়ে আসব, সেটা কিভাবে সম্ভব? ও আমাকে গালাগাল দিয়েছে, মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে, দিক্ না। একদিন ওর মাঝে পরিবর্তন আসবে। অনুশোচনা হবে। এজন্য আমি তাকে অমানবিকতা দেখাতে পারি না। মন্ত্রীত্ব, গাড়ি, বাড়ি এসব জনগণের দেওয়া সাময়িক ক্ষমতা। আমি ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের সেবক। এ গাড়িটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়। অনুরোধ করছি, তুই আমার জায়গায় বসে ব্যাপারটা ভেবে দেখ্। তোর সব রাগ কমে যাবে।'' সত্যিই আমার সব রাগ কমে গেল। আমার মনে হল, বিমল সত্যিই মহান।

বিমলের ভাবনায় কোন নতুন কিছু করার তাগিদ ছিল। বহির্ভারতের ভালো সুন্দর সৃষ্টির সান্নিধ্যে এলে সে ভালো করে ব্যাপারটা দেখত, বুঝত। তারপর রাজ্যে এসে জিনিসটা এখানেও বাস্তবে রূপ দিতে নেমে পড়ত। সাইপ্রাস, ব্রিটেন, কিউবা আরো আরো দেশের সুন্দর কিছু দেখে শিখে আমাদের ত্রিপুরার মাটিতে এমনই কিছু একটা গড়তে আপ্রাণ চেষ্টা করত। এর মধ্যে মুক্ত মঞ্চের ভাবনাটি অন্যতম। অধুনা কমলপুর ডিগ্রি কলেজের সম্মুখে টিলার পেটে পেটে গ্যালারী করে উপভোগ্য মুক্ত মঞ্চ গড়ার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিল। এজন্য কত না ইঞ্জিনীয়ার-প্রকৌশলী বাস্তুকারদের এনে আমাদেরসহ সরেজমিনে জায়গা দেখে উদ্যোগ নিয়েছিল। হায়! অকালে সে চলে যেতেই সমস্ত উদ্যোগ, উদ্যম থেমে গেল। আজও তা হল না। সে থাকলে তা সত্যিই রূপ পেত, আমার বিশ্বাস।

সাহিত্যের আঙ্গিনায়ও অবাধ বিচরণ ছিল বিমলের। এক্ষেত্রে সে এক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিল। বিমল তাঁর সাহিত্যে ত্রিপুরার মাটির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছে। বিমল তার 'লংতরাই' কাহিনীচিত্রটি রূপদান করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। 'লংতরাই' কাহিনীচিত্রটি প্রাণলাভ করে বিমল সিংহের হাত ধরেই। ভিডিও ক্যামেরাসহ শিল্পীদের নিয়ে ছবিটিকে প্রাণবন্ত করতে ওদের সাথে একাত্ম হতে দেখেছি। এমন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন আর কর্মোদ্যোগী পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে থামিয়ে দিল ষড়যন্ত্রকারীরা। আমরা হারালাম বিমলকে, পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে। জীবন যদি পূর্ণতা পেত তবে আমরা আরো সৃষ্টির দেখা পেতাম। এ দেশ, এ রাজ্য, এ মহকুমা যে কি হারাল, তা বলার নয়। বিমলের চলাফেরাতে আলাদা এক ভবঘুরে আচরণ ছিল যা সবসময় সমালোচিত হত। এই আচরণের জন্যে অনেকবার-বলে কয়ে ক্লান্ত হতাম। প্রত্যেক উত্তরে দোষ মেনে নিয়ে হাসত। আর ভুল হবে না, শিশুর মত বলত। কখনও সুন্দর করে গল্পে বুঝাত একজন ব্যক্তি সবদিক ঠিক থাকতে পারে না। যাদের সব ঠিক থাকে ওরা মহামানব। আমি তা নই। একটি ছোট গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল, তাই লিখছি। গল্পটি হল, একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী একটি ফটো এঁকে জনবহুল রাস্তার পাশে টাঙিয়ে দিয়ে নীচে একটি কাগজে লিখে দিল, দর্শকদের মধ্যে যার যে জায়গাটা ভালো লাগে পাশের রং তুলি দিয়ে দাগ দিতে অনুরোধ রইল। দেখা গেল, শিল্পপ্রেমীদের কারো চোখ, কারো মুখ, কারো গাল, চুল ভালো লাগায় দাগ দিতে দিতে এসময় সমস্ত ফটোটা ঢেকে গেল। পরের দিন, ঠিক একই জায়গায় আরেকটি ছবি এঁকে নীচে লিখে দিল, যার যে জায়গাটা ভালো লাগে না, রং তুলি দিয়ে দাগ এঁকে দিতে। দেখা গেল সারাদিনে ফটোটা ঢেকে গেছে। বিমল এ গল্প বলে বুঝাতে চাইল, আমাদেরও কিছু কাজ কিছু লোকের ভালো লাগে, কিছু কাজ ভালো লাগে না। ফলে সমালোচনা-প্রশংসা থাকবেই। আমরা আমাদের

কাজ করে যাব। সমালোচনায় বিমর্ষ না হয়ে বা প্রশংসায় ভেসে না গিয়ে কর্মক্ষত্রে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে।

বিমলের সান্নিধ্যে থেকে কত শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরিচিত হয়েছি তা লিখে শেষ করা যাবে না। আগরতলায় একসাথে থাকার সুযোগ পেলেই দেখতাম ও সুযোগ খুঁজত বাধা-গণ্ডিময় জীবন থেকে স্বল্প সময়ের জন্য বেরিয়ে পড়তে। আমাকে সাথে নিয়ে ছুটে যেত বন্ধু সমীরণ রায়ের কাছে। খোলা মনে গল্পে ও কথায় ভেসে যেত। আরও গুণীজনের সমাবেশ হতো সেখানে। সেখান থেকে উঠতেই চাইত না। কখনও খ্যাতনামা আইনজীবী দিলীপ সরকারের কাছে বা ভবেশ দাশের বাসায়, কখনও শুভাশিস তলাপাত্র, বন্ধু ধীরাজ গুহ আরো অনেকের সাথে প্রাণখোলা আইনী মত-বিনিময় ও হাসি মস্করায় ভেসে যেত। কখনও কোনো দরকারে বা দলীয় কর্মীর মামলা সংক্রান্ত জটিলতা থেকে বাঁচাতে আইনী পরামর্শ চাইত। শিল্পী ফণিভূষণ মোদক (ভোলা ময়রা), হারাধন সংঘের স্বর্গীয় দিলীপ দে'র বাসস্থান — সবটাতেই ছিল বিমলের আড্ডা। আর ও আমাকে ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় পরিচয় করিয়ে দিত, বলত, "আমার বন্ধু! আমার খুড়া, কাঞ্চন সিং।" এভাবে আমি ত্রিপুরার অনেক বিদগ্ধজনের কাছে ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু নেতাদের সাথে আজো পরিচিত।

বিমলের পারিবারিক পরিবেশও ছিল বলার মত। পারিবারিক পরিবেশে বিমলকে অন্য চেহারায় খুঁজে পেতাম। বাবা-মায়ের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত। কোন আর্থিক প্রয়োজনে পরিবারের তহবিলের মালিক মা পূর্ণিমার কাছ থেকে বহু অভিনয়, অনুনয়-বিনয় করার পর তবেই পেত। কিছু টাকা হাতে তুলে দিয়ে ওর বাবাকে কৃত্রিম রাগে গজরাতে দেখেছি আমি। লাগলে দশ টাকা, চাইত পঞ্চাশ টাকা। দর কষাকষিতে শেষমেষ জুটত বিশ টাকা। ভ্রাতৃপ্রেম ছিল অপরিসীম। ছিল একমাত্র বোন বীণার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। যখন পরিবারের সকলে একসাথে মিলিত হত তখন দেখা যেত কত স্বর্গীয় পরিবেশ পরিবারে। নিজের মেয়ে রুজালীন, ছেলে রিচার্ড ও বিক্রমের ছেলে রবার্ট, মেয়ে রেবেকা আর অত্যন্ত প্রিয় রকেটের ছেলে হৃষীকেশ—সকলকে নিয়ে একসাথে সেও শিশুর মত হয়ে যেত। বীণার ছেলেদেরও খুবই ভালোবাসত। অবশ্য পাড়ার কোন শিশুই ওর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হত না।

পশুপ্রেমে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদারও ছিল বিমল। তাঁর জার্মান স্পীড, ছোট লোমওয়ালা কুকুরটিকে প্রাণভরে আদর করত। কুকুরটিকে 'কুটুবাবা' নামে ডাকত । কুকুরটিও ওকে না দেখলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত নানাভাবে। ওকে কাছে পেলে আদরে আঁকড়ে রাখত। কুকুরটিও মালিক ছাড়া অন্য কাউকে সহ্য করতে পারত না। একবার আমি আগরতলা গিয়ে বিমলের বাড়িতে পৌঁছে মাটিতে শুয়ে থাকা বিমলকে গায়ে হাত দিয়ে বলেছি, কেমন আছিস? অমনি কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে। রাগই থামছে না। অনেক চেষ্টা করেও বিমল রাগ থামাতে ব্যর্থ হচ্ছে দেখে আমি বুঝলাম, বিমলপ্রেমের দ্বন্দ্ব পশুতে ও মানুষে ঘটে গেল যেন।

বিমলের অদম্য উদ্যমে, অজানাকে জানার নেশা অত্যন্ত তীব্র ছিল। একবার সালটা আমার ঠিক মনে নেই, কোলকাতা থেকে কমলপুর এসেছে। সাথে দুই ছাত্র বন্ধুকে নিয়ে। ত্রিপুরার পাহাড় ও পাহাড়ীদের জীবনযাত্রার ছবি দেখাবে, নিজেও ওদের সাথে দেখবে বলে। এসেই আমার খোঁজে বাড়িতে। বাড়িতে এসে জানতে পারে, আমি ফটিকরায় রাস্তার ডেমডুম্ব পাহাড়ী এলাকায়। তখন আমি ঠিকাদারি কাজ করি। ঠিকাদারি কাজে রাস্তার পাশে শ্রমিকদের নিয়ে

ক্যাম্প গেড়েছি। বাড়িতে না পেয়ে বিমল সিদ্ধান্ত নেয় ওরা পায়ে হাঁটা পথে ফটিকরায় রাস্তা হয়ে কৈলাসহর পর্যন্ত যাওয়ার। কিন্তু পথ ভুলে গেল ওরা। রাস্তা ছেড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গভীর জঙ্গলে অজানায় হারিয়ে গেল। দুইদিন ধরে অনেক কষ্টে অনেক রাস্তা হেঁটে কাঞ্চনপুর বাজারে পৌঁছাল। ঐ দিন আমি শ্রমিকদের পেমেন্ট দিতে বাজারের মরণ বসাকের মিষ্টির দোকানে বসে আছি। তখনই হঠাৎ নজরে পড়ে বিমলকে। দূর হতে। হেঁটে আসছে। আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। আমি চীৎকার করে উঠি, "আরে বিমল, তুই এ সময়ে!" ওরা সাথে সাথে আঁকড়ে ধরে আমাকে। খানিক্ষণ বসে জিরিয়ে কিছু খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরা যে ভীষণ ক্ষুধার্ত তা ওদের গপাগপ্ মিষ্টি খেতে দেখে বুঝলাম। তারপর সবিস্তারে পুরো ঘটনা যখন বলল, আমার গা শিউরে উঠে। ওরা যে কী কষ্টটাই না করেছে, তা বোঝাতে পারব না। পথ ভুলে যে এতবড় বিপত্তি ঘটবে তা নিজেরাও জানত না। তারপর আমি ওদের আমার ক্যাম্পে, তা প্রায় এখান থেকে সাত-আট কিমি দূরে, পায়ে হেঁটে যেতে হবে মশাল হাতে, নিয়ে যাবার কথা ভেবেও মত পরিবর্তন করি। আমাদের আরেক বন্ধু গুরুদাস চৌধুরী, কাঞ্চনপুর স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আমরা সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিই। পরদিন ভোরে ওরা কৈলাসহর চলে যায়, আমি ডেমডুম ফিরি। বিমলের সঙ্গীদের একজন ছিল দেবু দত্তগুপ্ত, আরেকজনের নাম মনে নেই।

তখন উত্তপ্ত পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি। মানুষরা স্রোতের মতো ঢুকছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। ত্রিপুরাতে শরণার্থীদের ঢল। ঢল কমলপুরেও। বিপন্নদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে ব্যস্ত বিমল ও আমরা। এমনি সময়ে বিমলসহ আমরা কোন কারণে থানায় যাই। গিয়ে দেখি একটি ছোট ছেলে থানায় দৌড়াদোড়ি করছে। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ছোট ছেলেটিকে চোর বলে থানায় দিয়েছে। তার বাবা-মায়ের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিমল আন্তরিক আগ্রহে ওসিকে বলে, ছেলেটিকে আমায় দিয়ে দিন। ছেলেটিকে আমি বাড়িতে নিয়ে যাব। সস্নেহে বড় করব। ওসি ওই শর্তে রাজি হলেন যে, যদি বাবা মায়ের কেউ পরবর্তীতে হাজির হয় তবে ফেরত দিয়ে যেতে হবে। তখন ওসি বিমলের কাছে ছেলেটিকে সঁপে দেয়। বাড়িতে পৌঁছে বিমল মাকে ডাক দেয়, 'ইমা, ইমা (বিমল এই নামে তার মাকে ডাকত)। তোমার বিক্রমকে আমি খুঁজে পেয়েছি, তুমি গ্রহণ করো।" বিক্রম ছিল বিমলের এক সহোদর ভাই, যে অল্প বয়সে মারা যায়। বিমলের মা পূর্ণিমা দেবী এই বালকটির মধ্যে যেন বিক্রমের ছবি দেখতে পেলেন। সেই থেকে ছেলেটির নাম হল বিক্রম হিসাবে। রকেট-বিক্রম এক সাথে বড় হতে থাকল সকলের আদর ভালোবাসায়। পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহরও খুব আদরের ছিল বিক্রম। বিমলের স্বপ্ন ছিল বিক্রমকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলার। স্বপ্ন সফল হল না। বিক্রম পিতার ব্যবসায়ে জড়িয়ে গেল। পরিবারের মধ্যে মা-বাবার কাছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ভরসা হয়ে দাঁড়াল বিক্রম ক্রমশঃ। পরিবার পরিচালনায় কৃষি ও ব্যবসায় বিক্রম দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত হল। বিক্রম আচার আচরণে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সংস্কৃতি ভাষাসহ সবকিছুতেই লক্ষ্মীকান্ত সিংহের ছেলে বিক্রম সিংহ মর্যাদায় আইনি স্বীকৃতিসহ সব পেল। কাল হল, ব্যবসায়ের অতিরিক্ত নেশা। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সাইকারবাড়ি কাজের ঠিকানা থেকে অপহরণ করে তুলে নিল। ভ্রাতৃস্নেহে উন্মাদ, পুত্রস্নেহে অন্ধ বিমল ও তার পিতা, ছোট ভাই রকেট অন্তহীন চেষ্টা চালাল উদ্ধারের। ভাবাবেগে-বিশ্বাসে মানবতাবাদী এই বীর ক্রমশঃ ভালোবাসার দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ফাঁদে পা দিল। তার বিশ্বাস ছিল, আমি কারো ক্ষতি করিনি, আমারো ক্ষতি হবে না। এগিয়ে গেল সম্মুখে, নরকীট, রক্তলোভীদের কাছাকাছি। ভাইকে উদ্ধারের প্রলোভনে। নর পশুরা নির্মমভাবে হত্যা করল তাকে, রকেটকে। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল দু'টি সোনার মানুষ। শয়তানদের একটুও হাত কাঁপল না। এই জননেতার অকাল বিয়োগ ব্যথায় কমলপুরবাসীর প্রতিটি ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠল, ঘরে আগুন জ্বলল না। গণঘৃণা বর্ষিত হল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে, তাদের চক্রান্তের সহযোগী অশুভ মদতদাতাদের বিরুদ্ধে। সবাই সংহত হল, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হটাতেই হবে। সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

বিমলকেও আমি মানসিক যন্ত্রণাতে দগ্ধ হতে দেখেছি। কারো কারো নিষ্ঠুরতায় আক্রান্ত হলে বিমল কাতর হয়েছে, কিন্তু থেমে থাকেনি। যখন ব্যথার তীব্রতায় বিচলিত হয়ে পড়ত, তখন তার সহজাতগতি মন্থর হয়ে যেত। সবচেয়ে ব্যথা পেত তখনই যখন অন্যায় কল্পনাপ্রসূত মিথ্যের তীর এসে সমালোচনার নামে আঘাত করত। বিমলের কাছে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় বৈদ্যনাথদা, নৃপেনদা, দশরথদা, মাখনদা, বীরেনদত্ত, দীনেশদা-দের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সে সর্বসময় বলত, ওকে গড়ে তুলতে এদের অবদান আছে অনেকখানি। এদের শিক্ষা ও চেষ্টায় এগুতে পেরেছি। আরো অনেকের চেষ্টা ছিল গড়তে। আমার মনে আছে, সর্বত্যাগী নৃপেনদার পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত এলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল বিমল। বলেছিল, এই সর্বত্যাগীর এ পরিণতি কাম্য ছিল না। অঘটন ঘটে গেল শৃঙ্খলার কঠোর নিয়মে। বাইরে থেকে বুঝার নয়, এ যন্ত্রণা কত অসহনীয়। কোন কোন সময়ে বিমলের স্বতঃস্ফূর্ততা উবে যেত, অব্যক্ত যন্ত্রণায়, অসহনীয় পরিস্থিতিতে। এরকম পরিস্থিতিতে বিমলকে আমি অন্য এক জগতের খোঁজ করতে দেখেছি, ও তখন পড়াশোনায় কিংবা কলম ধরে নতুন সৃষ্টির নেশায় মত্ত হত।

বন্ধু বিমলের সাথে চলে কত না চেহারায় চরিত্রে দেখেছি ওকে। কত না স্মৃতি মধুর ঘটনা চলার প্রতিটি পদক্ষেপে মনে পড়ে। বিমল ভাবনায় তাই ভেসে যাই, ভারাক্রান্ত হই ওর কথা মনে পড়লে, আবার ভারাক্রান্তভাবটা কেটেও যায় যখন ওর ছোট ছোট কথা - মত বিনিয়মগুলি উপদেশের মতো মনে পড়ে। মনের উদ্যম তখন অনেকগুণ বেড়ে যায়। মন্ত্রী বিমল, দেশপ্রেমিক বিমল, গরীব শ্রমজীবী কৃষকদের বন্ধু বিমল, সাহিত্যিক ও সুবক্তা বিমল, জাতি-উপজাতি, হিন্দু-মুসলমান, সমস্ত অংশের মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু বিমলের অকাল বিয়োগ আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। আজও স্বপ্নে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় বিমল আমার কাছে। হতাশায়, ক্লান্ত হলে, কোন ঘটনার সমাধানের পথ খুঁজে না পেলে বিধ্বস্ত মন নিয়ে বিমলের অভাব ভীষণভাবে বোধ হয়। বিমল তখন স্বপ্নে দেখা দেয়। স্বপ্নে বিমল এলে আমি সব বাধা-ক্লান্তি কাটিয়ে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাই, দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়ি। আমার, আমাদের, সকলের কাছে বিমল নেই বলে মনেই হয় না। ভাবি ও বেঁচে আছে। খুব শীগগীরই ফিরে আসবে। এই তো সেদিন, এই বীর শহীদসহ ভাই রকেটকে চোখের জলে তুলে দিয়ে এলাম। হাজার হাজার মানুষের হাহাকারে, ক্রন্দনরোলে, মিছিলের মাঝে ওকে বিলীন হতে দেখলাম। হৃদয়ের গভীরে গাঁথা বিমল সহজে হারিয়ে যাবার নয়। বিমল বেঁচে আছে, থাকবে। স্বপ্নে দেখা দেবে, প্রতিদিন, প্রতিরাত্র — প্রাণ খোলা সেই হাসি নিয়ে, সেই চির পরিচিত ভঙ্গীতে বলবে, "খুড়া, আমি আছি না!"

— অনুলিখন : পার্থপ্রতিম লোধ

৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ ঃ দুর্যোগের ঘনঘটায় ঘনায় আঁধার

রমা দাস

সময়টা '৯৮ সালের ৩১শে মার্চ। বর্ষশেষের শেষ দুপুর। মাথার উপরে সূর্যটা গনগনে আগুন হয়ে জ্বলছে। চৈত্রের প্রখর দাবদাহে চারিদিক যেন তপ্তকুন্ড। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক ১২টা বেজে ২০ মিনিট। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির তৎকালীন মেলারমাঠস্থিত রাজ্য দপ্তরে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময়ে পার্টির সদর বিভাগীয় সম্পাদক কমরেড সমীর চক্রবর্তী (তখনকার সময়ে) দোতলা থেকে নেমে এসে বললেন —'কমরেড এই মাত্র খবর পেলাম কমরেড বিমল সিংহ উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। আপনি এখন কিছুক্ষণ অফিসেই থাকুন'।

আকস্মিক অপ্রত্যাশিত এই দুঃসংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কমরেড বিমল সিংহ ছিলেন সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য, রাজ্যের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য-পরিবার কল্যাণ এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরের জনপ্রিয় মন্ত্রী, রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতা। পার্টি, গণসংগঠন এবং সরকারি কাজ ছাড়াও জাতি-উপজাতির ঐক্য রক্ষার প্রয়াসে কমলপুর বিভাগসহ রাজ্যের সন্ত্রাস কবলিত দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকায়ও তাঁর ছিল নির্ভীক বিচরণ। ভেবে পাচ্ছিলাম না কোথায়? কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো?

বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অফিসের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আগরতলা শহর চলছে তার নিজস্ব গতিতে। ঠিক প্রতিদিন যেমন চলে। বুঝলাম খবরটা এখনো জনারণ্যে সেভাবে প্রচার হয়নি। আবার অফিসে এসে বসলাম। ঠিক তখনই পার্টি রাজ্য দপ্তর থেকে টেলিফোন এলো— 'কমরেড আপনি এখনই একবার রাজ্য কমিটির অফিসে চলে আসুন। বৈদ্যনাথদা সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃত্ব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

একরকম প্রায় ছুটে গেলাম পার্টি রাজ্য দপ্তরে। ধারণা ছিল হয়তোবা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পার্টি কিছু কর্মসূচী ঘোষণা করেছে, সেটা বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু আমি তখনও জানতাম না কি কঠিন গুরু দায়িত্ব আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পার্টি অফিসে পৌছে দেখলাম সবাই গুম্ হয়ে বসে আছেন। শান্ত সমাহিত বিষাদের প্রতিমূর্তি কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদার ডেকে বললেন — 'শুনেছো বোধ হয়, কমরেড বিমল সিংহ উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। তোমাকে এক্ষুনি বিমলের কোয়ার্টারে গিয়ে ওঁর স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী সিংহকে খবরটা পৌছে দিতে হবে।'

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। এ যে বড় কঠিন কাজ। সদ্য স্বামী হারা একজন নারীর কাছে পৌছে দিতে হবে তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ? আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বৈদ্যনাথদা আবারও তাড়া দিলেন — 'যাও, দেরী করো না। ওরা হয়তো কিছুই জানে না।'

পার্টি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব, পালন করতে হবে। পার্টি অফিস থেকে একজন পুরুষ কমরেড আমার সঙ্গী হলেন। তিনি সম্ভবতঃ কমলপুরে কর্মরত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের সাথে যুক্ত। ততক্ষণে বেলা অনেকটা পড়ে এসেছে। দুপুরের তপ্ত প্রখর রোদের তেজ আর তেমনটা নেই। পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শঙ্কিত হয়ে কোয়ার্টারে ঢুকলাম। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার আশঙ্কায় পা কাঁপছিল। কিন্তু দেখলাম — সেখানে ভিন্ন চিত্র। চারিদিক শুনশান। বৌদি (বিজয়লক্ষ্মী সিংহ) বাথরুম থেকে বেরুচ্ছেন। ছেলে রিচার্ড খাওয়ার টেবিলে। বৌদির ভাতও বাড়া। মেয়ে

রুক্সালীন ঘরে বিছানায় বসে টেপ রেকর্ডারে গান শুনছে। রান্নাঘরের উনুনে ভাত বসানো। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম — 'বৌদি ভাত খেয়েছেন?' '— না, এই তো খাবো। আপনার দাদা তো কমলপুরে। আসবে বলে টেলিফোন করেছেন। ওঁর জন্য একটু গরম ভাত বসিয়েছি'।

বুঝতে পারলাম বিমল সিংহের মৃত্যু সংবাদ তখনও কোয়ার্টারে পৌঁছায়নি। আমি অপ্রস্তুত। কিছুতেই মন চাইছিল না, ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদটা তখন জানাই। ভাবছিলাম খাওয়া হয়ে গেলেই কথাটা বলবো। তাই রান্না ঘরে গিয়ে বসলাম। কিন্তু আমার চাওয়া না চাওয়াতে তো কিছু হবার নয়, এ যে কমরেড বিমল সিংহের মৃত্যু সংবাদ। ইতিমধ্যে দুঃসংবাদটি বাতাসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। নানা জায়গা থেকে কোয়ার্টারে ঘন ঘন টেলিফোন আসতে শুরু করেছে। বুঝলাম দিগন্তে প্রলয়ংকরী ঝড়ের অশনি সংকেত বাজছে। এরই মাঝে সম্ভবতঃ কোয়ার্টারে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কেউ একজন কথাটা বলে ফেললো। বাধ্য হয়ে তখন আমি আস্তে করে বললাম—হ্যাঁ বৌদি, আমিও এমনটা শুনে এসেছি।

কমরেড বিজয়লক্ষ্মী সিংহ দৃঢ়ভাবে বললেন — 'অসম্ভব আমি বিশ্বাস করি না। যতক্ষণ কমরেড শ্রীশদা আমাকে না জানাবেন, ততক্ষণ আমি এসব কিছুই বিশ্বাস করি না।' তাঁর এই কথাতে পার্টির প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ পেলো। কমরেড শ্রীশ ভট্টাচার্য পার্টি রাজ্য দপ্তরে আমাদের সকলের অভিভাবক। তাই মর্মান্তিক দুঃসংবাদের সত্যতাও যাচাই করতে হবে অভিভাবকের কাছ থেকে। ইতিমধ্যে রুক্সালীন অস্থির হয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। আস্তে আস্তে কোয়ার্টারে অনেক লোকের সমাগম হতে লাগলো। কোয়ার্টারের পরিস্থিতি ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা নেই। আমি সেখান থেকে পার্টি অফিসে ফিরে এসে সমস্ত বিষয়টা পার্টি নেতৃত্বকে জানালাম। খানিকক্ষণ পরে আবার বিমল সিংহের কোয়ার্টারে গেলাম। সে সময়ে বর্ষীয়ান নারী নেত্রী কমরেড মঞ্জুলিকা বসুসহ অনেকেই সেখানে গেছেন।

বিকালে কমরেড বিজয়লক্ষ্মী সিংহ ও তাঁর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমরেড মানিক সরকার, কমরেড বাদল চৌধুরী, কেশব মজুমদার, নিরঞ্জন দেববর্মা, পবিত্র করসহ রাজ্য বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য এবং পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের অনেকেই সহকর্মী-সহযোদ্ধাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কমলপুর রওনা হবেন। এক সময়ে কমরেড বিজয়লক্ষ্মী সিংহদের পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হলো। আমি কমরেড বিজয়লক্ষ্মী সিংহের সঙ্গে কমলপুর যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব বললেন — 'কমরেড পবিত্র কর যাচ্ছে। তোমার আর যাবার দরকার নেই।' গাড়ী ছেড়ে দেবার মুহূর্তে আমাকে বৌদি বললেন — ও তো আর এলো না। আমিই যাচ্ছি ওর কাছে। চোখে অশ্রুধারা। চোখের জল বাঁধ মানছিল না কারোরই।

কমলপুর শহরের লাগোয়া রূপসপুর গ্রাম। সেই গ্রামেরই দামাল ছেলে বিমল সিংহ। ষাটের দশকে উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে পা রাখা। তারপর যুব আন্দোলনসহ গণসংগ্রামের বহু পথ পাড়ি দিয়েছেন। কংগ্রেস শাসিত ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খাজনা-লেভীর জুলুমের বিরুদ্ধে, উপজাতিদের আর্থ সামাজিক বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী চার দফা দাবি আদায়ের দুর্বার গণসংগ্রামে কমরেড বিমল সিংহ ছিলেন একনিষ্ঠ অক্লান্ত সৈনিক। পুলিস, সি আর পি'র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বহুবার। কিন্তু কখনই জনগণের সংগ্রামের পথ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেননি। পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছিল তাঁর

জীবনের মূলমন্ত্র। ব্যক্তিগত জীবনে আইনী পোশাককে কাজে লাগিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বস্ত সংগঠন সি আই টি ইউ'র নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অর্জন করতে পেরেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি ছিলেন সি আই টি ইউ'র রাজ্য এবং সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সহসভাপতি। কৈলাসহর, কমলপুরসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চা-শ্রমিক, বাগিচা-শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি বর্ডার রোড শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সহজ-সরল জীবনযাত্রা আর হাসিখুশী দিলখোলা ব্যবহার সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতো। শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সমস্যাগুলোকে নিজের মতো করে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু হতে পেরেছিলেন। আবার লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন আপোষহীন যোদ্ধা। শ্রমজীবী মানুষের সমস্যাগুলো তিনি বিশ্লেষণ করতেন শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে। দুর্বার শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ গঠনই শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর মনের গভীরে। সৎ, নিষ্ঠাবান, সহযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা ছিল কমরেড বিমল সিংহের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কমরেড বিমল সিংহকে আমি প্রথম দেখেছিলাম সম্ভবতঃ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে আগরতলা শহরের চিলড্রেন্স পার্কের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের (সংগঠনের তখনকার নাম) ৫ম রাজ্য সম্মেলনে। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে ছাত্র প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে সম্মেলনে এসেছিলেন। আগরতলা মহিলা কলেজ ইউনিট থেকে আমরাও কয়েকজন সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি ছিলাম। সম্মেলনে বিমল সিংহের বক্তৃতা, ছাত্র আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণে দেওয়া প্রস্তাব প্রতিনিধিদের দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল। তারপরও ছাত্র আন্দোলনে যে সময়টা কাজ করেছি তাঁকে দেখেছি নানাভাবে, নানা ভূমিকায়। ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা কৌতুক করে অনেকেই তাঁকে

.... 'কমরেড আপনি এখনই একবার রাজ্য কমিটির অফিসে চলে আসুন। বৈদ্যনাথদা সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃত্ব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' .... কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদার ডেকে বললেন — 'শুনেছো বোধ হয়, কমরেড বিমল সিংহ উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। তোমাকে এক্ষুনি বিমলের কোয়ার্টারে গিয়ে ওঁর স্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী সিংহকে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে।' .... মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। .... বৈদ্যনাথদা আবারও তাড়া দিলেন — 'যাও, দেরী করো না। ওরা হয়তো কিছুই জানে না।' ...... বৌদি (বিজয়লক্ষ্মী সিংহ) বাথরুম থেকে বেরুচ্ছেন। ছেলে রিচার্ড খাওয়ার টেবিলে। বৌদির ভাতও বাড়া। মেয়ে রুজালীন ঘরে বিছানায় বসে টেপ রেকর্ডারে গান শুনছে। রান্নাঘরের উনুনে ভাত বসানো। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। আমি জিজ্ঞেস করলাম — 'বৌদি ভাত খেয়েছেন?' '— না, এই তো খাবো। আপনার দাদা তো কমলপুরে। আসবে বলে টেলিফোন করেছেন। ওঁর জন্য একটু গরম-ভাত বসিয়েছি' ....

ত্রিপুরার ফিদেল কাস্ত্রো বলে ডাকতেন। অবশ্যই পেছনে। শুনতে পেলে একটুও রাগ করতেন না, বরং দিলখোলা হাসিতে ফেটে পড়তেন। সুসাহিত্যিক, গল্পকার, লেখক বিমল সিংহ ছিলেন রাজ্যের প্রথম সারির লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। বাংলা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় তাঁর রচিত গল্প, প্রবন্ধ, লোককথা বহুজন সমাদৃত।

কমরেড বিমল সিংহ ছিলেন দক্ষ প্রশাসক। ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রাজ্য বিধানসভার সদস্য। বিধানসভার অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বিধানসভায় যে কোন পরিস্থিতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সামাল দিয়েছেন। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য-পরিবার কল্যাণ এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হিসাবেও দপ্তরের কাজে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন।

পরিবারের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ধলাইর আভাঙ্গার ঘাটে। ভাই বিক্রম সিংহ এন এল এফ টি সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আছে অনেকদিন। তাকে সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। মুক্তিপণের অর্থ দাবি, ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতিতে অনেক সময় বয়ে গেছে। বাড়ীতে মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও দুঃশ্চিন্তা উদ্বিগ্নতা। খবর এলো — ৩১শে মার্চ সকাল ১০টায় আভাঙ্গার ঘাটে হাজির থাকবার। শর্ত আরোপিত হলো কোন নিরাপত্তা কর্মী সঙ্গে থাকতে পারবে না। কেন জানি ভুলে গেলেন 'ছলনা ছাড়া কুয়াশার কোনও শিল্পবোধ নেই।' ওদের সব শর্ত মেনেই ভাই বিদ্যুৎ সিংহকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আভাঙ্গার ঘাটে। ভাইয়ের পরিবর্তে পেলেন ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। দুই ভাইয়ের তাজা রক্তে সিক্ত হলো বালিমিশ্রিত আভাঙ্গা নদীর পাড়। কমলপুর বিভাগে কমরেড বিমল সিংহের অগণিত সহযোদ্ধা, সুহৃদ, বন্ধু শুভানুধ্যায়ী কেউ জানলো না, কি অঘটন ঘটে গেলো। শুধু গুলির শব্দে সচকিত পাশের বাড়িতে অপেক্ষারত নিরাপত্তা রক্ষীরা ছুটে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলো সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

কমরেড বিমল সিংহের বাবা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ এবং মা পূর্ণিমা সিংহ তখনও জীবিত। বিমল সিংহ ও বিদ্যুৎ সিংহ নিহত হবার কিছুদিন পরে তারা একে একে মারা যান। কমরেড বিমল সিংহের মা প্রয়াতা পূর্ণিমা সিংহ ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্যা। কমলপুর বিভাগে নারী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে, বিশেষ করে মণিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের মধ্যে সংগঠন বিস্তারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি অপহৃত এক ছেলেকে ফিরে পাবার আশায় প্রহর গুণছিলেন, তার পরিবর্তে চিরদিনের জন্য হারালেন দু'দুটো ছেলেকে। হয়তো বা এ শোক সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনিও চলে গেলেন। অকাল বৈধব্য নেমে এলো দু'দুজন নারীর জীবনে। পিতৃহারা হলো কয়েকটি নাবালক-নাবালিকা। রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জনগণ হারালো এক নির্ভীক একনিষ্ঠ সৈনিক।

কমরেড বিমল সিংহ ও তাঁর ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহের সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হওয়া এমন একটি ঘটনা, যা ত্রিপুরায় তো বটেই, সারাদেশেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গোটা রাজ্য শোকস্তব্ধ, স্বজন হারানোর বেদনায়, শোকে-ক্ষোভে-ধিক্কারে কমলপুর বিভাগের ঘরে ঘরে চলছিল অরন্ধন। দেশ-বিদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ধিক্কার জানিয়েছেন।

শুধু ৮০'র জুনের দাঙ্গাই নয়, বিগত আড়াই দশকেরও বেশী সময় ধরে ত্রিপুরা সন্ত্রাসবাদী

কার্যকলাপে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ, মানুষের জীবন-সম্পত্তি, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। স্বামীহারা, পুত্রহারা হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেক নারী। পিতৃ-মাতৃহারা-ভ্রাতৃহারা অবোধ শিশুর কান্না, স্বজন হারানোর বেদনায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়েছে। অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, খুন, জখম, হত্যা, গণহত্যার শোণিত ধারায় ওরা পৈশাচিক উল্লাসে হোলি খেলেছে। জাতিদাঙ্গার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হয়েছে বহুবার। ওদেরই কুটিল ষড়যন্ত্রে খুন হয়েছেন কমরেড নীলপূর্ণ কলই, সুরমণি কলই, আনন্দ রোয়াজা, সিতেশ দেববর্মা, ভীম দেববর্মা, প্রেমসিং ওরাং, হারাধন সাহাসহ আরও অনেক অনেক .... দেশপ্রেমিক বীর গণআন্দোলনের সৈনিক। একদিকে চরম জাতি বিদ্বেষের জিঘাংসা অন্যদিকে উগ্রজাত্যাভিমানের স্পর্ধিত আস্ফালন, ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি ঐক্যের সুমহান ঐতিহ্যকে বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। ব্যাহত হয়েছে রাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতি।

সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নকদের কুটিল ষড়যন্ত্রে মৃত্যু বিমল সিংহকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে। নিখাদ ভ্রাতৃস্নেহ, অদম্য দুঃশাসন আর বিশ্বাসের বেদীতলে তিনি বলি হয়েছেন। আভাঙ্গার জলে ঢেউ খেলেছে দুই ভাইয়ের রক্ত। দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদী ষড়যন্ত্রীরা সফল হয়েছে, কিন্তু অফুরন্ত দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, নির্ভীক সৌভ্রাতৃত্ববোধের জন্য কমরেড বিমল সিংহ ত্রিপুরার শান্তিকামী জনগণের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নবজীবনের সংকট পথে যুগে যুগে বিমল সিংহদের মতো অগ্রগামী সৈনিকরা আত্মবলিদান করেছেন মানুষের কল্যাণে। বিপ্লবী বীর দেশপ্রেমিকদের এই নিরন্তর আত্মোৎসর্গ অপ্রতিরোধ্য। এর কোন সীমারেখা নেই।

'বীরের এই রক্তস্রোত, মায়ের এই অশ্রুধারা বৃথা যাবে না।' এটা আবারো আমাদের সামনে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলে উঠলো। দুর্যোগের ঘনঘটায় ঘনায় আধার। সে আধার আবার কেটেও যায়। শত শত শহীদের রক্তস্নাত ত্রিপুরা আজ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বন্দুকের নল, বারুদের গন্ধ, সন্ত্রাসবাদীদের রক্ত চক্ষুর ভয়ভীতি প্রদর্শন আজ আর মানুষের বুকে কাঁপন ধরায় না। সন্ত্রাসমুক্ত ত্রিপুরা গঠনের শপথে জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষ অঙ্গীকারবদ্ধ। বামফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তাঁদের সাথে আছে। বামফ্রন্ট শাসনে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে, ঐক্য-সম্প্রীতির বাতাবরণকে শক্তিশালী করতে মানুষ অটল-অনড়। মানুষের চোখে আরও উন্নয়ন-অগ্রগতির স্বপ্নিল প্রত্যাশা। তাই বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল ছিন্নভিন্ন হচ্ছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে। আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। সন্ত্রাসবাদীরা দুর্বল হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তাই জনগণ চোখ কান খোলা রেখে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে।

সন্ত্রাসবাদের পথ বন্ধ্যা পথ। স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান, বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে উপজাতিদের কোন উন্নতি হতে পারে না। এই বাস্তব সত্যের আলোকে বিভ্রান্তির সব ঘোর কেটে যাচ্ছে। শত শত বিভ্রান্ত যুবক আজ অস্ত্র ছেড়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় বাড়ছে দারুণভাবে। আরও সুদৃঢ় হচ্ছে ঐক্যের মেলবন্ধন। বামফ্রন্ট শাসনে রাজ্যবাসীর বহুপ্রত্যাশার সাথে ঘরে ফেরা বিভ্রান্ত উপজাতি যুবকদের নবজীবনের প্রত্যাশা মিলে মিশে একাকার হয়ে সুখী সমৃদ্ধশালী নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলবে, এটাই আগামীর বার্তা। কমরেড বিমল সিংহরা এই দিনটির প্রত্যাশায়ই আত্মবলিদান করেছেন। কমরেড বিমল সিংহদের মৃত্যু নেই। যুগে যুগে তাঁরা বেঁচে থাকবে সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রামে।

বিমল সিংহ— এক বিরল দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব

ডাঃ বিকাশ রায়

আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সময়ে রাজা মহারাজারা রাজত্ব করে গেছেন। তাঁরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে যেমন অগ্রণী ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রজা-বৎসল। অনেকে আবার রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ না করেও রাজগুণের অধিকারী হন। উনারা জনসাধারণের, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা-চিকিৎসা-অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যে ভাবনা চিন্তা করেন - কাজ করেন নিজের জীবনকে নিয়োজিত করে। বিমল সিংহ তাঁদের মধ্যে একজন। উনার চিন্তা-ভাবনা দূরদৃষ্টি এত ব্যাপক ছিল যে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন।

স্বর্গীয় শ্রী বিমল সিংহের সঙ্গে আমার একত্রে আড়াই বছর কাজ করতে হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়া সত্যিই হৃদয় বিদারক-বেদনাদায়ক ।

গত প্রায় দুই দশক ধরে আমি বিমলবাবুকে চিনি, শিশু বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর সন্তানদের চিকিৎসা করার সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল। তিনি তখন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার এবং পরবর্তীকালে স্পিকার হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সাধারণ এবং তাঁর সৌজন্যবোধ সকলকে মুগ্ধ করত। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে তিনি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁকে আমি বরাবর একজন বিদগ্ধ মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করে এসেছি।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করলেন। সেদিনই আমি তাঁর প্রখর দূরদর্শিতা, কল্পনা শক্তি এবং ভবিষ্যৎ চিন্তাধারার পরিচয় পাই। তাঁর স্বপ্ন ছিল সমগ্র ত্রিপুরাকে বিশেষতঃ স্বাস্থ্য দপ্তরের কার্যকারিতার নিরিখে একটি আদর্শ রাজ্য হিসাবে তুলে ধরার, চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে এই রাজ্যের বাসিন্দাদের অন্য রাজ্যে যাওয়া কমানো বা একেবারেই বন্ধ হওয়ার জন্য তিনি বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। একইসঙ্গে জেলা বা সদর হাসপাতালগুলি থেকে রাজ্য হাসপাতালে পাঠানো রোগীর চাপ কমানোর ব্যাপারেও তাঁর উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। সেদিনের আলোচনায় তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আলোচনার শেষে তিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করার জন্য আমাকে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার নিতে অনুরোধ করেন। আজ একথা স্বীকার করতে ক্ষতি নেই সেদিন আমি সত্যিই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম প্রশাসনিক কার্যভার গ্রহণ করা সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর আন্তরিক অনুরোধ আমি ফেরাতে পারিনি। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা এবং একত্রে পা মিলিয়ে চলার শুরু। তাঁর এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে কোন রকম রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে সকলকে আপন করে নেওয়ার। সত্যিই তিনি একজন আদর্শ মানুষ। এছাড়া তাঁর লিখনশৈলী, বাগ্মিতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা ছিল অতুলনীয়।

তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শুধু মন্ত্রী এবং দপ্তরের অধিকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর বাইরেও সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার খোলাখুলি আলোচনা হত। তাঁর কাছে অনেককিছু শিক্ষণীয় ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাজনীতি বিষয়ক তাঁর জ্ঞান ছিল প্রশংসার

উর্দ্ধে। তাঁব কাছে শুনেছিলাম ছেলেবেলায তিনি খুব সাহসী এবং বেপোবোযা ছিলেন। নিজের আদর্শ কখনও বিসর্জন দেননি। ছোটবেলা থেকেই তাঁব নেতৃত্বগুণ ছিল অসাধারণ এবং জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত তা তিনি প্রমাণ কবে গেছেন। ত্রিপুবাব মানুষ এখনও তাঁকে নিজেব হৃদযে গেঁথে বেখেছে। তিনি ববাবব ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম তিনি কিভাবে বাজনীতিতে প্রবেশ কবলেন। বিশেষত সি পি আই (এম) এব মত শৃঙ্খলাবদ্ধ বাজনৈতিক দলে। তাঁব সোজাসুজি উত্তব ছিল 'বৈদ্যনাথদা'— শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদাব এই বাজ্যেব একজন শ্রদ্ধেয বাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শুধুমাত্র তাঁব কৃতিত্বেই বিমলবাবুব শৃঙ্খলাবদ্ধ বাজনৈতিক জীবন শুরু, কাবণ তিনি নিজে কখনই গতানুগতিক জীবনধাবাব পক্ষপাতী ছিলেন না।

তাঁব সঙ্গে আমাব খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ কবাব অভিজ্ঞতা হযেছে। তিনি সবসময চাইতেন সময বেঁধে কাজ কবাব। তাঁব সঙ্গে আমি এ বাজ্যেব বিভিন্ন প্রান্তে গেছি। এই বাজ্যেব, বিশেষতঃ উত্তব ত্রিপুবা এবং ধলাই জেলাব আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, বাস্তাঘাটেব অবস্থা এবং বিভিন্ন জনজাতি সম্পর্কে তাঁব খুব স্বচ্ছ ধাবণা ছিল। আমি খুব অবাক হতাম যখন দেখতাম বিভিন্ন উপজাতিব বর্তমান এবং পূর্ব প্রজন্মেব বহু মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নাম ধবে তিনি চিনতেন। তাঁব স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যিই প্রখব এব২ বিভিন্ন গোষ্ঠীব মানুষেব সঙ্গে তিনি খুব সহজভাবে মিশে যেতে পাবতেন বিভিন্ন ভাষায তাঁব অসাধাবণ দখলেব জন্য। তিনি খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ককববক, বিযাং লুসাই বা লা, ইংবাজী এবং অবশ্যই তাঁব মাতৃভাষা মণিপুবী বলতে পাবতেন। একদিন পূর্বোত্তব বাজ্যসমূহেব পবিষদ বৈঠকে বহু উর্ধ্বতন পদাধিকাবীব সঙ্গে তাঁকে অহমিযা বলতে
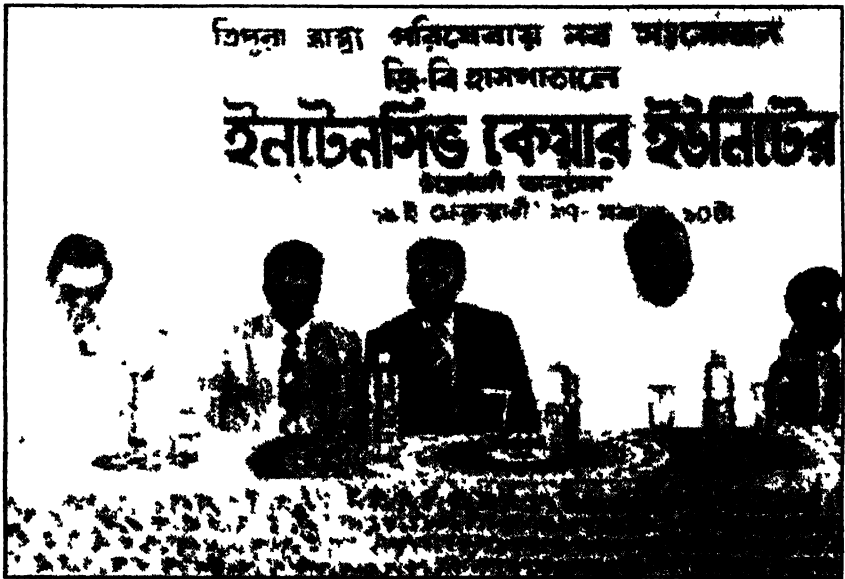
১১ই ফেব্রুযাবী, ১৯৯৭। জি বি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেযাব ইউনিটেব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিমল সিংহেব সঙ্গে ডাঃ নীবদ দাশ, লেখক ডাঃ বিকাশ বায, জি জি এম, ও এন জি সি, ত্রিপুবা এসেট ম্যানেজাব মিঃ পি কে আদক এবং ডাঃ অবনী মজুমদাব।

দেখে আমি সত্যিই আপ্লুত হয়েছিলাম। তিনি পাশ্চাত্যের অনেক উন্নত দেশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর স্বপ্ন ছিল সেখানকার উন্নতমানের পরিকাঠামো এই রাজ্যেও গড়ে তোলা। আমি তাঁর সাথে দিল্লিসহ অন্যান্য রাজ্যেও গেছি। সর্বত্রই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন। তিনি শুধু ভাল বক্তা ছিলেন তাই নয়, তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠত। তিনি সহজেই অন্যদের রাজি করাতে পারতেন যেকোন কাজ করার জন্য—ফলস্বরূপ অতি দুরূহ কাজও সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। আঞ্চলিক ফার্মেসি ইনস্টিটিউট, প্রথম হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল তাঁরই সময় এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জি বি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান পরিষেবা, আই সি ইউ তাঁরই সময় চালু হয়। এছাড়াও আল্ট্রাসোনোগ্রাফী দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং ব্লাড ব্যাঙ্কের সুবিধা বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ ছিল অতুলনীয়। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল 'রাজ্য অসুস্থতা সহায়ক ফাণ্ড' তৈরি করা। এই ব্যবস্থায় মোট ছয় কোটি টাকার সুদ থেকে যে অর্থ আসত তাঁর মাধ্যমে দরিদ্র রোগীদের অন্য রাজ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা যেমন নিউরোসার্জারি বা কার্ডিয়াক সার্জারি (স্নায়ুতন্ত্র ও হৃদরোগের শল্য চিকিৎসা) করতে পাঠানো হত। তিনি শুধু নতুন হাসপাতাল তৈরি করেই থেমে থাকেননি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা উন্নয়নের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। অনেক সময়েই তিনি আগাম সূচনা ছাড়াই বিভিন্ন হাসপাতালগুলি পরিদর্শনে যেতেন এবং পরিচ্ছন্নতা তথা রোগীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের থেকে সরাসরি খোঁজখবর নিতেন। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন হাসপাতালে ডাক্তার সহ সমস্ত কর্মীরাই তটস্থ থাকতেন কারণ তিনি নিজেই সবকিছু দেখভাল করতেন।

তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাঁর স্ত্রী (যিনি বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রী) ও এক পুত্র ও কন্যা ভীষণ সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি বাড়িতে সবসময় মণিপুরী গামছা ব্যবহার করতেন এবং এমনকি বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তা বা অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে সেই পোষাকে দেখা করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর একটি ছোট্ট পোষা কুকুর ছিল এবং যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন সেই কুকুরটিকে সন্তানের মত আদর করতেন। শুধু মানুষের জন্য নয়, অন্যান্য জীবজন্তুদের প্রতিও তাঁর ভালবাসা ছিল নজরকাড়া।

তাঁর দৈহিক গঠন এবং হৃদয় দুইই ছিল বিশালাকার। এটা শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়, ব্যবহারিক অর্থেও। প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে কাজ করতেন।

তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিও ছিল প্রশংসনীয়। আমার মনে পড়ে একদিন জম্পুই হিল যাওয়ার পথে তিনি আমাকে গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসা অস্তমিত সূর্যের রশ্মিটা দেখার জন্য ইঙ্গিত করেন। তখন তিনি বলেছিলেন "এত সুন্দর দৃশ্য হয়ত জীবনে আর কখনও দেখার সুযোগ নাও হতে পারে এমনকি সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আমরা যে ডুবন্ত সূর্য দেখি এটা তার চেয়েও সৌন্দর্যময়"। তাঁর হৃদয় দরিদ্র এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য কেঁদে উঠত। নিজের বন্ধুদের প্রতিও তাঁর বন্ধন ছিল সুদৃঢ়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপ দে-র আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি কমলপুর থেকে গভীর রাতে এসে উপস্থিত হন। সেই বিষাদঘন মুহূর্তে তিনি সেদিন সত্যিই একটি শিশুর মত কেঁদেছিলেন।

আবার অন্যদিকে তাঁর সাহস এবং বেপরোয়া মনোভাব ছিল প্রশংসার উর্ধ্বে। একবার খুব সম্ভবতঃ সেটা ছিল রবিবার দিন। তিনি হঠাৎ ঠিক করলেন খোয়াই হাসতাপালে যাবেন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে। কিন্তু আগে থেকে ঠিক না থাকায় নিরাপত্তা কর্মীদের (এসকর্ট পার্টি) কে কোন আগাম সূচনা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের কাছে পর্যাপ্ত পেট্রোল ছিল না আর ছুটির দিন হওয়ার ফলে আরও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সকলকে অবাক করে তিনি নিরাপত্তাকর্মী (এসকর্ট পার্টি) ছাড়াই যাত্রা শুরু করেন। সেদিন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। যদিও এসকর্ট পার্টি পরে এসে পৌঁছেছিল কিন্তু এ থেকেই তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিনই আমি তাঁকে বলেছিলাম "স্যার, ব্যক্তি বিমল সিংহ্ এবং মন্ত্রী বিমল সিংহের মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ! আর আপনি কিন্তু এখন মন্ত্রীর পদে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা ছাড়া আপনার এভাবে যাতায়াত করাটা বাঞ্ছনীয় নয়"। কিন্তু তাঁর চরিত্রই ছিল এমন একরোখা এবং এটাই শেষ পর্যন্ত তাঁর অন্তিম বিপদ ডেকে আনল। তাঁর সমসাময়িককালে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছিল, ডাক্তার এবং নার্সদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য নানা জায়গায় পাঠানো হত। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল যখন তিনি বললেন ওয়ার্ড মাস্টারদেরও হাউস কিপিং প্রশিক্ষণের জন্য অন্যত্র পাঠাতে। এটা কিন্তু আমরা কেউই কখনও অনুধাবন করিনি। এই সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা কবে চিহ্নিত করত এবং এই ধরনের চিন্তাভাবনা অন্যদেরও উদ্দীপ্ত করত আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়াব জন্য।

তাঁর সময়েই প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আগরতলায় প্রথম স্বাস্থ্য মেলা আয়োজিত হয়। সেই সময় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল এই ধরনের সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কিছু আয়োজন কবা রাজ্য সরকারের উচিত ছিল কিনা। কিন্তু তিনি এই ধরনের প্রাচীন পন্থী ধ্যানধারণার কাছে মাথা নত করেননি এবং স্বাস্থ্য মেলা যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে আযোজিত হয়েছিল।

একবার তাঁর সঙ্গে আমাকে দিল্লি যেতে হয়েছিল। তিনি একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেন ত্রিপুরা এবং পূর্বোত্তর বাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে। তাঁর বক্তব্য এত জোরালো, ধারালো ছিল যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীরাও তাঁকে অভিনন্দন জানান।

বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে তাঁর জীবনযাত্রা ছিল খুবই সাধারণ। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাকে সর্বদাই ভারাক্রান্ত করে তোলে। আমি সত্যিই ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে এমন একজন সর্বগুণ সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল।

এই সহজ সরল উদার এবং পরোপকারী লোকের যে কোন শত্রু থাকতে পারে তা ভাবা কঠিন। এই মুহূর্তে আমাদের সবার প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত যাতে এই রাজরক্ত বিফলে না যায়। আমাদের ত্রিপুরা থেকে যেন সবরকম হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় এবং ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা যেন বাস্তবায়িত হয়।

"কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী"

কৃষ্ণা রক্ষিত

রক্ত ...... রক্ত .... আর রক্ত। রক্তের পিপাসায় উন্মত্তমানবরূপী দানবের তৃষ্ণা যেন আর মিটে না। শুধু রক্ত চাই। রক্ত দিয়ে হোলি খেলতে খেলতে নর পিশাচরা রক্ত ছাড়া আর কিছু যেন তাদের দেখতে ভালো লাগে না। তরতাজা শিশুর রক্ত, নারীর রক্ত, মানুষের রক্ত তাদের দিবারাত্রি লাগবেই। এই রক্তের জন্য দেশের শত্রু, জনগণের শত্রুর সাহায্য নিতে হাত কাঁপে না। এই রক্তের স্বাদ (!) যে চমৎকার। সেই রক্ত যে স্পর্শ করেনি তারা মানুষই নয় (!) এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রক্ত মাখা দাঁতগুলো বের করে বীভৎস অট্টহাসিতে নিজেদের জাহির করে। আদিম বন্যতাকে হার মানিয়ে পুরনো ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই রক্তের তাণ্ডব আর কতদিন মেনে নেবেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শান্তিপ্রিয় জনগণ? নরঘাতকদের আর কতদিন সহ্য করবেন? শিশুঘাতী, নরঘাতীর সাহায্যকারীদের আর কতদিন বরদাস্ত করবেন? না .... মানা যায় না।

৩১শে মার্চ। আমরা গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য দপ্তরে বসে রাজ্য কমিটির সভার চিঠি লিখছি। হঠাৎ সমীরদা (সি.পি.আই (এম) সদর বিভাগের সম্পাদক। ১২.২৫ মিনিট হবে) আমাদের বললেন — এই তোমরা কেউ যাবে না, 'Bimal Killed,' এই কথা বলে উনি দ্রুত পার্টির রাজ্য দপ্তরে চলে গেলেন। সমীরদা কি বলে গেলেন ? বিমলদা নেই? কথাটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। আরও কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, আমাদের বিমলদা নেই। তখনও ভাবছি হয়তো খবর আসছে চিকিৎসা চলছে, ভালো হয়ে যাবে । না সমস্ত ভাবনার ইতিঘটায় যখন দেখলাম ফুল মালা আনা হচ্ছে, বিমলদার ছবি লাগানো হচ্ছে। মোটা ফ্রেমের চশমা পড়া চোখদুটো হাসি ভরা মুখখানি যেন কি বলতে চাইছে। না সহ্য করা যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। 'কমরেড' হারানোর ব্যথায় বুকটা ভারী হয়ে উঠল। স্বজন হারানো ব্যথায় সকলের চোখে তখন জল।

কী ছিল বিমলদার অপরাধ? কেন বিমলদাকে খুন করলো? কেনই বা তার ভাই সরকারি শিক্ষক রকেটদাকে খুন করল? কারা এই খুনের পেছনে? কার অঙ্গুলিহেলনে এই নৃশংস বর্বর অমানবিক হত্যা সংগঠিত হলো? এই হত্যা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে কাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হলো? এই হত্যাকাণ্ড কি সকল সমস্যার সমাধান? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে, আমাদের আগামী ভবিষ্যৎকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে।

এই রক্তের স্বাদ তারা পেয়েছে ১৯৮০ সালে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কায়দায় বিদেশী ও দেশী শত্রুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে তারা এগিয়ে যায়। কমিউনিস্ট জাতিই এর মূল কারণ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। কারণ যারা জাতিসত্তা বিকাশের কিছু চটকদারী দাবি সহ সমস্যা সমাধানের নাম করে হাতে অস্ত্র নিয়ে একটির পর একটি মর্মান্তিক হিংস্র ঘটনা সংগঠিত করে যাচ্ছে— তারা কি সত্যিই সমস্যা সমাধান হোক চায়? সত্যিই সমস্যার সমাধান হোক তারা যদি চাইত তাহলে তাদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে দাবি আদায়ের সংগ্রামে সকল অংশের জনগণকে সামিল করার আহ্বান থাকতো। বন্ধ্যা পথ অবলম্বন করতো না। রক্তের হিংস্রতায় মেতে উঠতো না। নিরপরাধ নারী শিশুকে খুন করতো না! শান্তি-সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতো না। আসলে কমিউনিস্টদের অগ্রগতিকে

তারা সহ্য করতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় ও বিদেশী সাহায্য নিয়ে খুন-সন্ত্রাস-লুট-গৃহদাহ-অপহরণ-ভয়ভীতি প্রদর্শন করেও রাজ্যে কমিউনিস্টদের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করা যাচ্ছে না। এমনকি সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক, ভোট দিলে আঙ্গুল কেটে নেবার হুমকি দিয়েও যে কিছু হয়নি। কমিউনিস্টরা এমন কী যাদু জানে? এতসব করেও ১৯টির বেশি আদায় করা গেল না। কিন্তু হতাশ হয়ে নেমে গেলে চলবে না। রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করার দাবীকে পুনরায় চাঙ্গা করতে গেলে আবার শুরু করতে হবে। কমিউনিস্টদের যাদুদন্ড হল জনগণ। শান্তি সম্প্রীতি গণতন্ত্রের মহান মন্ত্র। অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করা, কৃষকদের জন্য আমূল ভূমিসংস্কার করা, যুবকদের জন্য ন্যায্য মজুরী মঞ্জুর করা, যুবকদের জন্য সঠিক কর্মসংস্থানের প্রশ্নে নীতি প্রণয়ন করা, শিক্ষক কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত করা, ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। কমিউনিস্টরা সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য কাজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত কবার জন্য সংগ্রাম করে, ৮০ ভাগ মানুষের জন্য শোষণহীন রাজত্ব কায়েম করার জন্য শ্লোগান তুলে। সর্বোপরী একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন করে। এই সমস্ত দাবি আদায়ের সংগ্রাম, লড়াই আন্দোলন করে বলেই কমিউনিস্টরা যুগে যুগে কালে কালে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের, দেশীয় শোষকদের চোখের শত্রু। জনগণের সমস্যা সমাধানের আওয়াজ তোলে বলেই কমিউনিস্টদেব হত্যা কবে জনগণের দুশমনরা।

শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হবে জেনেই কমিউনিস্টরা জনগণের জন্য সংগ্রামের ময়দানে সামিল হন। কোন ভয়ভীতি কমিউনিস্টদের চলার পথে অন্তরায় হয় না। একজন কমিউনিস্টের রক্তে হাজার হাজার কমিউনিস্টেব জন্ম হয়। বিশ্বজয় করাব স্বপ্ন যে হিটলার মুসোলিনী দেখেছিলেন, সেই ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কিভাবে কমিউনিস্টরা লড়াই করেছে, ইতিহাস আজ তার সাক্ষ্য বহন করছে। কমিউনিস্টরা জানে লড়াই -এব পথ মসৃণ হবে না। কমিউনিস্টরা নিজের স্বার্থের উর্দ্ধে জনগণের স্বার্থকে স্থান দেয়।

জনগণের নেতা কমবেড বিমল সিংহ ও কমরেড রক্টে সিংহকে শান্তি সম্প্রীতির দুশমনরা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে হিংস্রতার মুখোশ পড়ে। তাঁদের প্রয়াণে আমাদের চোখের জল ফেললে চলবে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের জন্য তাদের লড়াই হোক আজ আমাদের পাথেয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা হোক আরও প্রকট, দেশীয় শত্রুদের মুখোশ উন্মোচিত করার সংগ্রাম হোক তীব্র। কমরেড বিমল সিংহের অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এই ঘটনা অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎসরূপে অক্ষয় হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। কাল থেকে কালান্তরে। লেনিন বলেছেন — "যে পক্ষে জনগণ আছে, আছে বৃহত্তর শক্তির উৎস, বৃহত্তর সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের ক্ষমতা সেখানে জয় অবধারিত"। আসুন আমরা শপথ নিঁই—শহীদের আরব্ধ কাজকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবই সমস্ত বাধা বিপত্তি, ভয়ভীতি, রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষো করে, বেদনাহত হৃদয়ে পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে রবি কবির কবিতা স্মরণ করি— "সমাসীন বিচারক শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে/কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নারীঘাতী/কুৎসিৎ বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন/নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের/স্পন্দনে, রুদ্ধ কণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে/নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

— ডেইলি দেশের কথা, এপ্রিল, ১৯৯৮

সন্ত্রাসবাদ এবং একটি বিশ্বাসের মৃত্যু

দেবাশিস লোধ

সন্ত্রাসবাদ প্রতিদিনই তার চেহারা পাল্টাচ্ছে। নতুন নতুন কায়দায় আতঙ্ক এবং বিভৎসতা সৃষ্টি করছে। কোথায় এর শেষ তা বলা মুস্কিল। প্রতিনিয়তই সন্ত্রাসবাদীর করালথাবা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। সত্তরের দশকের গোড়া থেকেই এরাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদ্দেশ্য একই — মানুষের রক্তকে পুঁজি করে কিছু কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধি করা। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সর্বশেষ নিষ্ঠুর নৃশংস বলি হলেন বিমল সিংহ।

মৃত্যু কোনো নিছক ঘটনা নয়। জীবনের সর্বশেষ পরিণতিই হল মৃত্যু। তবু স্বাভাবিক মৃত্যু আর হত্যার মধ্যে একটা ঘটনার বিষয় লুকিয়ে থাকে। বিমল সিংহের মৃত্যু এরাজ্যের ইতিহাসে একটি অন্যতম ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত। বিশ্বাসের কাছেই মৃত্যু বরণ করলেন তিনি।

উগ্রবাদী সমস্যা এরাজ্যের একটি প্রধান জ্বলন্ত সমস্যা। গত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে এই সমস্যা এরাজ্যের মানুষের কাছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো আশু সমস্যার চাইতেও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারের নির্বাচনেও মূল ইস্যু ছিল উগ্রপন্থাজনিত সমস্যা। বিরোধী দলও উগ্রপন্থী সমস্যাকে তাদের নির্বাচনী প্রচারের প্রধান ইস্যু করে জনগণের কাছে ভোট চাইছিল। 'বামফ্রন্ট এলেই উগ্রপন্থী সমস্যা বাড়ে' — এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল রাজ্য বামফ্রন্টকে। এবারের নির্বাচনে বামফ্রন্টের আসন হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণই হল এই উগ্রপন্থা সমস্যা। অথচ এই কথা সত্যিই গত পাঁচ বছরে বামফ্রন্টের শাসনকালেই উগ্রপন্থী হামলায় নিহতদের মধ্যে ফ্রন্টের নেতা কর্মীদের সংখ্যাই বেশী।

বামফ্রন্টের রাজত্বকালে তিনজন বাম বিধায়ক, একজন জেলা পরিষদ সদস্য, সি পি আই এম বিভাগীয় নেতা সহ অনেক শীর্ষ স্থানীয় নেতাই বৈরীদের হাতে অপহৃত হন। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্যি যে রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোন একজন মন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণ দিলেন। সন্ত্রাসবাদ শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয় গোটা ভারতের স্থিতিশীলতাকে এক প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। আজকের প্রশ্ন কাশ্মীর, উত্তর পূর্বাঞ্চল বা ভারতের দক্ষিণাংশ ঐক্যবদ্ধ থাকবে কিনা? কিন্তু ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যার প্রেক্ষাপট একটু ভিন্নতর। আজ উগ্রপন্থীদের হাতে বিমল সিংহ যখন নিহত হলেন তখনও এই সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নূতন করে আলোচনা করতে হয়। উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন স্তবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন দলীয় আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তবুও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে কোন একটি মৃত্যু হলে স্বাভাবিকভাবে তা নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

বিমল সিংহের যেভাবে মৃত্যু হল তার সার্বিক তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে প্রাথমিক ভাবে যেটুকু খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে একথা বলা যায় যে, এটি একটি পরিকল্পিত মৃত্যুর ফাঁদে ফেলে বিশ্বাসকে খুন করা। একথা অনস্বীকার্য যারা এরাজ্যের সম্প্রীতির সেতু স্থাপন করতে চান সন্ত্রাসবাদীদের চোখে তারাই শত্রু হন। এর আগেও এরাজ্যের বহু নেতা এভাবে

আত্মবলিদান করেন। সম্প্রীতির শত্রুরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বিমল সিংহ জীবিত থাকলে লংতরাইয়ের বিস্তীর্ণ সবুজ বনানীতে কখনোই রক্ত হোলি খেলা সম্ভব নয়। তাই তাদের চক্রব্যূহের গুলির নিশানার মধ্যে বিমল সিংহকে নিয়ে এলেন।

চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এটি তৃতীয় ঘটনা। যদিও বিমল সিংহ অনেক দিন আগেই উগ্রবাদীদের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন তা আজ তার মৃত্যুর পরেই অনুমান করা যায়। গত পাঁচ বছরে কমলপুর মহকুমায় বেশ কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে যায়। ব্যাঙ্ক লুট, অগ্নি সংযোগ, অপহরণ, খুন, সন্ত্রাস এসবের মতো বড় ঘটনার পরেও কমলপুর মহকুমায় বামফ্রন্টের জয় সুনিশ্চিত ছিল তা একমাত্র বিমল সিংহের জন্যেই। আর তাই কত দ্রুত, কিভাবে তাকে ফাঁদে ফেলা যায় তারই সার্থক রূপ পেল গত ৩১ শে মার্চ।

ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের মৃত্যু তারও দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন বিমল সিংহ। ভাইকে উদ্ধার করতে গিয়ে বিমল সিংহ নিহত হলেন। ঘটনাতো ঘটনাই। যখন কিছু ঘটে যায় তার পরেই আমরা বিশ্লেষণ করি। দোষ ত্রুটি, ভালমন্দ এসবের বিচার করি ঘটনার নিরিখে। যদির উপর ভরসা করে সবকিছুকে মেলাবার চেষ্টা করি। তাই বিমল সিংহের মৃত্যুর পরে যে দুটি সহজ কারণকে আমরা উপস্থাপিত করি তা হল — (ক) তিনি যদি না সেদিন সেখানে যেতেন, (খ) যদি তিনি এতটা আবেগ প্রবণ ও বিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে না যেতেন। কিন্তু এটাইতো ঘটনা। তিনি গেলেন এবং নৃশংস খুন হলেন।

সন্ত্রাসবাদ এবং একটি বিশ্বাসের মৃত্যু — তারও দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন বিমল সিংহ। যে লংতবাইকে ঘিবেই তার উপন্যাস, যে উপত্যকার মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হতো তার লেখনীতে সেই উপত্যকার কোলেই শেষবারের মতো লুটিয়ে পড়লেন বিমল সিংহ। তিনি বিশ্বাস কবতেন তাকে হয়তো মারার কেউ নেই। কেনই বা তাকে মারবেন। কিন্তু এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তাকে মৃত্যুর কাছে টেনে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদীরা বুঝতে পেবেছিল যে, ভাইকে অপহরণ করে যদি বিমল সিংহের আবেগকে ধরে টেনে আনা যায় তবেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। এবং তাতেই তারা সফল হলেন।
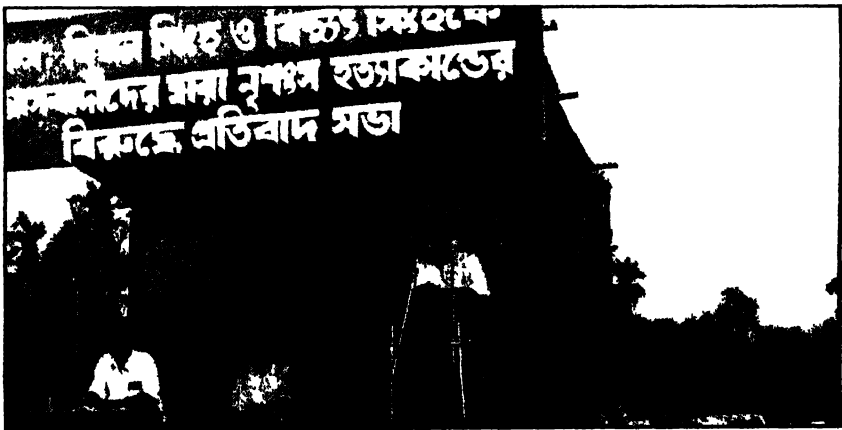
নৃশংস হত্যাকাণ্ডেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

যে বিমল সিংহ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্যে গত ক'বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, নিজের মৃত্যুর সময় সেই পরিষেবাকে কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারলেন না। হয়তো এখানেই আক্ষেপ। বিমল সিংহের মৃত্যুর পর আজ আমাদের স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন ও কিছু ভাবনার জন্ম দেয়। আর কত মৃত্যু হবে এই ত্রিপুরায়? কত মায়ের অশ্রু সিক্ত বুকের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠবে? স্বামীহারা স্ত্রীর চোখের জলে আর কত ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হবে? হয়তো সাময়িকভাবে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও এই মুহূর্তে আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে।

সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অনুসন্ধান করলে সহজেই দেখা যাবে যে, এরাজ্যের উপজাতীয় অংশের জনগণের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও শোষণ — এই উগ্রপন্থার জন্ম দিয়েছে। অন্য দিকে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মদতে এই সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর এই সমস্যা এখন আন্তর্জাতিক মদতে লাগামের বাইরে চলে যাচ্ছে। সমস্যা ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। নতুন নতুন কায়দায়, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাসবাদীরা একের পর এক আক্রমণ সংগঠিত করছে। এটি একটি পরিকল্পিত খুন। ডেকে নিয়ে সরলতার বুকে গুলি নিক্ষেপের ঘটনা এরাজ্যে প্রথম। বৈরীদের ছক কষা রাস্তায় গত ৩১ শে মার্চ আবেগ তাড়িত হয়ে তিনি পা বাড়ান। পড়ে যান তাদের বিরাট জালে। এবং যা হবার তাই-ই হলো। গতিশীল কর্মচঞ্চল একটি মানুষ আজ ছবি হয়ে গেলেন। শহীদের তালিকায় নিজেকে সংযোজিত করে ইতিহাস রচনা করলেন।

মৃত্যুর পরে অনেক স্মৃতিকথা লেখা হয়। বিমল সিংহের ক্ষেত্রে সে অবশ্য অন্য কথা। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে পরিচয়। বয়সের আসমান-জমিন তফাৎ থাকলেও বিমলদা এতই বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন মাঝে মাঝে নিজের কাছেই বিস্মিত হতে হতো। জোট আমলে বিধায়ক ছিলেন। আমি থাকতাম তখন ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে। কলকাতায় এসে উঠেছিলেন তাঁর প্রাক্তন আবাসস্থলটিতে। বিশাল আকৃতির দেহটির পাশে রাতে ঘুমোতে নিয়ে অনেক গল্প শোনাতেন। শিয়ালদার 'ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে' বসেই একটি উপন্যাসের লেখা শুরু করেন তিনি। তখনও সেই উপন্যাসের নামাকরণ করেন নি। পরে যখন তিনি অধ্যক্ষ হলেন — তখন মাঝে মাঝে বিধানসভায় তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে উপন্যাসটির শেষ অংশ শোনাতেন। একানব্বই সালে কলকাতায় একই সাথে অল্প কিছুকাল থাকার সময় থেকেই বিমলদার অদ্ভুত সরলতার পরিচয় পাই। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলতেন — 'চল, আজ তোকে 'বিনয় চৌধুরীর' কাছে লইয়া যামু'। অথচ দেখা গেল সেদিন অন্য কোথাও বসে আড্ডা মারছি। বয়স কোন ফ্যাক্টরই ছিল না। মন্ত্রী কিংবা অধ্যক্ষের চেয়ারের আভিজাত্যতা তাঁর ছিল না কোন সময়েই। গাড়িতে করে এই চুনোপুঁটিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ত্রিপুরা দর্পণ থেকে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'তখাপাড়ার ইতিকথা' বইটির প্রকাশনার তত্বাবধানে থাকাকালে তিনি প্রায়ই গভীর রাতে কলকাতায় ফোনে নানা পরিমার্জন করতেন। সে এক অদ্ভুত কাহিনী। আজ তাঁর মৃত্যুর পরে এ কথাই বারবার মনে হয়—সন্ত্রাসবাদের এই নিষ্ঠুর পরিণতির শেষ কোথায়? আর কতদিন অকাল মৃত্যুর কাছে নতজানু হয়ে শোক জানাবো? স্বজন হারানোর কান্নায় মানুষকে আরেকবার জেগে উঠতে হবে তাঁদের নিজের জন্যেই। বিমল সিংহের মৃত্যুই হোক সন্ত্রাসবাদের শেষ শিকার। জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মিলিত শপথই হোক্ আগামীর প্রত্যাশা।

— রাজধানী আগরতলা, মার্চ-এপ্রিল -১৯৯৮

প্রিয় বন্ধু বিমল

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক গর্ব এবং দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে আমরা অতিক্রম করতে চলেছি বিংশ শতাব্দী। কত কমিউনিস্ট লেখক শিল্পীর জন্ম দিল এই শতাব্দী, আবার স্বৈরতন্ত্রী ও ফ্যাসিস্ত শাসকের রক্ত চোখ কত অগণিত লেখক শিল্পীকে হত্যা করল এই শতাব্দীতেই। আর অকস্মাৎ সফদর, ব্রজলালের মত সে তালিকায় ঠাঁই নিল বিমল সিংহ।

"পাথরে খাঁজ কাটা মূর্তির মত মেদহীন পেশি বহুল চেহারা মালি রায়ের"। বিমলের বড় গল্প তখাপাড়ার ইতিকথা'র নায়ক মালি রায়। দৃষ্টির সামনে এখনও যেন চকচক করছে বিমলের চেহারা। ঠিক অমনি। ত্রিপুরার পাহাড়ী উপত্যকার মতই ধারালো আর নরম। খাড়া ঝাঁকানো শরীরটা দেখলেই মনে হতো ত্রিপুরার জঙ্গল থেকে যেন সিংহ বেরিয়ে এসেছে।

প্রিয় বিমল সিংহ। ত্রিপুরার সরল সুন্দর জীবনযাত্রার সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছায়া। পাহাড়ী ছড়ার মতই ওয়ঝিলিং (চিকচিক জল) দীপ্তি। অবিশ্রান্ত কাজের মানুষ। দু-চোখে সমাজতন্ত্রের শিহরণ ঢেও। চোখের পলক না পড়া সাহসী নাবিক।

পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, ছড়া পার হয়ে, খাড়া উপত্যকার পথ ধরে দুরন্ত বেগে নিজেব গ্রাম পেরিয়ে, রিয়াং পাড়া এবং তারপর ত্রিপুরার আকাশ ডিঙ্গিয়ে দুনিয়ার আনাচে কানাচে যেখানেই নির্যাতিত হৃদয়ের উদ্বেল, সেখানেই তার পদচারণা। যেন শান্ত নীড় ছেড়ে কোলাহলের দিক সীমানায় বিনিদ্র বিপ্লবীর নয়নযাত্রা।

খুব কাছ থেকে বিমলকে দেখেছি। ত্রিপুরায় তো বটেই, কলকাতায় এলে একসময় আমার বাসস্থান এম. এল. এ হোস্টেলের ঘর কিংবা প্রমোদ দাশগুপ্তের মার্কসবাদী চিন্তা কেন্দ্রের কমিউন আবাসে বিমল বারবার এসেছে। বলতে পারি বিমলের চরিত্রে ছিল জঙ্গী চেতনা আর মাধুর্য্যের অপরূপ সমন্বয়, ডানামেলা মুক্ত হৃদয় আর স্বচ্ছ স্ফটিক জলপ্রপাতের অনায়াস যোগাযোগ। একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের যে তিনটি গুণ অপরিহার্য — রাজনৈতিক চেতনা, জঙ্গী চেতনা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা। বিমল ছিল এর গাঁটছড়া বাঁধা পলিতন ব্যক্তিত্ব। সেই প্রিয় বিমলের হত্যা সংবাদ পেয়েছিলাম কোচবিহারে বসে। মনে হলো পাহাড় আর এক সমতলের শিকড় থেকে জেগে ওঠা যুঁই ফুলের গন্ধে সারা ত্রিপুরা মাতোয়ারা করে দিয়ে তবে চলে গেল সে। যেন ভূমিকম্পের আচমকা আঘাত। শুধু ত্রিপুরা নয়, সেই যেমন করে গাজিয়াবাদ থেকে ভেসে আসা সফদরের হত্যা কাণ্ডের বিষাদ, ধিক্কার, আর নৃশংস কাণ্ডও যেন আর এক সচকিত বার্তা পৌঁছে দিল প্রত্যেক কমিউনিস্ট এবং প্রত্যেক বিবেকী মানুষের কাছে। এতো শুধু বিমলকে হত্যা নয়, প্রতিক্রিয়ায় এ এক নির্মম শাসানি সেই ধ্রুবতারার যুদ্ধে। যে ধ্রুবতারার পরিচয় মার্কসবাদী মতাদর্শ।

খানিক্ষণ স্তব্ধ বসেছিলাম। কি বলব? সে বলার শব্দ কি? তরঙ্গমুখর বেদনায় খাঁ খাঁ রাত। কি অসহ্য তার দাপট। আর মনে পড়েছিল কবি বিপ্লবী ফ্রেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার মৃত্যু সংবাদ স্তম্ভিত পাবলো নেরুদার সেই হাহাকার ধ্বনি — "আমি ভাবতেই পারিনি যে, পৃথিবীতে এমন রাক্ষসও আছে যে শিশুর মত সরল আনন্দোচ্ছল স্পেনের এই কবিকে হত্যা করতে পারে।"

বিমলের খুন হওয়া সংবাদে উচ্চারণহীন আমার জিহ্বাতেও যেন নেরুদার কথাগুলো আছাড় খাচ্ছিল অবিশ্রাম। এ যেন অন্ধকারের সঙ্গে আলোর যুদ্ধে একটি নক্ষত্রের নাম।

শুনেছি বিমলকে হত্যা করে খুনীরা পালিয়ে যায় লংতরাই জঙ্গলের দিকে। আমার হাতের কাছে এখন বিমল সিংহের লেখা উপন্যাস 'লংতরাই'। ভূমিকায় বিমল নিজেই লিখেছে — 'বিচিত্র পাখির গানে, বন্যজন্তুর কলরবে, মানুষের হাসি কান্নায়, আবেগে, দুঃখে, ছড়ার কলকলানিতে, কৃষ্ণনীল বনের নিস্তব্ধতায় মুখরিত রহস্যময় লংতরাই পাহাড়।' কয়েকবছর আগে বন্ধু ও মন্ত্রী অনিল সরকারের সঙ্গে গিয়ে দেখা লংতরাই যেন ছবি হয়ে উঠল লাইনগুলি পড়ে। এই উপন্যাস বা বিমলের অন্যসব ছোট ও বড় গল্প পড়লে বোঝা যায় নিরীক্ষণ ও অনুবীক্ষণের কী চমৎকার সম্পদ ছিল ওর মধ্যে। লেখার ধরনটি ত্রিপুরার মাটি ও মানুষের মতই সহজ অথচ শৈল্পিক। সাধারণভাবে ত্রিপুরা বা অন্যত্র বিমলের পরিচয় ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান এক কর্মী ও নেতা হিসেবে। অথচ সাহিত্যে তার প্রতিভা কম ছিল না। একজন কমিউনিস্ট মানবিক হৃদয় সম্পন্ন লেখকের দৃষ্টি সমাজের কোন স্তরে কোন অংশে নিবন্ধ হওয়া উচিত তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হতে পারে বিমল রচিত সাহিত্য।

"লংতরাই পাহাড়, উঁচু টিলার গায়ে বিস্তৃত জুম ক্ষেত। পাহাড়ের ঢালুতে সাদা কাপাস ফুল বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচে। কাপাস খেতের উপর ভাসছে তিল গাছের থোকা থোকা ফুল। আর একবারে নিচু হয়ে জুমের লাল, সবুজ, হলুদ, রং ধরা মরিচ। কাপাসের সাদা ওড়নার নিচে পাহাড়ী জামা, বিচিত্র রং এর বাহার, টিলার মাঝখানে অরহর গাছ, উঁচু ডালগুলি বাতাসে নড়ছে। কোথাও আবার চিনার, খাকলু, কুমড়ো, লতা থরে থরে।" লংতরাই উপন্যাসের শুরুটা এমনি। প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস ছাড়া যাদের জীবন অচল এমনি এক সম্প্রদায় রিয়াং জীবনের মহাকাব্যিক আলপনা এঁকে চলে বিমল সংক্ষিপ্ত পরিসরে। যাদের শ্রমে দুনিয়ার যত উচ্চ ইমারত, যত সভ্যতার অহংকার, অথচ যারা চির বঞ্চিত, চির দুঃখী, তাদের জীবনকে প্রকাশের আর্তিই যেন বিমলের স্বপ্ন ও আনন্দ।

কতখানি নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে দলিত জীবন অবলোকন করলে, আবেগে অবরুদ্ধ হলে এমন বাঙ্ময় উচ্চারণ সম্ভব তা বোধগম্য হয় লংতরাই পড়লে। ডিটেলের সূক্ষ্ম কারুকাজ বিস্মিত করে। সমাজ, সংস্কার, আচার, বিচার, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার যাবতীয় তথ্য, মনন, আর অনুভব নিয়ে তাঁত বোনা কাপড়ের মতই স্বচ্ছন্দ তনুশ্রী ঃ

"বাঁশির সুর থামে না। মেয়েটির হাতে রূপার বালা টুংটাং বাজে। দূর থেকে জরকামুণি শোনে না, তবে হাতের রূপার বালা রোদে ঝলকায়, জরকামুণির চোখ ধাঁধায়। ওয়াই আফফার তালে তালে মেয়েটির বক্ষ আবরণী দোলে। জুমের বাতাসে উড়ে যাচ্ছে মেয়েটির খোলা চুল"।

লংতরাই উপন্যাসের নায়ক জরকামুণি, নায়িকা সাজেরুঙ, কখনও রূপকথার দোলনায় রোমান্টিক আশ্লেষ, কখনও রুক্ষ বাস্তবের হাটে হাহাকার আর তৃপ্তির মিশেল।

জরকামুণি মনে মনে বলে — "সুন্দরী হলেই সবাইকে চেনা চেনা মনে হয়।" অথচ বন পাখি সহজে ধরা দেয় না। প্রেমিক গান গায় —

" তকমুণ্ড তর জাংখ ওয়াই পাইহা
চন্দনা তামানি খ ওয়াইয়ালা।"

অর্থাৎ সব পাখি নীড় বাঁধে, চন্দনা পাখি কেন বাঁধে না?

হঠাৎ জ্যৈষ্ঠ মাস — পাহাড় জুড়ে অভাব। উপোস বাঘিনীর মতই হিংস্র।

লোককথার আদলে বনমানুষ বনমানুষীর গল্প, হাতির সঙ্গম দৃশ্য রাধা কৃষ্ণ উপাখ্যানের মতো পাহাড়ী নির্জন ছড়ায় সাজেরুঙ আর সঙ্গিনীদের বিবস্ত্র জলকেলি, শ্বশুর ঘরে প্রমাণুযায়ী জরকামুণির জামাই খাটা, বনভিত্তিক রিয়াং জীবনে ফরেস্ট আইনের কোপ - উপন্যাসের পাতায় পাতায় খাঁটি দেশজ সত্বার গুণ গুণমান যেন।

রিয়াং জীবনে বিমল খুঁজে পায় যৌথ চাষ, যৌথ শ্রম, যৌথ নির্মাণের সাক্ষাৎ বাস্তব। বিমল চিনিয়ে দেয় জীবন, প্রকৃতি, পরিবেশ, চরিত্রদের বহুমুখী বিভঙ্গ, ঘটনা সমূহের বিচিত্র রূপ রঙ, যার অভিঘাতে বেরিয়ে আসে দুঃসহ অবস্থা বদলের সংকল্প। এখানেই বিমলের লেখক সত্তার জিৎ।

বড়গল্প "তখাপাড়ার ইতিকথা"র সূচনাতেই বিমল চিনিয়ে দেয় তার যাত্রাপথের চিহ্ন — "শাখান পাহাড়ের কোন এক হাঁটুর ভাঁজ থেকে কলকলিয়ে ছোট একটা জলের ধারা পূর্ব থেকে পাহাড়, পাথর, গাছ-গাছালির ছায়া ও শিকড়ে চুমু খেয়ে নাচতে নাচতে নেমে গেছে পশ্চিমে। পাহাড়ের হাঁটু থেকে বেরিয়ে এলেও কেউ তার নাম জাহ্নবী রাখেনি।"

গল্পের মূল কাঠামোটি রিয়াং আর আসলং এই দুই সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তান্ত। বিবাদ, মিলন, মহাজন, ঘাতক, জোতদার, সুদ, ঋণ, প্রেম, রিরংসা, শ্রমের জ্বালা, শ্রমের আনন্দ, ডানপিঠে সাহসী মালিরায আর পাহাড়ী রূপ কন্যা মালরাং, জামাই খাটা, শ্রমজীবীর মানবিক দ্যুতি এবং "সারা পাহাড়ে এক থেকে এক নাগাড়ে একশো পর্যন্ত গুণতে পারা লোক দু-তিনজন ছিল কিনা সন্দেহ" — এমনই এক ধূসর ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে লোককথা, কথকথা এবং আধুনিক ঢঙ মিলিয়ে মিশিয়ে "তখাপাড়ার ইতিকথা"।

বিমলের মৃত্যু — মৃত্যু তো নয় হত্যা - যদি কোন আক্ষেপ থেকে থাকে কোথাও, তা এখানেই। বিমল বেঁচে থাকলে দুনিয়ার সেই হাটে তার সাহিত্যের বসতকে আরও জোরদার করতে পারতো, যে দুনিয়ার দিকে মধ্যবিত্ত লেখকদের নজর পড়ে খুবই কম। যদি বা পড়ে, আন্তরিক শ্রদ্ধা আর দরদের কতটুকু স্পর্শ থাকে তা বিবেচনার বিষয়। এইখানেই দরকার ছিল একজন সৎ নজরদার এবং করিৎকর্মা লোকের, বিমলের মত। সেই মানুষটাকেই অকালে হারালো ত্রিপুরার মানুষ এবং হারালাম আমরাও। বিচার কর্তাদের কাছে হত্যাকারীর শাস্তি চাওয়া বৃথা। পুঁজিবাদের খোলা বাজারে হত্যাও বুঝি বা এক উৎকৃষ্ট ভোগ্যপণ্য আজ। কমিউনিস্ট হত্যার চক্রান্তকারীরা এই পণ্য বস্তুটির উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক। সক্রেটিস, ব্রুনো থেকে সফদর, ব্রজলাল, বিমল—সবাই হত্যাব শিকার। এবং আবাব প্রত্যেকটি হত্যার গর্ভেই জন্ম নেয় ঘৃণা আর ভালোবাসা, জন্ম নেয় প্রতিরোধের শক্তি। শত দুর্যোগের মধ্যেও সেই শক্তিব বিনাশ হয় না কখনও। বিমল তা বিশ্বাস করতো, যেহেতু মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল গভীব।

বিচারের বাণী কোথায় নীরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলবে জানিনা। কিন্তু বিবেকী হৃদয়ের ঘৃণার অঞ্জলি যদি সতর্ক, জাগ্রত না থাকে তবে? সফদরের হত্যার পর প্রতিবাদের ঢেউ অন্তত আছড়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। সময়ের অজগড় নিঃশ্বাস কী ভীষণ ক্ষিপ্রতায় গিলে নিচ্ছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ভাষা! সাম্রাজ্যবাদের নখদণ্ড কমিউনিস্টদেব হত্যার জন্য ছটফট করছে। প্রতিদিন। নির্ভীক বিমল, তুমি তোমাব ঋজু মেরুদণ্ড দিতে পারো আমাদেব? -- *ডেইলি দেশের কথা, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৯৮*

বিমল সিংহ — কিছু স্মৃতি

ফুলেন্দ্রচন্দ্র নাথ

আজ থেকে প্রায় আটাশ বছর আগে সত্তর সালের গোড়ায় ইউনিভারসিটির ডিগ্রী নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশের উদ্দেশ্যে অনেক আশা ও স্বপ্নে ভরা মন নিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর ত্রিপুরার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করি। বর্তমানে ত্রিপুরার নাম শুনলে মন আঁৎকে ওঠে। কিন্তু সে সময় এমনটা ছিল না। তখন ত্রিপুরার প্রকৃতি যেমন সুন্দর তেমনি ছিল শান্ত, তখনকার বাতাবরণ ছিল শান্ত, সৌম্য ও নিরুপদ্রব। জাতি-উপজাতির মধ্যে অনাবিল এক আন্তরিকতার বন্ধন বিরাজমান ছিল। আমি আমার এক বন্ধু যতীন দাসকে নিয়ে প্রথমে যখন কৈলাসহরের মাটিতে পা রাখি তখন রাত্র প্রায় সাড়ে এগারটারও উপরে। ধর্মনগরে পৌঁছে, টেক্সি করে যখন আসছিলাম তখন কি সুন্দর, কি অপূর্বই না লাগছিল পাহাড় বেয়ে উঠা রাস্তার উভয় পাশের সৌন্দর্য, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম মন মাতানো নয়ন ভুলানো রূপ দেখে। আমাদের গাড়ীতে বাকি যে ক'জন কৈলাসহরের যাত্রী ছিলেন, তারা সবাই ছিলেন স্থানীয়। আমাদের অবস্থা দেখে তাদের কারো বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আমরা এ অঞ্চলে একদম নতুন। আমাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জেনে গিয়ে অনেকেই আমাদের স্যার সম্বোধন শুরু করে দিলেন। আর প্রত্যেকটি পর্যায়ে তারা আমাদের বুঝাতে শুরু করলেন আমাদের অবস্থান কোথায় ও সেই জায়গার নাম কি ইত্যাদি। তাদের সম্বোধন শুনে প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ হলেও ভাবলাম হয়তো একজন কলেজ শিক্ষককে এরা এরকমই সম্বোধন করে থাকে তাই খারাপ লাগলো না বরং চাকরি জীবনের শুরুতেই এই নবীন বয়সে এরকম সম্বোধন শুনে বেশ সন্তোষই বোধ করছিলাম। আসার পথে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে যখন আমাদের গাড়ীখানা উঠল তখন কৈলাসহরের বাতির রোশনাই আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। সবাই বলে উঠলো—"এটাই আমাদের কৈলাসহর"। সেখান থেকে প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। আমাদের গাড়ী এসে বাঁক নিল একটি হোটেলের দিকে। নাম 'শঙ্কর হোটেল'। আমি প্রথমে বুঝতেই পারছিলাম না — যে এটাই আমার কর্মস্থল, এখানেই আমাকে থাকতে হবে বছরের পর বছর। তখন পাশের বাজার পুরোদমে চলছে। আশপাশের দৈন্যদশা দেখে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। কৈলাসহর নাম শুনে প্রথমে যা ভেবেছিলাম বাস্তবে তার আসল স্বরূপ দেখে নামের সাথে তেমন কোন মিল খুঁজে পেলাম না। সেই মুহূর্তেই ভাবলাম এভাবে হুট করে না আসলেই হয়তো ভালো হতো। সঙ্গে আবার আমার এক বন্ধুকেও নিয়ে আসলাম, সে-ইবা কি দেখলো? একটু অস্বস্তি ও লজ্জাবোধই করলাম। রাস্তায় আসার পথে গাড়ীতে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কৈলাসহরের অপর নাম 'কলাসহর' বলেও উল্লেখ করেছিলেন। মুহূর্তেই আমার বন্ধুকে রসিকতা করে বলে উঠলাম, কৈলাসহরের পরের নামটাই হয়তো আমার ব্যাপারে প্রযোজ্য ও উপযুক্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ীটি হোটেলের সামনে গিয়ে থামল। বাকী যাত্রীরা সবাই কুশল বিনিময় করে যে যার চলে গেলেন। আমরা এত রাত্রে কি করবো, রাত্রিটাতো কাটাতে হবে তাই আমার বন্ধুকে নিয়ে ড্রাইভারের পরামর্শমত হোটেলে ঢুকলাম। তখন অনেকেই খাচ্ছে, খাবার সমস্ত জায়গাটা প্রায় জুড়ে আছে সবাই। হোটেল মালিককে বলতেই তিনি আমাদের পরিচয় জেনে নিয়ে থাকবার ব্যবস্থা দেখানোর জন্য ভেতরে নিয়ে গেলেন। হোটেলে থাকার ব্যবস্থাদি দেখে

ভয় হলো মনে, ভাবলাম কোন বিপদ না হয়। কারণ বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রায় সমস্ত রুমের আবাসিক ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম সবই চোখে ধরা পড়ছে। সাবানের বাক্সের কাঠের তৈরি চারপায়াতেই রাত্রি যাপন করতে হবে সিদ্ধান্ত নিয়েই যখন সামনে আসলাম তখন একটুক্ষণ আগে যারা খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল সবাই আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো হাত জোড় করে। আমি থমকে গেলাম, ভয় হলো মনে। এত রাত্রে এ দৃশ্য আবার কি? সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার বিছানাপত্র যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে নেই। রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। মুহূর্তেই দেখি দীর্ঘদেহী প্রাণচঞ্চল, মজবুত গড়ন, উজ্জ্বল সুন্দর মূর্তিমান এক যুবক এক রাশ হাসি দিয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম জানিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো — বলল — "স্যার, আমি বিমল সিংহ। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাকীরা আমার হোস্টেলের বন্ধু। আপনার জিনিস আমরাই গাডীতে তুলে ফেলেছি স্যার। আপনি ও আপনার বন্ধুকে আমরা আমাদের হোস্টেলে নিয়ে যাবো।" গাড়ীর মালিকও তখন এক পায় দাঁড়িয়ে, আমাদের পৌঁছে দেবার জন্য তৈরী। আজও ভুলতে পারি না তার সেই আন্তরিকতার কথা, তার সেই সহায়তার কথা ও মমত্ববোধের কথা। তার সাথে আলাপ করে উক্ত জায়গার প্রতি আমার প্রথম ধারণাটা যেন অন্য মোড় নিল, প্রীতি জন্মাল, ভাল লাগতে শুরু করল, একটু ভরসা পেলাম। আমার কৈলাসহর জীবনের প্রথম ছাত্রই বলি আর বন্ধুই বলি সবই ছিল সে আমার। তারপর কলেজের কাজে যোগ দেওয়ার পরও অনেক সময় ছাত্র-স্বার্থজড়িত ছাত্র-আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতে তাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি তাকে মিছিলের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিতে। ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে শ্রমিক আন্দোলন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তী কালে তাকে কমলপুরের বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ ও পরে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব অবলীলায় সার্থকভাবে ও কৃতিত্বের সাথে পালন করতে দেখেছি। তার সাফল্যের কথা শুনলে সব সময়ই মন আনন্দে ভরে উঠতো, গর্ববোধ করতাম। মন্ত্রিসভার উচ্চপদে আসীন হলেও কোন সময় তার মধ্যে কোনরকম ব্যতিক্রমধর্মী ভাব লক্ষ্য করিনি। যে বিমলকে আমি প্রথমেই যেরকম দেখেছিলাম, সে সব সময়ই অবিকল তাই ছিল। অহংকারের কোন ছোঁয়া তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সেটাই ছিল তার জীবনের উজ্জ্বলতম এক দিক। সবাই একই আদর্শে একই মতে বিশ্বাসী হবে এরকম কোন কথা নেই, অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল না থাকলেও সকলের সাথে সম্প্রীতির বাঁধনে তার কিন্তু কোন ঘাটতি ছিল না। সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল রাজনৈতিক মঞ্চের উচ্চাসনে অবস্থান করেও কোন সময় সে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন পেশায় সংপৃক্ত তার বন্ধুদের কথা ভুলে যায়নি। বরং বিপদে-আপদে সবসময় সে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণখোলা হাসি দিয়ে সে তার অকৃপণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনেক সময় তাদের দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে। যে কোন কঠিন কাজ অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে সম্পন্ন করার মত এক আশ্চর্যজনক ক্ষমতা ও সৎসাহস তার মধ্যে আমি দেখেছি। অন্য জাতিগোষ্ঠীর জনগণের সাথে তার অবাধ মেলামেশা ও আন্তরিকতা অকৃত্রিম ছিল বলেই তার পক্ষে ওদের ভাষা শিক্ষা ও তাদের আচরণের সাথে অভিন্নভাব বজায় রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। সে বাংলা, ইংরেজী, মণিপুরী ও ককবরক ভাষায় সমান পারদর্শী ছিল। সাহিত্য সৃষ্টিতেও তার প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল — করাচি থেকে লংতরাই, সত্যের আলোকে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, আলোর ঠিকানা, লংতরাই প্রভৃতি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। খেলাধূলা ও নাট্যজগতেও সে পিছিয়ে ছিল না। এ সবের প্রতিও ছিল তার প্রবল আকর্ষণ। যা পরবর্তীকালে

তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে, নেতৃত্ব প্রদানে ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সে সবসময়ই ছাত্রদের সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে দেশের সংহতি ও অখণ্ডতাকে বহাল রাখতে পরামর্শ দিয়েছে। সমাজের সমস্যাজর্জরিত দরিদ্র অবহেলিত জনগণের কাছে বিমল ছিল অত্যন্ত কাছের মানুষ, অত্যন্ত আপনজন। পিতা-মাতা, ভাই ও সমাজের প্রতিও তার কর্তব্যের কোন ত্রুটি ছিল না।

গত ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ মঙ্গলবার অফিসে বসে যখন একমনে কাজ করছিলাম — তখন বেলা প্রায় দুপুর গড়িয়ে চলছে। সেই সময় একটা ফিস্‌ফাস্ শব্দ কানে এলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ত্রিপুরার জনদরদী নেতা স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী, রাজ্যের কৃতী সন্তান, রাজনীতিবিদ সংহতিপ্রিয় বিমল সিংহ ও তার সহোদর বিদ্যুৎ সিংহ কমলপুর-আমবাসা রাস্তার আভাঙ্গা অঞ্চলে কতিপয় বর্বরোচিত বৈরীঘাতকদের গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। সাথে সাথে আমার প্রথম দেখা, আমার কৈলাসহরের স্মৃতি সেই বিমলের কথা মনে পড়ে গেল। মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক সেই মৃত্যু সংবাদ যেন মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে হতবাক করে ফেলল। অস্বস্তিতে পড়ে কি করবো প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সাথে সাথে আমার অন্যান্য সহকর্মীদের যতটুকু সম্ভব জানাতে চেষ্টা করলাম। সবাই যেন আকাশ থেকে পড়েছে। কেউই যেন মেনে নিতে পারছিলেন না এই মৃত্যু সংবাদ। তার এই দুঃখজনক মৃত্যুসংবাদে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আজ শোকাহত। মর্মাহত। ভাবলাম ত্রিপুরাবাসী সত্যিই একজন নেতাকে, প্রকৃত মানুষকে হারালো।

বিমলের এই অকাল মৃত্যু ও নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে আজ রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেকেই আবার তার হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে শহীদ নেতাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও শোক প্রস্তাব পাঠ করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছেন। এরকম ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সমস্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছেন। অনেকে আবার আসল হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি করছেন। আমিও শুভচেতনাযুক্ত মানুষের দাবির সাথে সহমত পোষণ করছি। আর তা না হলে আরও অনেক বিমলকে আমাদের হারাতে হবে। আমরা কেউই তার পুনরাবৃত্তি হোক সেটা চাই না। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের সবাইর একযোগে সমস্ত সমস্যা সমাধানের সময় এসেছে বলে আমি মনে করি। সরকারকেও সমস্ত ব্যাপারে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারের দুর্বলতা কিছু জনগণের কাছে ধরা পড়ুক, জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসে টান পড়ুক ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পাক সেটা কেউ-ই চায় না। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহর্ষি মনুর অনুসৃত নীতিই বোধ করি গ্রহণযোগ্য। মনু বলেছিলেন —"যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি। তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ।" অর্থাৎ তৃণচ্ছেত্তা যে প্রকারে তৃণ উৎপাটিত করে ধান্য রক্ষা করে, রাজাও সেইরূপ পরিপন্থী দস্যুলোকদের নির্মূল করে রাজ্য রক্ষা করবেন। তাহলেই তিনি সর্বসম্মত শাসক বলে পরিগণিত হবেন।

আমি এখনও মনে করি না যে বিমলের ইহলৌকিক মৃত্যুর মাধ্যমে সব শেষ হয়ে গেছে। আমি মনে করি ভবিষ্যতে অসংখ্য বিমল জন্ম নেবে আর যে সমস্ত যুবক-যুবতীরা আমাদের মধ্যে বর্তমানে রয়েছে, তারা সবাই বিমলের আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুপ্রাণিত হয়ে তার দেশগড়ার স্বপ্নের বাকী অংশ পূরণ করবে। তাহলেই তার প্রতি হবে আসল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। আর তাহলে তার আত্মা শান্তি পাবে ও আমাদের সবাইর মধ্যে সে বেঁচে থাকবে। আর তা-ই হোক — সেটাই আমার কাম্য।

—বিমল সিংহ স্মৃতি তর্পণ ১, ১৯৯৯, নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ

"বীর বন্দিদের মুক্তি চাই"

দেবব্রত দেবরায়

'বীর বন্দিদের মুক্তি চাই'— স্লোগান ছিল অনেকগুলি। এর মধ্যে এই স্লোগানটিই ছিল যেন সবচাইতে দৃপ্ত। বিমলদার কণ্ঠে এই স্লোগানটি আজও আমার কানে যেন ভাসছে। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগের কথা। ১৯৭৬ সাল। প্রয়াত বিমল সিংহ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কমলপুরে চলে এসেছেন। আমি তখন কমলপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। দিন তারিখ মনে নেই। কোন একটা আইন অমান্য বা এই ধরনের আন্দোলনে কমলপুরের পুলিশ ছাত্র-যুব এবং গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেছে। কমলপুরের জেলখানায় তাদেরকে রাখা হয়েছে। বন্দিদের মুক্তির দাবিতে শুরু হল মিছিল। আমরা স্কুল থেকে সোজা মিছিলে চলে আসি। সেদিনই প্রথম দেখলাম দারুণ ফর্সা, সুন্দর, তেজোদৃপ্ত বিমল সিংহকে। তিনিই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন. মিছিলে সকলের সামনে তিনি হাঁটছিলেন. বয়স তখন তাঁর মাত্র ছাব্বিশ বা সাতাশ। পথ চলতি মানুষ ছাত্রছাত্রীদের এই জঙ্গি মিছিল যেমন দেখছেন, তেমনি বিশেষভাবে যেন দেখছেন কমঃ বিমল সিংহকে। প্রথমত তিনি কমলপুরেরই যুবক, দ্বিতীয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করে এসেছেন। সুদর্শন এই যুবকের দিকেই যেন সবাই তাকিয়ে আছেন। কমলপুরের প্রাচীন বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত সিংহের ছেলে। এমনিতেই সবার পরিচিত এবং আদরের।

মিছিল গিয়ে শেষ হল কমলপুরের জেলখানার মূল গেইটের সামনে। স্লোগান মুখরিত মিছিল যেন আরও উচ্চমাত্রা পেয়ে গেল। বিমল সিংহের স্লোগান আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। বত্রিশ বছর আগের কথা হলেও আজও আমার চোখে ভাসছে সেই বিমল সিংহকে। বিমল সিংহের বক্তৃতা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু তাঁর স্লোগান যারাই শুনেছেন তারাই একমত হবেন যে, বিমল সিংহের স্লোগান আলাদা একটা তাৎপর্য বহন করতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে জেলখানার সামনে একটা বটগাছ বা অন্য কোন গাছ ছিল। সেই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি বারবার উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছেন 'বীর বন্দিদের মুক্তি চাই।' পরে শুনেছি তাঁর স্লোগান জেলখানার ভেতর বন্দিদের কানে গিয়েও পৌঁছেছিল। তারাও ভেতর থেকে স্লোগান দিচ্ছিলেন। প্রয়াত বিমল সিংহ সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে তাঁকে জীবনে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতাই বেশি মনে পড়ছে। বিমলদার পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহের সঙ্গে আমার পিতৃদেব প্রয়াত অবিনাশ চন্দ্র দেবরায়ের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সবচাইতে বেশি ছিল আমার মামা কলাছড়ির অমল চৌধুরীর সঙ্গে। ফলে আমাদের সঙ্গে বিমল সিংহের পরিবারের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। বিমলদার ছোট ভাই বিদ্যুৎ সিংহ, যিনি বিমলদার সঙ্গেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। সেই বিদ্যুৎ আমার সহপাঠী। ১৯৭৫ সালে বিদ্যুৎ কমলপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এসে ভর্তি হয় নবম শ্রেণিতে । আমিও তখন ঐ স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। বিদ্যুৎ পরবর্তীকালে কলাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুলের শিক্ষক হয়। সে স্কুলে আমি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি। যে ভাইকে মুক্ত করার জন্য বিমলদা আত্মবিশ্বাস এবং প্রচণ্ড সাহসের উপর ভর করে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন, সেই বিক্রম সিংহও ছিল আমার সহপাঠী। বিক্রম যে পালিত পুত্র তা আমরা জেনেছি পরে। ফলে বিমল সিংহের একটা প্রভাব কমলপুরের অনেক যুবকের মধ্যেই পড়েছিল।

এই প্রভাব থেকে নিঃসন্দেহে আমিও মুক্ত নই। সত্যিই বিমল সিংহ অন্য ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এত বর্ণময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোটা ভারতবর্ষেই বিরল। আজ মৃত্যুর দশবছর পরেও যখনই বিমল সিংহের কথা উঠে তখনই কমলপুরের মানুষতো বটেই, গোটা রাজ্যের মানুষই ডুকরে যেন কেঁদে উঠেন। কমলপুরের প্রতিটি মানুষ আজও একটি কথা সবসময় বলে থাকেন তাঁর মৃত্যুতে কমলপুরের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। আসলে শুধু কমলপুর নয় সমগ্র রাজ্যেরই একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে এই মৃত্যুতে। যে মৃত্যু অপূরণীয়। অনেকগুলি বিরল গুণ আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর মধ্যে। মণিপুরী, বাংলা, ককবরক, হিন্দি এবং ইংরেজি—এই পাঁচটি ভাষায় কথা বলার অধিকারী আমাদের রাজ্যে আর ক'জন আছে আমার জানা নেই। লেখক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ — এই শ্রেণির সঙ্গে যেমন তিনি অনায়াসেই মিশে যেতে পারতেন, তেমনি একই সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন, জুমিয়া, চা-বাগানের শ্রমিক, দিনমজুর ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গেও দ্রুত মিশে যেতে পারতেন বন্ধুর মত। তাদের ভাষায় তাদের সমস্যা অনুভব করে তিনি তাদের মনের ব্যথা বা কষ্ট বুঝতে পারতেন। ক'জন পারে বলুন তো ওদের সঙ্গে এভাবে মিশতে। বিমলদা পারতেন। রাজনীতিবিদরা সাধারণত সাহিত্যের ধারে কাছে আসতে চাননা। অথচ, আমরা দেখি তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচির ফাঁকে তিনি নিরলস ভাবে গল্প উপন্যাস লিখে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষের বাস্তব জীবন-ছবিকে তুলে ধরতেন। বিরল এই গুণ আমরা খুব একটা দেখিনা অন্যদের মধ্যে। ত্রিপুরা বিধানসভার ভেতরে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিধায়ক, মন্ত্রী বা অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর ভূমিকা এককথায় যেমন অসাধারণ ছিল তেমনি জননেতা হিসেবেও তিনি ছিলেন মানুষের হৃদয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত এই জননেতা সম্পর্কে বিরোধীদলের সদস্যরাও ছিলেন অনেকটা দুর্বল। শুনেছি তিনি যখন বিধানসভায় বলতে উঠতেন তখন বিরোধীরা খুব একটা হৈ চৈ বাঁধাতো না। অধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি আইনসভাকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবেও তিনি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

আমাদের রাজ্যের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা যে জাতিগত সমস্যা, একটা জাতিগোষ্ঠীর জাতিসত্তা গঠনের সমস্যাকে যে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত তা একেবারে ছোট বেলা থেকেই বিমল সিংহ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি আজীবন ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির বিষয়টিকেই সবচাইতে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সম্প্রীতির প্রশ্নে তিনি কোনরূপ আপোষ করেন নাই। তাঁর গল্প উপন্যাস, আলোচনা ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে সম্প্রীতি বা মেলবন্ধন। তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের ভাষা শিখে তাদের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি এই রাজ্যের আদিবাসীদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যের বহু আদিবাসী মানুষ চোখের জল ফেলেছেন। সম্প্রীতির সংগ্রামে তিনি ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। বিমল সিংহ আরও বহুকাল বেঁচে থাকবেন এই রাজ্যের মানুষের হৃদয়ে। তাঁর লেখা গল্প উপন্যাসগুলিকে সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা উচিত। 'বসনের ঠাকুরমা' বিমল সিংহের একটি মূল্যবোধভিত্তিক গল্প। যা স্কুলের পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই বর্ণময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে একটি গ্রন্থের মধ্যে নিয়ে আসার এক মহৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন 'নব চন্দনা প্রকাশনী'। 'নব চন্দনা'র সঙ্গে বিমল সিংহের আন্তরিক সম্পর্ক বহুদিনের। 'নব চন্দনা প্রকাশনী' থেকেই তাঁর গল্প উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে। একটা গভীর দায়বদ্ধতা থেকেই 'নব চন্দনা' এই প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। যার জন্য তারা রাজ্যবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন।

বিমল সিংহ — অন্য মানুষ

শংকর দাস

বয়সে ছোট হলেও কৃতীতে যে অনেক বড় অথচ যার সম্পর্কে বলতে গেলে বা লিখতে গেলে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াবার কোন প্রয়াসের দরকার পড়ে না এমনই কাছের এবং আপন ছিল বিমল। বিগত ২৯ বছর আগে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল খোয়াই শহরে-ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য কনভেনশন উপলক্ষে এবং তারপর থেকে যে পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে হঠাৎ সে জীবনের এমন নৃশংস সমাপ্তির বিরাট আঘাতকে উপেক্ষা করে লিখতে যাবার যন্ত্রণাটুকু অমানসিক ও অসহনীয়। তবু কবির উপলব্ধিকে পাশে রেখে হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোর পীড়াটুকু আজ বোধ হয় দায়বদ্ধতারই অন্য এক সাধন। তাই বিমল সম্পর্কিত প্রথম উজ্জ্বল স্মৃতি অকীর্ণ হয়ে আছে সেই খোয়াইয়ের কনভেনশনের দু'টি দিনে। ষাটের দশকের শেষ পাদে তখন দলে দলে শিক্ষিত মেধাবী তরুণ তরুণীরা বামপন্থী মতবাদ ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলগুলি থেকে এসে রাজ্যের দরিদ্র ও গরীব মানুষের দৈনন্দিন আন্দোলনে শরিক হচ্ছেন। বিমল ছিল সে সময় কৈলাসহর কলেজের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। আরও কিছু ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে সে এসেছে। মানিক, বাদল, বিজন, গৌতম আজ যারা রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বে আসীন, সকলেই সেদিন খোয়াইয়ে জড়ো হয়েছিলেন। এদের সকলের মধ্যে গৌরবর্ণ শ্মশ্রু গোঁফ বিনিন্দিত দীর্ঘদেহী এই যুবাকে দেখে সকলেই আকৃষ্ট হয়। আমিও। পরিচয় হয়। সেই রাজ্যভিত্তিক ছাত্র কনভেনশটি ছিল মূলতঃ তরুণ ছাত্র সমাজকে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত করার একটি অধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে সেদিন কমঃ নৃপেন চক্রবর্তী লেনিনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুই কৌশল, কমঃ বীরেন দত্ত দ্বন্দ্বমূলক

রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহকে

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ ও কমঃ দশরথ দেব মার্কসবাদের আলোকে ত্রিপুরা তথা ভারতের উপজাতিদের জাতিরূপে উত্তরণের সমস্যার উপর বিশদ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থিত করেন। মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য তরুণ মনের দুর্নিবার সংকল্প সকলের সাথে বিমলকেও টেনে নিয়ে এসেছিল গণআন্দোলনের দুর্বার স্রোতে। সে এক তুমুল সময়।

দ্বিতীয় স্মৃতি ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে যখন সারা ভারতে জরুরী অবস্থা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে আধা ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে সমস্ত গণ আন্দোলন স্তব্ধ, ঠিক সেই অবস্থায় কলেজ স্কোয়ারে সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ এক কালক্ষণে বিমল ও আমি বসেছি। বিমলের ডেরা তখন শিয়ালদার কাছে জাস্টিস মন্মথ মুখার্জীর গলিতে অবস্থিত ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে। আমি টালিগঞ্জ থেকে আসি। চারিদিকে এক প্রতিকূল ও আতঙ্কময় পরিবেশ। বিমল তার ঝোলা থেকে কিছু লেখা কাগজ বের করলো। 'বসনের ঠাকুরমা' গল্পটির অমার্জিত পাণ্ডুলিপিটির সম্ভবতঃ আমিই প্রথম শ্রোতা। আমাদের মধ্যে বিমল সবচেয়ে বেশী জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। তার নিজ সম্প্রদায়ের মণিপুরী ভাষা ছাড়াও সে গড়গড় করে ককবরক্ ভাষায় কথা বলতে পারতো তেমনি সাহেব সুবো বা কনভেন্টে পড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চৌকশ ইংরেজীতে বলে যেতে পারতো। কিন্তু যে সুগভীর অনুসন্ধিৎসা ও অভিনিবেশ থাকলে একটি সমাজ বা একটি শ্রেণীর জীবনচর্চার সকল খুঁটিনাটি একজন সাহিত্যিকের, ধরা পড়ে সেই পরমাশ্চর্য্য সাধন যে বিমল কবে করায়ত্ত করেছে তা আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল 'বসনের ঠাকুরমা' গল্পটি শোনার আগে পর্যন্ত। এক ঈর্ষা মিশ্রিত শ্রদ্ধায় আমি সেদিন অভিভূত হয়েছিলাম। তারপর থেকেই যখনই আমরা একা হয়েছি রাজনীতি থেকে সাহিত্য, সৎ ফিল্ম ও শিল্পচর্চা সংক্রান্ত সব বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করতাম। আশেপাশের মানুষজন- তাদের সমস্ত মহত্ব ও ত্রুটি গিয়ে বিমলের চোখে ধরা পড়তো। ফলে সে খুব অল্পেতেই যে কোন মানুষকে নিজের করে ফেলতে পারতো।

১৯৯৭ সাল। রাত্রিবেলা ফোন। কাল সকালেই আমাকে তার সরকারী কোয়ার্টারে যেতে হবে। আমি যেন তৈরী হয়ে যাই। যাব পেঁচারথল সংলগ্ন নবীনছড়ায় বিজু উৎসবে যোগ দিতে। দুটি দিন বিমলের সঙ্গে কাটলো। গাড়ীতে বিমলের বোনের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষায় অপূর্ব সব গীত এবং গান শুনে প্রাণ ভরে গেল। বিমলের মুখে স্মিত হাসি। সেই হাসিই আবার উধাও হলো যখন ধর্মনগরের কাছেই এক প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনের আগে নতুন গড়ে উঠা কেন্দ্রটি নিয়ে সরকারী অফিসার ও ঠিকেদারকে আরও তাড়াতাড়ি কাজটি শেষ হচ্ছে না কেন বলে যখন বকাঝকা সারলো। ফিরার পথে 'ক্যামনে কাজ করবেন। এই হকুনের ..... ইত্যাদি বলে নিজের মনের ক্ষোভ সাঙ্গ করলো। কোর্টে আছি বলে আমিও বিমলের কম ধমক খাই নি। ফোনে যখন কোন সরকারী চিকিৎসক তার বদলীর অর্ডার কোর্টে এই বলে injunction নিয়েছে যে বদলী হলে তাঁর আগরতলার রোগীদের খুব ক্ষতি হবে। সে injunction পেয়েছে এবং এখনও আগরতলাতেই আছে। আদালত এবং আমাদের সকলের উপর সে রাগ পড়েছে কারণ ডাক্তারের অভাবে মফস্বলের ঐ হসপিটালটি কানা হয়ে আছে। জনসেবা বা জনস্বার্থ রক্ষার কাজে কত বাধা বিমলকে মাঝে মাঝে হতাশ করেছে তা দেখেছি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সমস্যাটির সমাধানে নিজেই প্রসন্ন মনে ব্রতী হয়েছেন। এই আমাদের বিমল। বিমল নেই এটা উপলব্ধি করতে আমার মতো অনেকেরই আরো কিছুকাল লাগবে।

— রাজধানী আগরতলা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৮

সাহিত্যিক বিমল সিংহ

রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা

"তোমরা অনেকেই ককবরক গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লিখছ তা ভালো কথা। কিন্তু শুধুমাত্র তাতেই কি ককবরক সাহিত্য সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়ে উঠবে, সমৃদ্ধিলাভে ধন্য হবে ককবরক সাহিত্য ভাণ্ডার? মনে রেখো, অনুবাদ কর্মও যে কোন ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। তোমাদের ককবরক সাহিত্য এ দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। বিশ্বসাহিত্য থেকে সেরা ও কাব্য সমৃদ্ধ কিছু কিছু কাহিনীর ককবরক অনুবাদের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ধরো মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য। সংস্কৃতে রচিত এই কাব্যকাহিনীটি ককবরকে অনুদিত হলে ককবরক সাহিত্য ভাণ্ডারে অনেক আলঙ্কারিক সমৃদ্ধ ককবরক শব্দ সৃষ্টি ও সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। এ কাজটিতে জরুরী প্রয়োজন এবং কর্তব্য হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া ককবরক সাহিত্য কর্মীদের একান্তই দরকার। তুমি ইচ্ছে করলে এই কাজটিতে হাত দিতে পার।" সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের মাস সাতেক পূর্বে কোনও এক সন্ধ্যায় নিজ সরকারী বাসভবনে বসে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুলেখক ও সাহিত্যিক বিমলদা নিজস্ব ঢঙে একান্ত আলোচনায় আমাকে অনেকগুলো কথার মধ্যে এই কয়টি কথাও বলেছিলেন। ককবরক সাহিত্য সৃষ্টির কর্মজোয়ারে নিজেকে আরও বেশী কবে আত্মনিয়োগে অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। মানুষ বিমলদা বা সাহিত্যিক বিমলদা সম্পর্কে দু/একটি কথা লিখতে গিয়ে এই কথাগুলো বারবারই আমার মনে পড়ছে। আজ বিমলদা আমাদের সম্মুখে নেই ঠিকই, কিন্তু তার মুখে নিঃসৃত এই কয়টি কথা ককবরক সাহিত্য বিকাশের পথে অনন্তকাল ধরে পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। সেইদিক নিয়ে চিন্তা করলে তিনি যে কোন ভাষার সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রেও দিক নির্দেশক এক মহান ব্যক্তিত্ব। অন্য একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্যের কত বড় এক দরদী বন্ধু ছিলেন বিমলদা — এ দু/একটি কথার মাধ্যমেই তা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই সকলের অজ্ঞাতে উগ্রপন্থীদের বুলেটের আঘাতে মানবদরদী বন্ধুবৎসল ও পরানুরাগী বিমলদাব মৃত্যু ঘটেছে। বিমলদা আজ আর নেই — তা ভাবতেই পারছিনা। মানুষ যে এত নৃশংস হতে পারে তা সহজ ও সরলমনা বিমলদার জানা ছিল না। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করেছিলেন সহজ ও সরলভাবে বুকভরা দরদী মন নিয়ে। তার এই গুণাবলীকে কানাকড়িও মূল্য না দিয়ে ইতিহাসের নিষ্ঠুর আঘাত বিমলদাকে আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছে।

এখানে আমি রাজনীতিবিদ অশেষ গুণের অধিকারী বিমলদা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। লেখক ও সাহিত্যিক বিমল সিংহ সম্পর্কেই দু/একটি কথা লিখতে চাইছি। সারাদিন রাজনীতির কাজে ডুবে থেকেও তিনি সাহিত্য কর্মেও সমানভাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো লেখাই তাঁর আঙ্গুলের কলম ছুঁইয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর লেখা পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস 'লংতরাই', 'তখাপাড়ার ইতিকথা', 'করাচি থেকে লংতরাই', 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা' ইত্যাদি। গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে,'আলোর ঠিকানা',

'মনাইহাম' ইত্যাদি। তাঁর প্রতিটি লেখা রচনা রোমান্টিকতায় ভরা। লেখাগুলো একবার চোখ বুলালে শেষ না হওয়া অবধি উঠা যায় না। এমনই তার রচনা শৈলী, এমনই তার প্রকাশভঙ্গী। যত পড়ি ততই পড়তে ইচ্ছা জাগে। একবারে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে 'লংতরাই' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে স্থান পেয়েছে যা ত্রিপুরার ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্বের সংযোজন। তাঁর রচনার চরিত্রগুলো যেন এক একটি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। লেখকের লেখনী কৌশলে তাঁরা বাস্তব জগতের রক্ত মাংসের মানুষে পরিণত হয়েছে। এই বাস্তববাদী লেখক তাঁর ক্ষুরধার লেখনীও চালু করেছেন সমাজের শোষিত, নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত জনমানসের জীবনমুক্তির জন্য, তাদের দুর্বার প্রেরণা হিসাবে মেহনতি মানুষের, হতদরিদ্র মানুষের দৈন্য দুর্দশাই যেন তার রচনায় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তাঁর অসীম দরদ ছিল উপজাতি জনগণের প্রতি। তাই 'রাইমা উপত্যকার উপকথা' নামক ছোটগল্পে উপজাতিদের উপর মহাজনী শোষণ এবং এর প্রতিকারের চিত্র জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাই সে গল্পে পাহাড়ী, সরলমনা কুসুমের প্রতি মহাজনদের ব্যবহার সম্পর্কে বলা আছে। 'মহাজন দশ টাকার নোট দিয়ে বলল — এই টাকা কিন্তু আগামী পৌষমাসে একমণ ধান দিয়ে শোধ করবি, আর না হলে তহশীলদারকে দিয়ে ক্রোকের নোটিশ পাঠাব।' মহাজনী শোষণের কি নির্মম চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে যা আজও এর অবশেষটুকু বিদ্যমান। তিপ্রা জনজাতিরা ছিল অতি সৎ, কোনদিন তাদের মনে চুরির অপরাধটুকু অতীতে দেখা যায়নি তা বলতে গিয়ে লেখক গল্পের এক স্থানে বলেছেন — "গরীব জুমচাষী হলেও কোনো দিন চুরি করার অপরাধ-বোধ ওর মনে জন্মেনি।" তিপ্রা জনজাতিদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ওতপ্রোততবে জড়িত না থাকলে, তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে কি এই সত্য কথাটি তাঁর লেখনীতে বেরিয়ে আসতে পরে। বন বিভাগের নিদারুণ জুলুমও লেখক বিমলদার নজর এড়ায়নি। সেখানে বলা হয়েছে — "........... এই তালিকায় যাদের নাম আছে তাঁদের সবাইকে আগামী সাত দিনের মধ্যে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ এদের ঘরবাড়ী নাকি সরকারী খাস এলাকার মধ্যে পড়েছে।" বন বিভাগের জুলুমে কত শত শত পরিবার তাদের জীবিকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে, ডুম্বুরে বিদ্যুৎ প্রকল্পের নামে কত হাজার হাজার পরিবার তাদের সাত পুরুষের ভিটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে — এখবর কে রাখে? কিন্তু জনজাতির জনগণের অভিন্ন সুহৃদ লেখক বিমলদা শত রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের কথা ভুলেননি। আপন কলমের তুলিকায় অতি সুকৌশলে তিনি বই-এর পাতায় তা অনাগত উত্তরসরিদের জন্য সযতনে রেখে গেছেন। বাঙালী হলেই পাহাড়ীর শত্রু হয় না এবং সব বাঙালীই খারাপ হয় না, এ কথা বুঝাতে গিয়ে তিনি গল্পের চরিত্র তখিরায়ের মুখ দিয়ে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। বীরমণি তখিরায়কে জিজ্ঞেস করেছিল — "খুড়ো এই বাবু দু'জন বাঙালী হলেও আমার খুব ভাল লেগেছে। তখিরায় হাসতে হাসতে বলল — ওরে বোকা, মানুষকে যারা ভালবাসে তারা বাঙালী, পাহাড়ী ভেদাভেদ করে নাকি?". মানুষকে তিনি মানুষ হিসাবেই দেখতে চেয়েছিলেন, জাতি হিসাবে নয়। আজকাল যখন ত্রিপুরায় ভেদাভেদের রাজনীতিতে মানুষ বিভ্রান্ত , পাহাড়ী বাঙালীদের মধ্যে সমস্ত অবিশ্বাস্যতার বাতাবরণ দূর করে ঐক্য ও ভ্রাতৃবন্ধনের প্রয়োজন, শান্তি সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে ফিরিয়ে আনা একান্তই জরুরী তখন

স্পষ্ট বক্তা ও শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাহক বিমলদার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

বিমলদা ছিলেন আশাবাদী লেখক। হতাশায় তিনি কোনদিন ভোগেননি। হতাশা তাকে নিরাশ করতে পারে না। তিনি শত ব্যর্থতার মধ্যে, দুঃখের মধ্যে আশায় বুক বেঁধে চলার পক্ষপাতি। তাই উপজাতি ছিন্নমূল মানুষগুলোর হাজার জীবন যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি মুক্তির আস্বাদ পান, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখেন। গল্পের এক স্থানে তিনি বলার চেষ্টা করেন — "ছিন্নমূল মানুষগুলো আবার টং বাঁধবে। উপত্যকায় আবার বুখুগনুই গল্পের গুঞ্জন উঠবে। টং-এ টং-এ আবার টিয়া ময়নার গানের সাথে পাহাড়ী মানুষদের স্নিগ্ধজীবনের কল্লোল উঠবেই। সবাই রইল তারই অধীর অপেক্ষায়।" লেখকের এই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে ফলতে শুরু করেছিল। পাহাড়ী জনজাতিরা শিক্ষায় সভ্যতায় ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল, তাদের সাহিত্য বিকাশের মই বেয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু দৈব্যের বা সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম বড়ই নিষ্ঠুর ও নির্মম। তিনি এর আরম্ভটুকুই দেখে গেছেন, শেষটুকু দেখে যেতে পারেন নি।

পাহাড়ী ত্রিপুরায় জন্মাবধি বাস করার পরও আমরা ত্রিপুরার প্রাকৃতিক পরিচয় কতটুকু-বা জানি। পাহাড়ীবাসীদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, হতাশা ব্যর্থতা, ভালবাসা প্রেম — এসব কতজন কতটুকু হৃদয় দিয়ে অনুভব করি? কিন্তু বিমলদা ছিলেন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম। তিনি 'তখাপাড়ার ইতিকথা' উপন্যাসে বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার নদী নালা, ছড়া পশুপাখি, বন্য জন্তু এসবের যে নিখুঁত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনেক কলমবাজদেরই হিংসার উদ্রেক করবে। কিভাবে শিকারীরা কাঁধে বন্দুক রেখে উপত্যকার ছড়ায়, পাহাড়ে শিকার করে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, রাজ আমলে রাজার অনুমতি নিয়ে তিপ্রা জনগণ কিভাবে ডাকাত বা বন্যজন্তুর উপদ্রব মোকাবিলার জন্য এবং গ্রাম রক্ষার জন্য নানাধরণের বন্দুক মজুত রাখে। তখনকার দিনে রোয়াজা বা গ্রাম্য সর্দারদের জনগণ কি দৃষ্টিতে দেখতেন ইত্যাদি। এত নিখুঁত বর্ণনা বিমলদার মতো বাস্তববাদী এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন লেখকের পক্ষেই সম্ভব।

বন্য জন্তু হাতি ঘুম পেলে কি করে, তারা কিভাবে ঘুমায়, তারা কিভাবে রমণসুখে লিপ্ত হয় তারও নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে লেখকের এই রচনায়। তাছাড়া জুম চাষের পদ্ধতি, জুমে কি কি ফসল উৎপন্ন হয়, গাইরিং কি, এটা তিপ্রাদের কি কাজে লাগে এত তথ্য বিমলদা পেলেন কোথায়? জুমচাষী জনজাতিদের সঙ্গে আত্মিক মেলবন্ধন ছাড়া কি এতো নিখুঁত বর্ণনা সম্ভব। এক কথায় তিনি তাঁদের হাঁড়ির খবর রাখেন, তাদের সুখ দুঃখে ব্যথিত হন। তাই তো সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা তাঁর রচনায় স্থান পায় ও পাঠকবর্গ উপকৃত হন। তাছাড়া তখাপাড়ার ইতিকথায় সইনাইহা ও পন্দিরুং-এর যে প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করেছেন তা বাস্তবজীবনের মৃত্যু পথযাত্রী হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেই চিরন্তন আশাবাদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি ত্রিপুরার বিভিন্ন জনসমাজের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আর ছিল অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। তখাপাড়ার ইতিকথায় তা এভাবে প্রকাশ করছেন — 'অচাই এসে পুজো দেয়। মুরগীর ভুরোল কেটে ছড়ার জলে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে — রোগীর অবস্থা বেশী ভাল নয়। প্রতিবেশী শত্রুতা করে অপদেবতা চালান করেছে। .... ইত্যাদি। এই উপন্যাসে পন্দিরুং-

এর রোগ ছাড়াবার জন্য সইনাইহা কাকের ছানা সংগ্রহের জন্য গর্জন গাছে উঠেছিল। কারণ কাকের ছানা দিয়ে পুজো করলেই অপদেবতা দূর হবে। পন্দিরুং অসুখ সেরে উঠবে। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস যে, সইনাইহাকে সেই গাছের উপরেই কাকের ঠোকর খেতে হয়। হাজার হাজার কাকের ঠোকরে সে মাটিতে পড়ে যায়। শুধু পড়ে থাকে জীবনহীন দুমড়ানো মুচড়ানো শরীর। এ গল্পের মূল কথা হলো — মাটির সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, সে কঠোর জীবন সংগ্রামে টিকতে পারে না। তার ধ্বংস অনিবার্য। কত সুকৌশলে লেখক বিমল সিংহ জাগতিক চিরন্তনী নিয়মকে পাঠকের কাছে উপহার দিয়েছেন তা ভাবতেও অবাক লাগে।

তাঁর 'করাচী থেকে লংতরাই' উপন্যাসেও সাহিত্যিক বিমল সিংহ তার সূক্ষ্ম সাহিত্য রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং বিমান দুর্ঘটনা ও তা থেকে প্রচুর সোনা যিনি পেয়েছেন সেই কার্তিক ত্রিপুরার সামগ্রিক ঘটনার আড়ালে পাহাড়ী অরণ্য সন্তানদের শতাব্দীব্যাপী সরলতা, তাদের উপর শোষণ এবং চেতনাহীনতার নির্মম পরিণামের কথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেজন্য তিনি অগ্রসরমান জনগোষ্ঠীর মানুষকে তাদের যোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে বলেছেন। গল্পের শেষে তিনি বলেছেন — "নিষ্পাপ অরণ্য সন্তান, সোনার পাহাড় মাথায় এলেও শতাব্দী ধরে যে ঘুমের ঘোরে পড়ে আছে, সে ঘুম ভাঙুক, তারা জেগে উঠুক — অগ্রসরতম মানুষরা যদি তা না চায়, হাজার কার্ত্তিক যুগে যুগে পথে পথে এমন করেই ঘুরবে।" শতশত বৎসর ধরে যে অরণ্য সন্তানেরা শিক্ষায়, দীক্ষায় সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে পিছিয়ে আছে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ পায় না। তাদেরকে যে সুযোগই দেওয়া হোক না কেন, সেই সুযোগের সুফল তারা পাবে না যদি তা আন্তরিক না হয়। তাদের চোখের ঠুলি খুলতে হবে, চোখের ছাই মুছে ফেলতে হবে। নতুবা তারা আলোর দিশারী পাবে না। এ কাজ করতে পারে একমাত্র অগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানুষ। নতুবা তা হবে অশ্বডিম্ব প্রসবের সামিল। সাহিত্যিক সুলেখক বিমলদা এখানে অগ্রসরতম জনগোষ্ঠীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেন নি। এখানেই তার সার্থকতা। পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির সার্থেই এটা প্রয়োজন। এই বাস্তব দিকটিই তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।

আজ আমরা বিমলদার মতো একজন মহান রাজনীতিক নেতাকেই শুধু হারাইনি, হারিয়েছি একজন ক্ষুরধার লেখককে, সাহিত্য অঙ্গনে যার প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী। যে লোকটি মণিপুরী মাতৃভাষা ছাড়াও বাংলা, ককবরক, ইংরেজী, হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, লিখতে পারেন, সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, সুনাম অর্জন করতে পারেন এবং জাতি-উপজাতি প্রত্যেকটি মানুষকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করে সকলের অকৃপণ ভালবাসা পেতে পারেন — এই সুবিশাল ব্যক্তিত্বের বিয়োগব্যথা সত্যিই অপূরণীয়।

— রাজধানী আগরতলা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৮

অস্তাচলগামী সূর্য থমকে গেলো রূপসপুরের আকাশে

প্রবীর সরকার

৩১শে মার্চের প্রখর সূর্যতপ্ত মধ্যাহ্নে ধলাই নদীর আভাঙ্গা ঘাটে বুলেটবিদ্ধ হলো গণতন্ত্রের সৌধচূড়া, সভ্যতার সোনালী মিনার। কয়েকটি কাপুরুষ ও রক্তলোলুপ হিংস্র জানোয়ার মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিদ্ধ করল অমল ধবল দুটি জীবনকে, যে জীবনগুলি ছিল ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মিলিত প্রাণশক্তিও। এমন জীবনের পরিমাপ করার ক্ষমতা নেই মানবতা বিরোধী শ্বাপদদের। সারা ত্রিপুরার সাথে সাথে সারা ভারতের সচেতন মানুষ শোকাকুল হয়ে পড়লেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ ও তার ভাই বিদ্যুৎ সিংহের এই হত্যাকাণ্ড ক্ষণিকের জন্য হলেও সবাইকে হতভম্ব করে তুলেছিল। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলই বারুদের স্তপের উপর দাঁড়িয়ে, যখন দেশদ্রোহী শক্তি, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, সভ্যতা ও গণতন্ত্র বিরোধী অশুভ শক্তি শুধু অস্ত্র আর ধ্বংসের ভাষায় কথা বলতে চাইছে, বন্দুকের নলের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে আমাদের দেশপ্রেম, আমাদের ঔচিত্যবোধ, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও মনুষ্যত্বকে। আর তার বিপরীতে বুক চিতিয়ে লড়াই করে চলছে অগণিত সাধারণ মানুষ, জাতি -উপজাতি, বোড়ো-অহমিয়া, নাগা- মণিপুরী। এইসব সংহতিকামা, ভারতের অখন্ডতায় অটল বিশ্বাসী, শান্তি সম্প্রীতি ও ঐক্যের মশালবাহী মানুষের অগ্রণী সেনাপতিদের একজনই ছিলেন ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রা বিমল সিংহ, ছাত্র-যুব আন্দোলনের অগ্রণী পথিকৃৎ, শ্রমিক কর্মচারীদের দরদী সংগঠক, ত্রিপুরী, রিয়াং, মণিপুরীদের আত্মার আত্মীয়, সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মরমী সহযাত্রী এবং গণতন্ত্রকামী মানুষের নিরলস সহযোদ্ধা। তাঁর হত্যাজনিত আঘাত তাই শতধা বিস্তৃত, ক্ষতি অমোঘ এবং পরিমাপহীন। এই আঘাত তো শুধু ত্রিপুরার নয়, সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল কিংবা ভারতের নয়, সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর, মানবিক বিশ্বাসের উপর চরম আঘাত। যে ভয়ংকর সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের নিত্য নৈমিত্তিকতার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তাতে বিমল সিংহের মত একজন দেশপ্রেমী, মানবতাবাদী, অসমসাহসী নেতার মৃত্যু স্তম্ভিত, বজ্রাহত করেছে সবাইকে। এই কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছে সারা দেশময়। সংসদের উভয় সভাতেই সদস্যরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে কি বৈরীরা অস্ত্রের মুখেই শেষ কথা বলবে? প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই অপকর্মকে মহান ভারতীয়ত্বের প্রতি অশনি সংকেত বলেই চিহ্নিত করেছেন। আশ্বস্ত করেছেন কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার। রাষ্ট্রপতি শোক প্রকাশ করেছেন, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরার মানুষ ঘোষিত অঘোষিতভাবে, স্বতস্ফূর্ততায় দেড় দিন হরতাল পালন করেছেন ক্ষোভ, শোক, ঘৃণা এবং শপথকে সংহত করে।

আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতীয় গণতন্ত্রের পথ বারেবারে রক্ত কলুষিত হয়েছে। এদেশে সন্ত্রাসবাদী, উগ্রপন্থী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে দেশপ্রেমী, গণতান্ত্রিক সাধারণ মানুষের আক্রান্ত হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা নিহত হওয়ার ঘটনা কম নেই। রাষ্ট্রনায়ক, দেশনায়ক কিংবা জনপ্রতিনিধিও নিহত হয়েছেন বারেবারে, লজ্জাজনকভাবে। মহাত্মাগান্ধী, ইন্দিরাগান্ধী, হেমন্ত বসু, রাজীব গান্ধী, বিয়ন্ত সিং, বিমল সিংহ ঐ সব বীভৎস, নারকীয় হত্যাকাণ্ডের অমর শহীদ। ঐসব হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে কখনো কখনো সারা দেশময় দাঙ্গা, সন্ত্রাস, নৃশংসতা দেখাও দিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ,

চেতনার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত মানুষ, তেমন বিপথগামী হননি। বিশাল শোককে ততোধিক বিশাল আদর্শবোধের আধারে সংহত, সংযত করেছেন। দীর্ঘ ছয় দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মানুষ ঘৃণাকে পরিণত করেছেন বর্মে, ক্ষোভকে পরিণত করেছেন দৃঢ়তায়, শোককে পরিণত করেছেন আদর্শ চেতনার মশালে, ক্রোধকে পরিণত করেছেন শপথে। সরবে, নীরবে, অশ্রুতে, খর দৃষ্টিতে নিজেদেরই নিজেরা প্রশ্ন করেছেন আর কতকাল? আর কত? গণতন্ত্রের জন্য আর কত মূল্য দিতে হবে আমাদের? কবে ঐ বৈরীদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। কবে বুঝবেন এপথ শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। মঙ্গলকে আহ্বান করে না।

বিমল সিংহও বিধানসভায় তাঁর শেষ ভাষণে গত ২৬ মার্চ বৈরীদের শুভবুদ্ধি জাগবে বলেই প্রত্যাশা করেছিলেন। রাজ্যের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মত স্বাস্থ্য পরিষেবাও যথাযথ হতে পারছে না ঐসব বৈরী কার্যকলাপের জন্য। সঙ্গত কারণেই তাঁর উদ্বেগ ছিল সীমাহীন। অথচ তখনও তার ছোট ভাই বৈরীদের কবলে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বৈরীরা তাঁকে অপহরণ করে। যে ভাইকে মুক্ত করে আনার জন্য আলোচনা করতে গিয়েই নরঘাতী হিংস্র হায়েনাদের হাতে প্রাণ দিতে হল অন্য দুই ভাইকে। বিমল সিংহ ও বিদ্যুৎ সিংহকে। ঐসব বৈরীরা তো গত প্রায় দুই দশক ধরে অসামাজিক, অমানবিক ক্রিয়াকলাপেই মত্ত। অপহরণ, খুন, অগ্নি সংযোগের মধ্য দিয়ে কোন সুখের স্বপ্ন দেখছে ওরা? কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে নিরীহ নিরপরাধ মানুষদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে? বিমল সিংহওতো ছিলেন ঐসব আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত অপহৃত ত্রিপুরাবাসীদের শরীক। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অপমৃত্যু ঘটলো শান্তিময়, সম্প্রীতিময়, অগ্রগতির পথে ক্রমশঃই আগুয়ান ত্রিপুরার একজন কর্মতৎপর, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণ, অকুতোভয়, আদর্শ সচেতন সেনানীর। ১লা এপ্রিলের সারাদিন কমলপুরের এবং ত্রিপুরার বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল সহস্রজনের হতবাক দীর্ঘশ্বাসে। শবানুগমনে, শোক মিছিলে সামিল সহস্র মানুষ তো বটেই অন্যরাও বুকের গভীরে সঞ্চিত করেছেন ঘৃণার বারুদ, শপথের দীপ্তি। মানুষেরই বর্বরতায়, পৈশাচিকতায়, হিংস্রতায় লজ্জিত সূর্য যখন গেলো অস্তাচলে রূপসপুরের দুটি শ্মশানে জ্বলতে থাকা লেলিহান অগ্নিশিখাও যেন সমবেত অশুস্তি শবযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছিল — "তোমরা যাও/ধু ধু শূন্য ওই মাঠে গিয়ে আবার দাঁড়াও /কিন্তু শুধু নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকোনা/হাতে হাত রাখো, চক্ষু দু'হাতে ঢেকোনা/কাজ পড়ে আছে তাই/এখন সবাই/ভোলো দুঃখ ভোলো শোক/যে মালা ছিঁড়েছে তাঁকে আবার নতুন করে গাঁথা হোক/যা জীবন, তাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে/কী করে বাঁচাবে, যদি অতর্কিতে মৃত্যু দেয় হানা?/যা মৃত্যু, তাহলে তাকে মারো/তাহলে নতুন করে জীবনের জয়ধ্বনি দাও/যা মারে মৃত্যুকে, সেই উদ্বোধনী সঙ্গীত শোনাও। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

এখনো অনেক কাজ বাকী। ধলাই, দেও-মনুর বিস্তার্ণ অববাহিকায়, লংতরাই, শাখানটাঙের কোলে কোলে ছড়িয়ে থাকা জনজীবনের সাথে, কঠিন কোমল প্রকৃতির সাথে, বিশ্ব মানবতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে যে মানুষ জন্মাবধি ছিলেন সহমর্মী, সহযাত্রী, পাথরেও ফুল ফোটানোর জন্য যে মানুষ নিজের জীবন দিয়ে গেলেন, অসীম বিশ্বাসে এবং অকৃত্রিম মানবতায় হারালেন প্রাণ — তাঁর আরাধ্য কাজ এখনো বাকী। শান্তিপূর্ণ, সম্প্রীতিময়, অগ্রসর ত্রিপুরা গড়ার কাজ এখনো অসমাপ্ত। এখনো যেতে হবে অনেকদূর—বৈরীতার অবসানে, বিচ্ছিন্নতাবাদের অবলুপ্তিতে, অপহরণ, খুন, গৃহদাহ, নারকীয়তা ও পৈশাচিকতার নিশ্চিহ্নতার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ ত্রিপুরার লক্ষ্যে। ও পথে গেলেই বিমল সিংহের রক্ত ঋণ শোধ হবে।

—প্রেস রিলিজ, ২রা এপ্রিল, ১৯৯৮

তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার, ত্রিপুরা সরকাব

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মতিলাল সরকার

খবরটা শোনামাত্র স্কুল থেকে ছুটে এলাম আগরতলার দিকে। হাফানিয়া এসে দেখি প্রায় পাঁচশত মানুষ চলছেন ক্ষোভ, ঘৃণা ও ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করে আগরতলার দিকে।

বিনা মেঘে বজ্রপাত। একেবারে অবিশ্বাস্য। এইটুকু সময়ের মধ্যে আমার সামনে পৃথিবীটা যেন উল্টে গেল। যেন সব কিছুই সংযোগবিহীন। আকাশটা কি সত্যিই ভেঙ্গে পড়ল। নিজেকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। এসব কী দেখছি। কি-ই বা শুনছি? সত্যিই কি আমাদের এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল? আগরতলায় এলাম, বুঝলাম সব শেষ। এ নিয়ে সামান্যতম আশা করার মত কিছুই রইল না। সত্য সত্যই কমরেড বিমল সিংহ তাঁর ভাইসহ উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। আমি বিশ্বাস না করলেও ঘটনা সত্যি।

তাঁর সঙ্গে একই সাথে ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রবেশ করেছি। ১৯৭৮ সালে। পরপর পনের বছর আমি তাকে বিধানসভায় দেখেছি। তিনি এর পরবর্তী সময়েও বিধানসভায় ছিলেন, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত। তাঁর সম্বোধনের মধ্যে সহোদয়ের মতই প্রীতি-ঘন কণ্ঠস্বর উপলব্ধি করতাম। ব্যবহার ছিল মাধুর্য্যে ভরা। বিধানসভার দুই একটা অধিবেশন পার হবার পর আরও বুঝলাম, বিমল এক ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তার বক্তৃতায় শ্রেণি শত্রুদের জন্য ক্রোধ আর ঘৃণার ফোয়ারা বের হত। চোখা চোখা কথা শুনেও প্রতিপক্ষ তাঁর যুক্তির জালে আটকে থাকতো। মনে হত, প্রতিপক্ষ বিমল সিংহের মুখে। কঠোর ও নির্মম ভাষায় সত্য উদ্‌ঘাটন শোনার জন্য যেন পূর্ব থেকেই প্রস্তুত। কারণ, তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে যেমন ছিল রস, তেমনি ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ। তাঁর দুই একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অবতারণা করতে চাই।

১৯৯১ সালের ৩০ জানুয়ারি। রাজ্যপালের ভাষণের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন কমরেড বিমল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। অত্যাচার আর দুর্নীতির পাহাড় যেন বিধানসভায় তুলে এনেছেন। যেন চাবুকের আঘাতে আঘাতে বারবার আর্ত চীৎকার করে উঠেছে সরকার পক্ষ। কমলপুরের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে ভাষণে। উন্নয়নের নামে অর্থ আত্মসাৎ করার অজস্র কাহিনী তুলে সরকারি অর্থ অপচয়কে সুন্দর করে সবশেষে দুইটি লাইনে সংক্ষেপিত করলেন ঃ "রাজার ঘরের মেনি গাই

হাজার টাকার মরিচ খাই ।"

১৯৯২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যপালের ভাষণের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। উপজাতি জনগণের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছিলেন। তিনি যখন অনর্গলভাবে অত্যাচারের ঘটনাগুলো তুলে সরকার পক্ষকে রীতিমত বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন, ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলা হয়েছিল সুড়সুড়ি দেয়া হচ্ছে।

তাৎক্ষণিকভাবে এই উক্তিটি লুফে নিয়ে কমরেড বিমল সিংহ দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন ট্রাইবেল পেটানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে যদি সুড়সুড়ি হয় তাহলে সেই সুড়সুড়ি দিতে আমি রাজি আছি।

এমনি কমরেড বিমলের অগণিত কতই না মূল্যবান বক্তৃতার সাক্ষী হয়ে রয়েছে

ত্রিপুরা বিধানসভা। তাঁর তথ্য-সমৃদ্ধ বক্তৃতা শুনে অবাক হয়ে ভাবতাম তাঁর সংবাদ সংগ্রহের উৎস কোথায়। বর্তমানে মেঠো বক্তৃতার যে রেওয়াজ চলছে, কমরেড বিমল ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং স্বকীয়তায় অদ্বিতীয়। অবাক হয়ে যেতাম তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা দেখে। রাজ্য থেকে গোটা পৃথিবীতে বিচরণ তাঁর। জাতিসত্তা বিকাশের পথে কী কী অন্তরায়, কোন দেশে এই অন্তরায়ের রূপ কী কী, বঞ্চনা ও হতাশা কিভাবে উগ্রপন্থার জন্ম দেয়, উগ্রবাদী শক্তিকে কোন্ রাজনৈতিক শক্তি কী উদ্দেশ্যে প্রশ্রয় দেয় - এসব বিষয়ে তিনি যুক্তি নির্ভর উপায়ে সকলের সামনে ঢেলে দিতেন। সংবেদনশীল বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে একসাথে গ্রথিত করতে পারতেন।

তিনি ছিলেন নির্ভিক। শত্রুর আক্রমণকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে একা একা আগরতলার রাজপথে ও গলিপথে তাকে বিচরণ করতে দেখা গেছে। এমনকি মন্ত্রী হবার পরও এমনই ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রমিক নেতা। শ্রমিকদের অতি কাছের লোক ছিলেন তিনি। সি. আই.. টি. ইউ-এর সর্বভারতীয় সহসভাপতি ছিলেন তিনি। এই রাজ্যের শ্রমিকরা তাকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করতেন।

বিধানসভার লবিতে দেখতাম, সাংবাদিকগণ তাকে একেবারে ঘিরে বসতেন। তাঁরা ভালই বুঝতেন—দুর্লভ তথ্যাবলী নিঃসন্দেহে পাওয়া যাবে বিমলবাবুর কাছে। তিনি যেন ছিলেন তথ্যসামগ্রীর একটি বিশাল অভিধান। তাঁর সদাহাস্য ব্যবহার এবং সহজ সরল চাল চলন সকলের আকর্ষণের আরেকটি অনবদ্য কারণ ছিল। তিনি যে একজন দক্ষ প্রশাসক, তার প্রমাণ রয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে। স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁর পরিচালনায় নবজীবন লাভ করেছিল। তিনি একটার পর একটা নতুনত্বের সংযোগ ঘটিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরে এবং রাজ্যের চিকিৎসা জগতে। হাসপাতালগুলির অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেন তিনি। তবে তা ছিল তার কাজের শুরুর দিক। আশাকরি এই গতিশীলতা ঈপ্সিত পথে বহাল থাকবে। তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ। তাঁর লেখনী প্রতিভা ত্রিপুরার সাহিত্য ও কৃষ্টির জগতে অভাবনীয় সংযোজন।

যিনি উগ্রপন্থীর নাড়ি নক্ষত্র বিশ্লেষণ করে আমাদের এভাবে সতর্কিত করে গেলেন, তিনি কী করে এদের কবলে পড়ে গেলেন তা ভেবে ব্যথায় বুক ভরে যায়। বিমল সিংহ জীবন বিলিয়ে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে গেলেন নরপশুদের কাছে সরলতার কোন কদর নেই। সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের এবং তাঁদের রাজনৈতিক প্রশ্রয়দাতাদের চক্রান্ত যাতে এক মুহূর্তের জন্যও খাটো করে না দেখি, কমরেড বিমল সিংহ আমাদের সেই হুঁশিয়ারী দিয়ে গেলেন।

জাতি উপজাতি মৈত্রীর পথে কমরেড বিমল সিংহ হলেন এমন এক অক্ষয় সেতু, যাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারো নেই। বরং কমরেড বিমল সিংহকে খুনের মধ্য দিয়ে গণশত্রুরা নিজেদেরই কবর রচনা করল। গণআদালত ও গণআন্দোলন ওদের বিচার করবেই। কমরেড বিমল সিংহ শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু মুর্খ সন্ত্রাসবাদীরা জানেনা — বিমলদের মৃত্যু নেই। জীবনের গুরুত্ব কাজের মধ্যে, বয়সের পরিমাপে নয়। কমরেড বিমল অমর রহে।

— ডেইলি দেশের কথা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৯৮

শ্রমিক ঐক্য সুদৃঢ় করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

চিত্তব্রত মজুমদার

আমাদের সামনে এখন তিনটি বিপদ। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া অর্থনীতির ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে। কল-কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে বাড়ছে বেকারী। এই নীতির পরিবর্তন করে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সি.আই.টি.ইউ সারা দেশে লড়াই করছে। এই লড়াই-এ দেশের স্বার্থে সব ধরনের শ্রমিক সংগঠনকে একমঞ্চে শামিল করা দরকার। সেই সাথে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবসহ সমস্ত অংশের মানুষকে শামিল করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি জাতিতে জাতিতে ধর্মে বর্ণে বিভেদ তৈরি করে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে। শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য অটুট রাখতে সি.আই.টি.ইউ সারা দেশে লড়াই করছে। এই আন্দোলনকে বিনষ্ট করার চক্রান্তেরই শিকার সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী কমরেড বিমল সিংহ। তাই আজকে আমাদের এখানে থেমে থাকলে চলবে না। শ্রমিক ঐক্য সুদৃঢ় করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তৃতীয়তঃ গণতান্ত্রিক অধিকার এবং শ্রমিকদের ন্যায্য প্রতিবাদের উপর বারবার আক্রমণ নেমে আসছে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি কার্যকর করতে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ দুর্বল করতে। সি.আই.টি.ইউ এই নীতির বিরুদ্ধে। তাই বারবার বিভিন্ন মোড়কে শ্রমিক ঐক্য ভাঙতে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত নামানো হচ্ছে। তাই আমাদের কর্তব্য ঐক্য মজবুত রেখে তিনটি বিপদের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই চালানো। দারিদ্র বেকারীসহ সব ধরনের পশ্চাদপদতা দূর করতে ঐক্য অটুট রেখে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি।

কোন শক্তিরই রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যদি না ত্রিপুরার মাটি থেকে কোন সাহায্য না পায়। তাই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে গণঘৃণা সৃষ্টি করুন। তাদের মদতদাতাদের মুখোস উন্মোচন করে তাদের প্রতিও ঘৃণা সৃষ্টি করে জনবিচ্ছিন্ন করুন। এটাই হবে রাজনৈতিক মোকাবিলা। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে তার খেসারত দিতে হবে দেশের সব চাইতে বড় রাজনৈতিক দলকে।

পাঞ্জাবে প্রথমে ভিন্দ্রানওয়ালাকে মদত দিয়ে পরে ব্লুস্টার অপারেশন করতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় এল.টি.টি.ই. কে মদত দিয়ে পরে শান্তি সেনা পাঠাতে হয়েছে। পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে উগ্রবাদীদের সাথে হাত মেলানোর পরিণতির ইতিহাস ভুলে যাওয়ার কথা নয়। জনবিরোধী অর্থনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কমরেড বিমল সিংহের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে হবে।

(৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ বিমল সিংহের হত্যার প্রতিবাদে সি.আই.টি.ইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির ডাকে বিক্ষোভ মিছিলের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ।) *— ডেইলি দেশের কথা, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৮*

বিমল সিংহের মত জনপ্রতিনিধিকে খুন করে গণআন্দোলনকে দুর্বল করা যায় না

মানিক দে

বিমল সিংহ জনগণের প্রিয় নেতা। তাঁর মত জনপ্রিয় নেতাকে সাম্রাজ্যবাদের অনুচররা যেভাবে হত্যা করেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের ক্ষোভকে সংহত করতে হবে এবং ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি ছিলেন সি.আই.টি.ইউ'র সর্বভারতীয় নেতা। শ্রমজীবী মানুষের এই প্রিয় নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমাদের ঘৃণাকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্প্রীতি সংহতি ও ঐক্য রক্ষায় গণদুশমনদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কমরেড বিমল সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। গণআন্দোলনের কর্মীদেরকে, বিমল সিংহের মত জনপ্রতিনিধিদের খুন করে গণআন্দোলনকে দুর্বল করা যায় না। কারণ বিমল সিংহরা আরও অনেক কমরেডকে তৈরি করেন প্রতিনিয়ত। হত্যার রাজনীতি করে বামফ্রন্ট সরকারকে এবং জনগণের ঐক্যকে দুর্বল করা যাবে না। এ পথে রাজ্যের ক্ষমতায়ও ফিরে আসা যাবে না। ওরা সংযত হোন, নতুবা জনগণ উচিত শিক্ষা দেবেন।

যারা মানুষের জন্য, মানব কল্যাণে কিছু করেন জনগণ তাদেরই মনে রাখেন। এরকমই একটি নাম কমরেড বিমল সিংহ। গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে পুঞ্জীভূত করে দেশের দানবীয় নীতির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ষড়যন্ত্র এখানেই শেষ নয়। কেন্দ্রে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী একটি সরকার বসেছে। রাজ্যকে কতটুকু সাহায্য করবে জানি না। কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবি ছিনিয়ে আনতে, শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য শক্তিশালী করার, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ আজ আমাদের নিতে হবে। সি.আই.টি.ইউকে শক্তিশালী করার শপথও আজ আমাদের নিতে হবে। এই শপথকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে কমরেড বিমল সিংহের প্রতি জানাতে হবে আমাদের শ্রদ্ধা।

(৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ বিমল সিংহ হত্যার প্রতিবাদে সি. আই. টি. ইউ'র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির ডাকে বিক্ষোভ মিছিলের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ) *— ডেইলি দেশের কথা, ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

বিদেশী স্পীকারদের সঙ্গে সাইপ্রাসে

অমর কথাশিল্পী বিমল সিংহ

অনুকূল সিংহ

১৯৯৮ সাল। দিনটি সঠিক মনে নেই, সম্ভবতঃ ৩ এপ্রিল। ইংরেজী দৈনিক 'এশিয়ান এজ' পত্রিকায় এক বিরাট মাপের ছবি দেখে আঁৎকে উঠেছিলাম। মাথায় পাগড়ি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে এক দিব্য চাহনি। পাশে প্রণতঃরতা ছিন্নবস্ত্র মধ্যবয়স্কা মহিলা। সত্যিই ছবিটির শিল্পীকে ধন্যবাদ। এ ধরনের সময়-কাল-মিলিয়ে ক্যামেরায় পোজ দেওয়া প্রকৃত শিল্পী না হলে সম্ভব নয়। ছবিটি সেদিন পত্রিকা সংখ্যাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। আর প্রকাশিত ছবিটি হলো রাজ্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, জীবনশিল্পী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ'র। ৩১ মার্চ মৃত্যুর পর একটি স্মৃতিসভা থেকে ছবিটি নেওয়া হয়। ছাত্রজীবন থেকে তিনি মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের সুখ-দুঃখ-আবেগকে হৃদয়ের কুঞ্জে রেখে তাদের সাথী হয়েছিলেন। তারপর তিলে তিলে এই নিপীড়িত মানুষের চিন্তা-চেতনা-আকাঙ্খাকে শব্দের মালায় গেঁথে তাদের বোবা কান্নাকে কথাশিল্পের বুলিতে জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। তাই তাঁর পেশা রাজনীতিকে ছাপিয়ে নেশা কথাশিল্পকেই হাতিয়ার করে মানুষের আরো কাছে পৌঁছুতে পেরেছিলেন তিনি। সাহিত্য ও রাজনীতির যুগলবন্দি তাঁকে করে তুলেছিল এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা।

জনপ্রিয় ছাত্রনেতা থেকে জননেতায় উত্তরণের পর তিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের জীবন-আকাঙ্খাকে শুধুমাত্র বাহ্যিক অলংকার দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে সার্বিকভাবে জাগরিত না করতে পারলে সঠিক উত্তরণের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। সেই উপলব্ধি থেকে বিমল সিংহ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ডালিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে কলমকে শক্ত হাতে ধরে এগিয়ে আসেন। আশির দশকে 'জ্বালা' সাহিত্য পত্রিকায় একটি গল্প প্রকাশ করে সেই নূতন পথের আঙিনায় পা রাখেন তিনি। গল্পটি নেহাতই সাদামাটা। তাঁর জনগোষ্ঠীর জীবনকথা নিয়ে লেখা 'ইঙেল্‌লেইর মেয়ের বিয়ে'। এক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের উপস্থাপনা। রাজ্যের এই জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ-আনন্দের বা সংস্কৃতির কথা কোনদিন এভাবে বৃহত্তর আঙিনায় নিয়ে আসেনি কেউই।

তার মধ্যে আরও ব্যতিক্রম যে মণিপুরী সংস্কৃতি ও কুটিরশিল্পের অদ্ভুত যন্ত্রগুলোর নাম বাংলাভাষায় অনুবাদ করলে তালভঙ্গ বা ছন্দপতন হবে, তাই বিমল সিংহ সেই নামগুলো বাংলা সাহিত্যে স্থান করে দিলেন। গল্পের পটভূমিও হল তারই সেই সমাজ — এও চমৎকারই। একদা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অসংখ্য এই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। শিক্ষা-ব্যবসা-বাণিজ্যে অনগ্রসরতার দরুণ তারা দিন দিন গৃহহারা এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। সেই গ্রাম মসাউলী। মণিপুরী সংস্কৃতির এক পীঠস্থান। মৃদঙ্গ-নগরীও বলা যায়। সেখানে বরেণ্য মৃদঙ্গ শিল্পীরা। কালের পর কাল মৃদঙ্গকে নিয়ে তাঁদের জীবন। রবীন্দ্র স্নেহধন্য শান্তি নিকেতনের নৃত্য শিক্ষক নীলেশ্বর মুখার্জির বাসভূমি। সেদিক থেকে গল্পটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কারণ প্রখ্যাত মৃদঙ্গ শিল্পীর মেয়ের বিয়েতে মৃদঙ্গ বাজেনি। আর্থিক অনটনের জন্য মৃদঙ্গ বিক্রি করতে হয়েছে। এক কঠোর জীবনচিত্র, সত্যিই আজ মসাউলীর মৃদঙ্গ বাদক ওস্তাদরা অবহেলিত। তাদের প্রতি

কারো কৃপা দৃষ্টি নেই। লেখক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও তাদের দৈনন্দিন অভাব দারিদ্র্য দূর করতে পারবেন না, সেই উপলব্ধিকে তিনি গল্পে চিত্রিত করেছেন।

'আলোর ঠিকানা' গল্পটিতেও তিনি রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রতিটি ছত্রে তুলে ধরে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। এ ধরনের দু'একটা গল্প প্রকাশের পর পাঠকের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পান লেখক বিমল সিংহ। পাঠকের উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে লেখায় আরও মনোযোগী হোন। ধারাবাহিকভাবে ছোট গল্পের ডালি সাজাতে থাকেন। প্রত্যেকটি গল্পের এক ভিন্ন স্বাদ। কখনো ছুটে গেছেন চা-বাগানের শ্রমিকদের কাছে, কখনও বা পাহাড়ের উপজাতি যুবকের কাছে। আবার কখনো নীরবে শুনেছেন ভোর রাতের আজান। তাঁর বাড়ির কাছে বহমান নদী ধলাইয়ের নীরব কান্নার ঢলের সঙ্গে সঙ্গে রচিত হতে থাকে 'বসনের ঠাকুরমা', 'গোলাপের ছেলেবেলা', 'জাবেদ আলীর আজান', 'ধীরে বহে ধলাই' ইত্যাদি। আর এইসব গল্পের ঝুলি নিয়ে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৮৩ সালে। আগরতলা বইমেলায় চন্দনা প্রকাশনীর (বর্তমান নাম 'নব চন্দনা প্রকাশনী') উদ্যোগে 'আলোর ঠিকানা' প্রকাশিত হয়। তারপর 'মনাইহাম' আর ঐতিহাসিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে 'করাচি থেকে লংতরাই' উপন্যাস। লংতরাইয়ের গিরিবাসীর জীবন সংস্কৃতি নিয়ে 'লংতরাই' উপন্যাস। যা পরবর্তীকালে রাজ্যের প্রথম ককবরক চলচ্চিত্র হিসাবে নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও তিতাসের উদ্বাস্তু মৎস্যজীবীদের জীবনযন্ত্রণা নিয়ে 'তিতাস থেকে ত্রিপুরা'। 'তখাপাড়ার ইতিকথা'য় চিত্রিত করেছেন এক উপজাতি যুবকের বিচিত্র কলাকৌশল। উপজাতি ময়না শিকারির জীবনচিত্র নিয়ে 'মনাইহাম', যা বাংলা ও ককবরকে নাট্যরূপ দিয়ে অনেকবার প্রদর্শিত হয়েছে। এই নাটক রাজ্যের বাইরেও দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বাংলা ভাষার সাথে তাঁর মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাতেও তিনি শোকগাঁথা গল্পের সম্ভার নিয়ে 'ববেইর য়ারি' ও প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 'পৌরেই' ও একটি অনু উপন্যাস 'লাম্পেপার টেইপাঙ' রচনা করেন। এছাড়াও অসংখ্য গানের কলি বেঁধেছেন বিমল সিংহ, যা তাঁর ছোট বোন সুকণ্ঠী বীণার কণ্ঠে ক্যাসেট হয়ে বেরিয়েছে।

এ হেন জনপ্রিয় লেখক তথা সংগ্রামী মানুষটি অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কোমল একটি হৃদয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল ভ্রাতৃপ্রেমের আবেগকে পুঁজি করে তাঁর বুকে অসংখ্য বুলেট বিদ্ধ করে মানবতার শত্রুরা। এই অমানবিক হত্যা রাজ্যের মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। বিমল সিংহ আজও মানুষের হৃদয়ে গাঁথা। তিনি অক্ষয় অমর চিরন্তন।

—দৈনিক আরোহণ, ১লা এপ্রিল, ২০০৭

এক শিক্ষকের চোখে বিমল

সুচিন্ত্য ভট্টাচার্য

"শাসকগোষ্ঠী তোমরা হুশিয়ার! জেনে রাখো, ইস্পাতকে যতই আঘাত করবে; ইস্পাত ততই শক্ত হবে। আমাদের শরীর ইস্পাত দিয়ে তৈরি। আঘাতকে আমরা ভয় পাই না .....।" কথাগুলি ছাত্র নেতা বিমল সিংহের। বয়েস কুড়িব কোঠায় পৌঁছায়নি। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সময়টা ছিল ষাটের দশকেব শেষ দিক। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বনাম ধন্য মার্কসীয় নেতা কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার কৈলাসহরে এসেছেন একজন আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই শুনেছি, কমরেড কোঙার একজন সুবক্তা। কিন্তু কোনদিনই সুযোগ হয়নি ওঁর বক্তৃতা শোনার। ঠিক করলাম সুযোগ হাতছাড়া করবো না। যথা সময়ে মাঠে উপস্থিত হলাম। কমরেড কোঙারের বক্তৃতা শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। ওঁর বক্তৃতাব শেষে প্রায় চলে আসছিলাম। এরই মধ্যে মাইক্রোফোনে ঘোষণা — এবার বক্তব্য রাখবেন ছাত্রনেতা কমবেড বিমল সিংহ। ঘোষণাটি শোনে মাঠে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিমল আমাব ছাত্র। ক্লাসে যথেষ্ট সপ্রতিভ এবং সরব থাকলেও মাঠে হাজার হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা করতে পাববে কিনা আশঙ্কা ছিল। কৌতূহলী হয়ে দূব থেকে ওঁকে দেখছি। কিছুক্ষণেব মধ্যেই হাজার হাজার লোকেব শিহরণ ফুটিয়ে আমার সন্দেহ নিরসন করলো। তেজোদৃপ্তভঙ্গীতে নিজের পরিচয় দিল ইস্পাত বলে। শিক্ষক হিসেবে চারদশক পরেও বলতে পারি ওঁর পরিচয়ে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না।

ক্লাসে নানা প্রশ্ন করতো বিমল। যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম সমাধানের। তত্ত্ব থেকে প্রয়োগ, প্রয়োগ থেকে তত্ত্ব। প্রশ্নেব জের চলতো কলেজ থেকে বাড়ি। বাড়ি থেকে কলেজ। সহজে সন্তুষ্ট করা যেতো না। ক্লাসে কথা বলত অনেকটা সাহেবী কাযদায়। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ছেলেটি। বড় ভালো লাগত।

ছাত্রছাত্রীবা একদিন উৎসাহী হয়ে বলল, স্যার, আমরা মক্ পার্লামেন্ট করবো। সবার আগে বিমল। বললাম বেশ তো। তোমরা তৈরি হও। বিমলকে বললাম—তোমাকে ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্থনির ভূমিকায় ইংরেজিতে বক্তব্য বাখতে হবে। পারবে তো? বিমলের সহজ উত্তর- পারবো স্যার। চূড়ান্ত দিনটিতে বিমলরা দর্শকদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। ভাবিনি সেদিনের নকল ভূমিকা তার জীবনে আসল ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কাগজে দেখলাম বিমল জনপ্রতিনিধি হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ হয়েছে। খুশি হয়ে অভিনন্দন আর আশীর্বাদ জানিয়ে ওকে চিঠি দিলাম। হঠাৎ এক ভরদুপুরে ঘর্মাক্ত অবস্থায় বাড়ি এসে হাজির। স্মিত হাসি দিয়ে প্রণাম করল। তার চোখে মুখে আনন্দ। শিক্ষকতাব বৃত্তিতে আমি গর্বিত হলাম।

কিছুদিন বাদে নিরীহ চেহারার একটি ছেলে প্রণাম করে একটি ছোট্ট দু'লাইনের চিঠি দিল। বিমল লিখেছে— ছেলেটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়তে চায়। ওর যোগ্যতা আছে কিনা অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন। মুগ্ধতায় আমার মন ভরে গেলো। মন্ত্রীর দাম্ভিকতা নেই। চিঠির প্রতিটি ছত্রে শ্রদ্ধা, নম্রতা এবং মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা।

দীর্ঘদিন আর যোগাযোগ নেই। এবারের সাধারণ নির্বাচনের পর শারীরিক কারণে কোলকাতা গেলাম। সেখান থেকেই নির্বাচনে ওর জয়লাভ এবং মন্ত্রিত্বের খবর পাই। আমার ইস্পাত ছাত্রটিকে অভিনন্দন জানাবো জানাবো ভাবছি। কিন্তু ভাবনা ভাবনাই থেকে গেল। মনে পড়ছে একত্রিশে মার্চের ভয়ঙ্কর দিনটির কথা। আমার একটি ছাত্র হন্তদন্ত হয়ে আমাকে বলল স্যার একটি দুঃসংবাদ। মুহূর্তে আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো গূঢ় বিপদ সংকেতে টানটান হয়ে উঠল। ছাত্রটি বলল—বিমল সিং ইজ্ শট্ ডেড্। আমার শরীর শিউরে উঠল। এ যে বড় মর্মান্তিক!

বিকেলে কলেজে পড়ুয়া আমার ছাত্রটি এল। এই ছাত্রটিই বিমলের চিঠি নিয়ে এসেছিল। ওর চোখ ছলছল করছে। দৃষ্টি বিহ্বল। কান্না-উদ্বেল কণ্ঠে থেমে থেমে বলছিল, স্যার বিমলদা বড় ভালো মানুষ ছিলেন। যে কেউ বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে তিনি বিমুখ করতেন না। ট্রাইবেল না নন ট্রাইবেল। কংগ্রেস না সি.পি.এম এসব বিচার করতেন না। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অসম্ভব সাহসী। মৃত্যু ভয় ছিল না। কাউকে ভয় পেতেন না। ওরা চক্রান্ত করে বিমলদাকে মেরে ফেলল। ছেলেটি আর কথা বলতে পারছে না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। আমি চুপ করে আছি। স্মৃতিপটে আমার শিক্ষকতা জীবনের প্রথমদিকের নির্ভিক ছাত্রটির অবয়ব সজীব হয়ে উঠল। স্মৃতি রোমন্থন করে দেখছি বিমল দুই প্রজন্মের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কোন সময়ে নজরুলের কাণ্ডারী, আবার কোন সময়ে শেক্সপীয়র নাটকের জুলিয়াস সিজার। বিমলের সোলিল কি শুনতে পাচ্ছি। .... কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ/দ্য ভ্যালিয়েন্ট নেভার টেস্ট অব ডেথ্ বাট ওয়ানস্/সীজার শুড বি অ্যা বিষ্ট উইদাউট হার্ট/ ইফ্ হি শুড স্টে অ্যাট হোম টুডে ফর ফিয়ার/নো সীজা শ্যাল নট/... *—ডেইলি দেশের কথা, ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

কমলপুর স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মা পূর্ণিমা সিংহ

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"

তপন চক্রবর্তী

একদিকে এম.বি.বি কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মানিক সরকার অন্যদিকে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক বিমল সিংহ, নব প্রতিষ্ঠিত ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে রাজ্যের গোটা ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন ১৯৭০-৭১ সালে, সে সময় থেকে আজ বেলা ১২ পর্যন্ত হৃদপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে যাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেত, শ্রেণি শত্রুদের ভাড়াটে ঘাতক উগ্রপন্থীদের বুলেট স্তব্ধ করে দেয় সেই হৃদপিণ্ড। এই শেষ যাত্রায় তার সাক্ষী ছোটভাই রকেট। তাকেও ঘাতক উগ্রপন্থী বাহিনী বুলেট বিদ্ধ কবে হত্যা করে। এই নৃশংস কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের নিন্দার ভাষা নেই। সদ্য বিধবা বৌদি, কন্যা রুজালীন এবং পুত্র রিচার্ডকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা আমার জানা নেই। আর এক ছোট ভাই বিক্রমকে উগ্রপন্থীদের কবলমুক্ত করতে গিয়ে বড় দুই ভাই প্রাণ বলিদান দিলেন।

বিমলদাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি - ১৯৭০ সাল থেকে। অসম সাহসী সেই যুবক। ত্রিপুবায় অ-উপজাতি মধ্যবিত্তদের মধ্যে ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে একের পর এক। মিছিলে বিমল সিংহের স্লোগান মানেই নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি। "ইন্দিরা তেরে রাজ সে, বাচ্চা ভুখা মবতে হে" শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে সারা ভারত তখন বিক্ষোভ আন্দোলনে অস্থির, অশান্ত সেদিনগুলিতে কখনো শহরের রাস্তায় ছাত্র-যুবদের গর্জমান মিছিল, কখনো চা-বাগানের শ্রমিকদের বস্তিতে মালিকপক্ষের শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগঠিত করার কাজে ছাত্রদের অংশগ্রহণ — সেই সময়েও দেখেছি বিমলদা কতো স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকদেব মনে প্রবেশ করছেন।

সে সময় ভিয়েৎনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কার্পেট বম্বিং করছে। আমরা ছাত্ররা কলেজে শহরে রাস্তায় মার্কিনের সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ সংগঠিত করছি, সে সময়ও বিমলদা ছিলেন সকলের অগ্রভাগে। আবার পার্টি সভায় বসে যুগের আলো বই (রাষ্ট্র ও বিপ্লব) নিয়ে তুমুল বিতর্ক। দেখতাম বিতর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যেতেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে সমস্ত বিষয়টা পরিস্কার না হচ্ছেন।

কৈলাসহরে একটি ছাত্রাবাসে (গুণধর নিবাস) আমরা একসঙ্গে থাকতাম। দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে খুবই অগোছালো ছিলেন। থাকা-খাওয়া সবই বে-নিয়মে চলতো। এটাই ছিল লাইফ স্টাইল। সবাই জানতো বিমলদা এরকমই। ছাত্র-যুব অভিভাবক বয়স্কজন সকলের সাথেই মেলামেশায় বন্ধনহীন।

ছাত্র অবস্থায় কোলকাতায় 'ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে' (শিয়ালদার কাছে) থাকতেন। তখন জরুরি অবস্থার শেষ দিক। গোটা দেশে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরাগান্ধীর অন্ধকার রাজত্বের বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানেও বিমলদাকে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছি। তখন তিনি এম এ (জার্ণালিজম) এবং এল.এল.বি কোর্সে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পড়াশুনা করছেন। তারপর ত্রিপুরা ফিরে এসে আবার গণ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। তখন তা'র কর্মক্ষেত্র কমলপুর। জন্মস্থান। সেখান থেকে পরবর্তী সময় ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ত্রিপুরা বিধানসভায় নিজের কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন। কখনও বিধায়ক, কখনও ডেপুটি স্পিকার, কখনও স্পিকার এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মন্ত্রী হিসেবে।

ত্রিপুরায় অতি ছোট একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেও একটি বর্ণময় জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। লেখক হিসেবে, ত্রিপুরায় উপজাতি জনগণের জীবন যন্ত্রণার অমর কাহিনীকার ও চিত্র পরিচালক হিসেবে, আইনজীবী হিসাবে, একজন নেতৃস্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মী হিসেবে নিজের দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন।

নিজের সম্প্রদায়-বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সম্প্রদায়ের শিক্ষা, ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথে তার প্রচেষ্টা এই অংশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিমলদাকে নিয়ে স্মৃতি চারণ করতে হবে এবং প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শেষ বিদায় জানাতে হবে আজই, আজ সকালেও কি আমবা ভাবতে পেরেছিলাম? এ যেন ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশে এক নক্ষত্র পতন। শোকস্তব্ধ গোটা রাজ্য। যে এন.এল.এফ.টি সন্ত্রাসবাদী বাহিনীকে ব্যবহাব করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তিগুলো বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিজয়কে রুখবাব জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে সেই সন্ত্রাসবাদী এন এল.এফ.টি সংগঠনটিকেই খুনী হিসেবে ব্যবহাব করা হযেছে।

শুধু বুক ফাটা আর্তনাদ আর চোখের জলে বুক ভাসালে চলবে না। শত্রুর সমস্ত ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ করে দিয়ে, ত্রিপুরার জাতি উপজাতি ও সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষের গণতান্ত্রিক ঐক্যকে আরও মজবুত করে, ত্রিপুরার গরীব মেহনতি মানুষেব স্বার্থে কাজের জন্য বামফ্রন্ট সরকাবকে রক্ষা করে, এগিয়ে যেতে পারলেই কমরেড বিমল সিংহের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সার্থক হবে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার এটাই হোক আমাদের শপথ। কমরেড বিমল সিংহ অমব রহো। চির জাগ্রত থাকো আমাদের হৃদয়ে।

—ডেইলি দেশের কথা, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৮

কমলপুর স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পিতা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ।

জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেলেন একতার মূল্য অনেক বেশি

অতনু দত্ত

মার্চ মাসের শেষ দিন। দুপুর ২টা ২০ মিনিট। পার্টির একটা শাখান্তরের সভা সেরে মাত্র নিজের ঘরে ঢুকেছি — হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভারটা না তুললেই বোধ হয় ভালো হতো। কারণ এমনই এক দুঃসহনীয় বার্তায় চৈত্রের তপ্ত দুপুর ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে ভাবিনি। সত্যি খবরটার জন্য কি কেউ প্রস্তুত ছিল?

এক দৃঢ়চেতা-তেজোদীপ্ত-সংগ্রামী পুরুষের বুক ঝাঁঝরা করে দিল গণতন্ত্রের শত্রুদের নিক্ষেপ করা একঝাঁক তপ্ত বুলেট। যার শহীদ দুই ভাইয়ের তাজা রক্তে সিক্ত হলো ধলাই নদীর শুষ্ক বালুচর, আর লাল হল দিগন্ত বিস্তৃত ধলাই-এর জল। হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীর বুকে দানবের আস্ফালন আর কাপুরুষের রাইফেল কার্বাইনের গর্জনে কেঁপে উঠল বিস্তৃত প্রান্তর। রক্তলিপ্স শয়তানের অট্টহাসি, আর ....।

বহু আগেই যিনি দিয়েছেন শপথ দৃপ্ত ঘোষণা —"নিজের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে ধ্বংস হতে দেব না পাহাড়ী বাঙালীর প্রাচীন ঐতিহ্যময় সংহতি।" যিনি বারবার বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন — চূর্ণ করো ষড়যন্ত্রীর কূট কৌশল আর হীন চক্রান্ত। এমনই এক বীর সেনানীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল সম্প্রীতির শত্রুতা। যা কল্পনারও অতীত। কাপুরুষের দল, সকলের সংগ্রামী বন্ধু, বিমল সিংহ ও বিদ্যুৎ সিংহকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্মৃতিপটে ভেসে উঠে অতীতের কিছু কথা .... যা তাঁর শক্তিশালী বলিষ্ঠ বন্ধুত্বের পরিচায়ক।

১৯৯৫ সাল। ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হবার সুবাদে আমি তখন খোয়াই কলেজের এস.এফ.আই পরিচালিত ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সম্পাদক। সপ্তাহখানেক পর কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছাত্র সংসদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঠিক করার দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার উপর। কী কারণে জানি না, হঠাৎ করে প্রধান অতিথি হিসেবে বিমল সিংহের নাম মনে এসে পড়ল। ভাবতে লাগলাম, আগের কোন পরিচয় নেই, কোনদিন তার সাথে কথা বলিনি। তিনি আসবেন তো? এসব ভাবতে ভাবতে আগরতলা গেলাম। বিধানসভা ভবনে তাঁর চেম্বারে দুরু দুরু বুক নিয়ে ঢুকে গেলাম। চেম্বারে ঢুকে দেখি তিনি কি যেন লিখছেন। ইশারা পেয়ে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লাম। মিনিট দুয়েক পরে কাজ সেরে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন কি চাই? আমি আমার আসার কারণ জানাতেই ডাইরীতে নোট করে বললেন — "ঠিক আছে যাবো। আমায় তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু"। আমি চেম্বার থেকে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আবার বসালেন। তারপর আলাপচারিতায় কখন যে দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারলাম না। সত্যিই কী সারল্য ....। কলেজের কী কী সমস্যা, অধ্যাপকের সংখ্যা কত, ক্লাস নিয়মিত হয় কিনা ...., সব কিছু জিজ্ঞেস করলেন। আমি আবিষ্কার করলাম একজন বিশাল হৃদয়ের বড় মাপের মানুষকে। শেষে চা বিস্কুট খাইয়ে ছাড়লেন।

হ্যাঁ—তিনি এসেছিলেন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন আমরা কলেজে যাবার আগেই তিনি হাজির। অনেক্ষণ মাঠে ছিলেন। এক ফাঁকে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ছাত্র সংসদের

সম্ভাও করলেন। বিভিন্ন সমস্যাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। নিজেও ঘরোয়াভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। বিমলদার প্রস্তাব অনুসারে সমস্যাগুলো নিয়ে আগরতলায় উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তা এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ডেপুটেশন দিতে গিয়ে দেখি বিমলদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ডেপুটেশনে তিনিও ছিলেন। শুধু এদিনই নয়, এর পরেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে যখনই আগরতলা গেছি তখনই বিমলদা সাহায্য করেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এমনই ছিলেন বিমল সিংহ। তাঁর সাথে পরিচিতির সুবাদে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম অতীতের এক করিৎকর্মা ছাত্র নেতাকে। ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে এটা আমার কাছে বড় পাওনা। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা — আমাদের এক দুর্লভ সম্পদ। শান্তি সম্প্রীতির অগ্রনায়ক কমরেড বিমল সিংহকে খুন করেছেন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কাপুরুষের দল। বিমলদার এ মহান আত্মত্যাগই হোক আমাদের প্রেরণার মূল উৎস। মৃত্যু তাঁকে আরও মহান করেছে। নিজের জীবন বলি দিয়ে বিমলদা আমাদের শিখিয়ে গেছেন জীবনের চেয়েও একতার মূল্য আজ অনেক বেশি।

আজ মহান এই মানুষটির চির বিদায় শোকে যেন পাথর হয়ে গেছে সারা রাজ্য। তিনি ছিলেন এক উঁচু মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ। শহীদের তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। সুরমণি কলই, নীলপূর্ণ কলই, উপেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্রমোহন দেববর্মা, ক্ষীরোদ দেববর্মাদের নামের পাশে যুক্ত হল আরও একটি নাম বিমল সিংহ। এই তালিকা হবে আরও দীর্ঘ। শান্তি-সম্প্রীতির আন্দোলনের ইতিহাস শহীদের রক্তে আরও গৌরবান্বিত। প্রতিটি মেহনতি মানুষের মনে শহীদ কমরেড বিমল সিংহের নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। সম্প্রীতি রক্ষার স্তম্ভরূপী বিমল মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে মৃত্যুর শেষ দিল পর্যন্ত গণদুশমনদের মোকাবিলা করে গেছেন। ৪৯ বছরের এই দৃঢ়চেতা মানুষটি পার্বতী ত্রিপুরার আপামর মেহনতি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবেই ভালোবাসতেন বলেই অকাতরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। বিস্তৃত আকাশের মত মহান আর বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটিকে এমন এক সময় দুশমনরা কেড়ে নিল, যে সময় তার মত যোগ্য নেতা মানুষের বেশি প্রয়োজন ছিল। কমরেড বিমল সিংহের বলিদান আবারও প্রমাণ করলো সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে আগামীদিনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ রক্তে লাল বন্ধুর। আর এ পথেই আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে মৈত্রীর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। প্রতিটি শহরের এক একটি রক্তবিন্দু আমাদের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবে।

কমরেড বিমল সিংহের হত্যার মাধ্যমে ওরা হত্যা করতে চেয়েছে ত্রিপুরার মৈত্রী আর একতার বন্ধনকে। কিন্তু শত শহীদের রক্তে রাঙা এ পথে আগুয়ান মানুষ যে কোন মূল্যে একতা রক্ষার শপথে ব্রতী হয়েছেন। শহীদের রক্তস্নাত পথে লাল পতাকাকে সমুন্নত রাখতে শত সহস্র মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। আর এর প্রেরণা হয়ে লাল পতাকা ঘেরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কমরেড বিমল সিংহ। কমরেড বিমল সিংহ আজ শুধু একটি নাম নয়, তিনি ইতিহাস। তিনি সংহতি সূর্য। যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছিলেন তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দৃঢ় শপথ নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বহু দূর-বহু পথ। শহীদের মহান আত্মত্যাগের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত অনুসারে কাঁটা বিছানো পথে শহীদের রক্ত-ঋণ শোধ করতে এগিয়ে যেতে হবে।

— ডেইলি দেশের কথা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৯৮

বিমলদার যে গল্প আর লেখা হলো না

অজয় তিলক

খবরটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বরঞ্চ আগরতলায় এসেছেন কিনা তা জানার জন্য টেলিফোনের রিসিভারটা কানে তোলার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার একটা বিশেষ প্রয়োজনে। ৩০ মার্চ সোমবারই বিমলদার আগরতলা আসার কথা ছিল। ফোন করে জেনেছিলাম ৩০ তারিখ আসেননি। ভাবছি আজ তো আসবেনই। বিমলদার আর আগরতলা আসা হল না। কিন্তু মর্মান্তিক খবরটা ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবুও চারদিকে খোঁজ খবর নিয়ে মেনে নিতে হল সে মর্মান্তিক সত্যকে।

চোখের আয়নায় ভেসে উঠল বিমলদার হাসি-খুশি মুখ। গল্প বলার সে হৃদয়গ্রাহী অভিব্যক্তি। মনে পড়ছে সে দিনের কথা। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বিমল সিংহ। তখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। অফিস ঘরে বসে আলাপ হচ্ছিল—কথার সূত্রপাত হয়েছিল ত্রিপুরার চলচ্চিত্র বিষয়ে। আলোচনা এগোতেই বললেন—ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যার উপর কিছু করা দরকার। ছায়াছবির ব্যাপারটাই ছিল মাথায়। আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন গল্পটা।

একটি পাহাড়ী জনপদ। সহজ সরল পাহাড়ী মানুষগুলি থাকেন সে প্রকৃতির কোলে। আধুনিক সভ্যতার মধ্যাহ্ন সূর্যের আলো পৌঁছয়নি সেখানে। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা এই জনপদ। এঁদের সমাজ এরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। সবাই মিলিতভাবে তাঁদের নিজস্ব প্রথায় নির্বাচিত করেছেন তাদের মোড়লকে। সুখ দুঃখ হাসি কান্না আনন্দ বেদনার চিরন্তন পথ বেয়ে মোড়লের অভিভাবকত্বে চলছিল তাদের সমাজ জীবন। অন্য সমাজের দুই একজন এই জনপদে যাতায়াত করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে। এদের সঙ্গে এই জনপদের লোকজনের প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক। এই সম্পর্কে নেই কৃত্রিমতা, নেই কপটতা, বেশ চলছিল সহজ সরল মধুর জীবনযাত্রা। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানির স্থান নেই এখানে। কিন্তু কতদিন এভাবে চলবে? বেশিদিন চলতে পারল না। একদিন উগ্রপন্থীরা ঘেরাও করল এই অনাবিল শান্তির 'নীড়'কে। একটা পাহাড়ী বাড়িতে ঢুকে অকথ্য অত্যাচার শুরু করল পরিবারের লোকজনদের উপর। তারা জিজ্ঞাসা করছিল যে দু'জন বাঙালী একটু আগে এই বাড়িতে এসেছিল তারা কোথায় গেল? আর সহ্য করতে পারছিল না উগ্রপন্থীর অসহ্য অত্যাচার। বলে ছিল তারা মোড়লের বাড়িতে আছে। উগ্রপন্থীরা ছুটে গেল মোড়লের বাড়ি। মোড়ল এর আগেই খবরটা পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি দু'জন লোক দিয়ে বাঙালী অতিথিদের গোপনে এই জনপদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। "কোথায় আছে এই দু'জন বাঙালী" — একথা বার করার জন্য মোড়লের উপর চলছিল উগ্রপন্থীদের অকথ্য অত্যাচার। এ অত্যাচার যে কোন হিন্দি ছবির ভায়োলেন্সকে হার মানায়। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কোন সাহস নেই এখানকার পাহাড়ি মানুষদের। সবাই বড় অসহায়। শত অত্যাচারেও মোড়ল মুখ খুলল না। পড়ে রইল অর্ধমৃত অবস্থায়।

এদিকে অনতিদূরে বাঙালী গ্রামে গুজব রটে গিয়েছিল দু'জন বাঙালী ওই পাহাড়ী জনপদে খুন হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র বাঙালী জাতায়তাবাদীরা দা, বল্লম, লাঠি নিয়ে পিচের

রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে নিরীহ পাহাড়ী মানুষদের খুঁজতে লাগল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভয়-আতঙ্ক। ধীর পায়ে পাহাড়ী যুবক বন্ধুদের হাত ধরে পিচের রাস্তায় উঠে এল ওই বাঙালী বণিকদ্বয়। সঙ্গে সঙ্গে হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালী উগ্রবাদীরা শান্তির দূত পাহাড়ী যুবকদের উপর। রুখে দাঁড়ালো বাঙালী বণিকদ্বয়। রক্ষা করল পাহাড়ী যুবকদের।

কথাগুলি এক নাগাড়ে বলে গেলেন বিমলদা। বললেন এ হচ্ছে গল্পের আউটলাইন। "কেমন হবে গল্পটা?" এ প্রশ্নের চটজলদি উত্তর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল — 'দারুণ'। প্রশ্ন করলাম গল্পটা লিখেছেন? খুব ছোট উত্তর — " না ভাবছি।" বললাম তাড়াতাড়ি লিখে ফেলুন। উত্তরে বিমলদা বললেন "লিখব"। তবে নির্বাচনের পরে। নির্বাচনের আগে আর সময় হবে না। যথা নিয়মে নির্বাচন এল। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। বিধানসভার অধিবেশন শেষ হল। বিমলদা যে উদ্দেশ্যে গল্প লিখবেন ভাবছিলেন — যে গল্পের চিত্রনাট্য হবে—যে দাবি আগামীদিনে ত্রিপুরার শান্তি-সম্প্রীতি-সংহতির আন্দোলনকে বলিষ্ঠ করবে—সে গল্প লেখা আর বিমলদার হলো না। যিনি প্রাণপণে সরাতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর জঞ্জাল তাঁকে কেড়ে নিল একদল জঞ্জালের ঘৃণ্য কীট। *— ডেইলি দেশের কথা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮*

কমলপুর স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।